বায়োস্কোপিক

[প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব একত্রে]

রঞ্জন মজুমদার

সাহিত্য প্রকাশ

৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট ·

কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৬৮

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র : ৫।১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট : কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : বিভূতি সেনগুপ্ত

মুদ্রাকর : অজিত কুমার সামই : ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১/১ এ, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট : কলিকাতা-৬

আমার সহধর্মিনী

অঞ্জলী মজুমদারকে

ঃ বইটি সম্পর্কে মহানায়ক উত্তমকুমারের অভিমত ঃ

রঞ্জন মজুমদারের লেখা "বায়োস্কোপিক" বইটি পড়লাম। এক কথায় অসাধারণ। সিনেমার শুটিং করতে গিয়ে এক একসময় আমাদের যেসব মজার মজার পরিস্থিতিতে পড়তে হয়, রঞ্জন সে-সব ঘটনা নিয়ে এমন চমৎকার সাজিয়ে-গুছিয়ে লিখেছে যে হাসতে হাসতে আমারই দমবন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। এছাড়া আছে সিনেমার আশ্চর্য কিছু কিছু নেপথ্য কাহিনী—যা পড়ে সত্যিই অভিভূত হতে হয়। রঞ্জন ভালো চিত্র-সাংবাদিক এবং একজন দক্ষ ফিল্ম-টেকনিশিয়ান। চলচ্চিত্রের জগৎটা ওর ভালোভাবে চেনা। তাই ও আশ্চর্য দরদ দিয়ে এই জগতের সুখ দুঃখ এবং আকাঙ্খাকে ফুটিয়ে তুলেছে ওর লেখায়। বিশ্বাস করি বইটি খুবই জনপ্রিয় হবে।

উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়।

ঃ লেখকের আরও দু'খানি বই ঃ

বায়োস্কোপিক (১ম পর্ব)

হিপিসঙ্গমে

এ এমন একটা কিছু গুরুতর ব্যাপার নয়। তখন বোঁদে মিত্তিরের মন্তব্য ছিল—তাহলে এবার তুই মলি।

পটল কাট-টু দক্ষিণ কলকাতার এক গার্লস কলেজের সামনে। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে ভঙ্গীতে। ইদানীং বোঁদে মিত্তিরের ঠাট্টা তার সহ্য হয় না।

বিখ্যাত নায়ক এরল ফ্লিন তাঁর আত্মজীবনী 'মাই উইকেড উইকেড ওয়েজ' গ্রন্থে এমন সব ব্যক্তিগত ঘটনার উল্লেখ করেছেন যে পড়লে ইয়ে হয় মানে ঘাবড়ে যেতে হয়। এরল ফ্লিনের শো-ম্যানশিপের বাস্তবিক তুলনা হয় না। চেহারার জোরে ব্যক্তিত্বের জোরে ভদ্রলোক সে-যুগের বিখ্যাত, কুখ্যাত সুন্দরীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেছেন; গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে তার স্বীকারোক্তি আছে।

তারও পর পড়েছি চার্লি চ্যাপলিনের বিখ্যাত 'মাই আটোবায়োগ্রাফী' গ্রন্থ। এক কথায় অসাধারণ। চলচ্চিত্রের সেই পৃথিবীখ্যাত 'ভবঘুরে' একদিন যেভাবে ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, কেউ নিশ্চিত ভাবে বলতে পারেনি, মশাই এক সপ্তাহ অপেক্ষা করুন, এই লোকটি নিশ্চিত দিগ্বিজয়ী হবে। কিন্তু সময় প্রমাণ করেছে—তাঁর সেই শো-ম্যানশিপ তুলনাহীন। চার্লি চ্যাপলিনের কিছু স্বীকারোক্তি আছে। তবে বড় বেদনাদায়ক। এবং রোমাঞ্চহীন।

পটল এই দুয়ের মাঝামাঝি একটা প্রতিষ্ঠা চেয়েছিল। পেতে বাধা কোথায়? যে ভদ্রলোক তাকে উত্তেজিত করে একটা জায়গায় পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছিল, পটল যতই বিরূপ মন্তব্য করুক, তাঁর অবদান পটল তার জীবনে অস্বীকার করতে পারে না। পারা সম্ভবও না

কাট্-টু-কাট্ কলেজের ছুটির সময় পটল বহু হবু নায়িকা দেখেছে। কিন্তু তার পছন্দ হচ্ছিল না। সে প্রায় রোজই বিরক্ত বীতশ্রদ্ধ মুখে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। তার ধারণা—সে মেয়েদের দিকে নজর রাখছে। কিন্তু অলক্ষ্যে পাড়ার ছেলেরা যে তাকেও নজরে রাখছিল—এটা সে বুঝতে পারেনি।

পটলের সহকারী সুনীলের জবানীতে শুনুন শেষ পর্যন্ত কি হলো।

সুনীল একদিন বললে—দাদা পটলদার কিত্তি আর কি বলব। একদিন আমায় বললে সুনীল চল, আজ এট্টা মেয়ে দেখেছি, দারুণ, রাজী করাতে পারলে ও অনেকের ছুটি করিয়ে দেবে—

সুনীল অগত্যা গিয়েছিল। ছবি বন্ধ হলে বিপদটা তারও। কলেজের সামনে গিয়ে পটলদা বললে, ছুটির সময় সবাই হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়ে। ছুটো তো মাত্তর চোখ। সবাইকে তো আর নজরে ধরে রাখা যায় না। আজ তুই হাফ আমি হাফ—তারপর হঠাৎ দেখি চারটে ছেলে দৌড়ে এসে পটলদাকে চেপে ধরেছে। পটলদা পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে। শুনলাম, একটি ছেলে বলছে—রোজ রোজ এখানে কী করা হয় মশায়ের?

পটল অকুতোভয়—কেন বলুন তো?

—আগে আমাদের প্রশ্নের জবাব দিন—তারপর আপনারটা—

—এই ইয়ে মানে—

—বলে ফেলুন বলে ফেলুন···

পটলদা যে শ্রাগ্ করবে সে উপায় কোথা, ওরা যে কাঁধ চেপে দেয়াল ঠেশে দাঁড় করিয়েছে—আরে আপনারা ঠিক বুঝতে পারছেন না—আমি হিরোইন খুঁজতে—

—বে-পাড়ায় হিরোইন খোঁজা হচ্ছে? পটলের কথা শেষ না হতেই ওরা—আস্পদ্দা আপনার কম নয় তো···

সহকারী সুনীল বললে—আমি লুকিয়ে পড়েছিলাম ভাগ্যিস নইলে উঃ—সুনীল শিহরিত—পটলদাকে ওরা পার্কের পেছন দিকটায় নিয়ে বুকে হাঁটু দিয়ে—

একটি ছেলে বললে—গুরু, সার্ভিস আমরা দুরকমই জানি, ইণ্ডিয়ান আর ওয়েস্টার্ন—এখন বলুন কোন্টা আপনার পছন্দ—

এরপর সুনীল আর দাঁড়ায়নি। চলন্ত একটা বাস ধরে ঝুলে পড়ে সোজা স্টুডিওয়। পরিচালক ভদ্রলোক আঁৎকে উঠে—এ্যাঁ, কি সর্বনাশ —চল চল চল—

অকুস্থানে পৌঁছে জানা গেল, হ্যাঁ সবই ঠিক, তবে তিনি হসপিটালে।

সব শুনে পাড়ার ছেলেরা খুবই দুঃখিত। আরে ছিঃ ছিঃ—তা বলবেন তো যে উনি বায়োস্কোপের জন্যে হিরোইন খুঁজছেন—আমরা ভাবলাম উনি বোধহয় পার্সোনাল হিরোইন···

পটল বাঙালী কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ আত্মবিস্মৃত নয়, আমায় মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে ও আত্মজীবনী লিখবে। যাতে গুছিয়ে লিখতে পারে তাই আপাততঃ এটা আমি লিখে দিলাম, পরেরগুলো আশা হয় সহজেই ও লিখে ফেলবে।

সেদিন সকাল থেকে আকাশের মুখভার। মেঘলা গম্ভীর। আর সেই সঙ্গে ভ্যাপসা গরম। সেদিনই একটা ছবির আউটডোর শুটিং হবার কথা ছিল কলকাতার হার্টিকালচার গার্ডেনে। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে ইউনিটের সবাই লোকেশানে এসে পৌঁছেছিল। আকাশের ওই অবস্থা দেখে তো সবার মাথায় হাত। ক্রমে শিল্পীরাও এলেন লোকেশানে। এখন কী করা? বিব্রত পরিচালক বললেন, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখা যাক। সূর্যদেব যদি সদয় হন তো ভালই নইলে এই ডাল্ আবহাওয়াতেই আমায় শুটিং করতে হবে। আর কোন বিকল্প নেই—

অপর্ণা সেন তখন দ্বীপঙ্কর দে-কে বললেন—আসুন, ওই গাছের তলায় বসে কিছুক্ষণ গল্প করা যাক—

দীপঙ্কর বললেন—মন্দ নয়।

গাছের তলায় মোড়া পেতে ওঁরা মুখোমুখি বসলেন গল্প-গুজব করতে। দেখাদেখি আরও কয়েকজন এগিয়ে এলেন।

দীপঙ্কর দে সম্প্রতি ফিল্মে এসেছেন। আর এই অল্প সময়ের মধ্যে নিজের ব্যবহারের গুণে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। ফিল্মে যোগ দেবার আগে উনি কলকাতার এক নামজাদা বিজ্ঞাপন সংস্থায় বেশ ভাল পজিশনে একটা চাকরী করতেন। কিন্তু দু নৌকায় পা রাখা সম্ভব নয় বলেই দীপঙ্কর চাকরীটা ছেড়েছেন, ফিল্মটা ধরেছেন।

আর এমনই যোগাযোগ সেইদিনই দীপঙ্করের প্রথম ছবিটি রিলিজ হওয়ার কথা। বেচারি, পাশ থেকে কে যেন বললে, ভাবনা-চিন্তায় ওর রাতের ঘুম গেছে। দর্শকরা যদি ওঁর অভিনয় পছন্দ করে তো অলরাইট নইলে অবস্থা কি দাঁড়াবে, দীপঙ্করের আগাম দুর্ভাবনা। খুবই স্বাভাবিক।

—কি ভাবছেন? হঠাৎ অপর্ণার প্রশ্ন।

—উঁ?...না না, কিছু না।

রিলিজ ছবিটির কথা অপর্ণা সম্ভবত জানতেন। সহাস্যে প্রশ্ন করলেন —আজ রিলিজ?

সামান্য ইতস্তত: ভঙ্গী দীপঙ্করের—অ্যাঁ হ্যাঁ, আজই রিলিজ—।

—উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক?

—থ্যাঙ্ক য়্যু অপর্ণা।

—ভেবে আর কি হবে। যা হবার তা হবেই।

দীপঙ্করের মৃদু হেসে সায়।—হ্যাঁ, তা তো বটেই।

—তাছাড়া আপনার রিস্ক আর কি? ব্যাচেলার মানুষ—

এতক্ষণে হাসির বোমাটা ফাটল। সবাই হৈ-হৈ করে উঠলেন।

অপর্ণার যেন সামান্য অপ্রস্তুত ভঙ্গী—না না, ব্যাপারটা কি? এতে হাসির ব্যাপারটা কোথায়?

হাসিটা সুনু রায়চৌধুরীর-ই বেশী। উনিও কনফার্মড ব্যাচেলার। বললেন, তোমায় কে বলেছে ও বিয়ে করেনি?

পরিচালক পিনাকী মুখার্জি বললেন—আরে দীপঙ্কর রীতিমত বিবাহিত। তোমার কাছে বোধহয় চেপে গেছে...।

দীপঙ্কর ভীষণ লজ্জিত। বিব্রত। দু হাত তুলে বললেন—না না পানুদা, এটা লেগ পুলিং হচ্ছে। আমি আবার কবে চেপে গেলাম?

অপর্ণা সুরসিকা। এসব শুনে মিটিমিটি হাসি।—গেছেনই তো চেপে। কই, কবে বললেন আপনি বিয়ে করেছেন। উল্টে সব সময় একটা ভঙ্গী রেখেছেন—বিয়ে-টিয়ে করেননি। ইস্ এখন কী হবে?

পিনাকী মুখার্জি কৃত্রিম আশাভঙ্গে ঠাঁশ-ঠাঁশ মাথা চাপড়ালেন—বটেই

তো, এ রীতিমত হার্ট-ব্রেকিং সংবাদ। কত হিরোইন তোমায় দেখে আবার নতুন আশায় বুক বেঁধেছিল, তাদের এখন কী হবে ভাই ?

দীপঙ্কর হাসবে না কাঁদবে স্থির করতে পারছিল না।

বললাম—যাক্‌গে যা হবার হয়ে গেছে। তা তোমার শ্বশুরবাড়ি কোথায় ভাই ?

দীপঙ্কর আর মুখই তুলতে চায় না। সবাই পীড়াপীড়ি করতে বললে, ইয়ে, দিল্লীতে।

—বটে বটে। তা গিন্নী বাঙালী তো ?

—উঁহু।

আতঙ্কিত প্রশ্ন—তাহলে ?

—মহারাষ্ট্রীয়ান—

—লভ ?

আর দীপঙ্কর সহজে মুখ খুলতে চায় না। কিন্তু অপর্ণা সেন ওঁর নাম। ইচ্ছে করে যখন খুনসুটি করেন তখনও ওঁর জুড়ি খুঁজে পাওয়া ভার। সহাস্যে বললেন—আরে বলুন-ই না। এখন তো আর কেউ ব্যাগড়া দিচ্ছে না। আমিও তো প্রেম করে বিয়ে করেছি। নাথিং আন্যুজুয়াল—

অগত্যা একটা সময় বলতেই হয়। মজার আড্ডা। সুনুদা তারই মধ্যে গাড়ি পাঠিয়ে কয়েক কাপ কফি আনিয়ে ফেলেছেন। এক কাপ দীপঙ্করের হাতে ধরিয়ে—আরে নাও ভাই নাও, কেন রাগ করছো। আর দাও তোমার একটা সিগ্রেট দাও। এ-রকম একটা আড্ডায় কফি-টফি না হলে আবার মানায় না···

দীপঙ্কর যাদবপুর ইউনিভারসিটির ছাত্র। এম-এ ডিগ্রী করে সোজা দিল্লী চলে গিয়েছিল একটা চাকরী করতে। সেখানেই ওর সঙ্গে ওর নায়িকার মোলাকাৎ।

—তোমার স্কুটার ছিল ?

দীপঙ্কর অবাক।—স্কুটার ? কেন, স্কুটার কেন থাকতে হবে ?

পিনাকী মুখার্জি সাংঘাতিক একটা নিরীহ মুখভঙ্গী করে বললেন—

দিল্লীর প্রেমে শুনেছি স্কুটার নাকি থাকতেই হয়। মানে নায়িকাকে নিয়ে ফতেপুর সিক্রি ট্রাভেল-ইন-ট্যাকসি শুনেছি বেশ কস্টলী।

দীপঙ্কর হেসে অস্থির।—উদ্ভট কথা। এক্কেবারে উদ্ভট। তবে আমার গাড়ি ছিল—অফিসের।

অফিসের কাজে দীপঙ্করকে প্রায়ই দিল্লীর আর একটা অফিসে যেতে হতো। বান্টি ওখানে—

আর একটা সোরগোল—গিন্নীর নাম—

কাট-টু দীপঙ্কর, ক্রুদ্ধ ভঙ্গী—হ্যাঃ ব্যান্টি—

—আহা চটে যাচ্ছেন কেন?

সুমুদা সমবেদনায় একখানা হয়ে তৎক্ষণাৎ—আহা বেচারি ক্রমে একটা রোমান্টিক পরিণতির দিকে যাচ্ছে, ওকে মাঝখানে বাধা দেওয়া কেন বাপু?

অপর্ণা ফিক ফিক।—যতসব বেরসিক। হ্যাঁ তারপর—

দীপঙ্কর এখন আর স্মরণ করতেই পারল না যে, কে আগে অ্যাপ্রেস করেছিল। একবার বললে, মনে হচ্ছে যেন বান্টি-ই, না না না, ভুল হচ্ছে আমি আমিই; সেকি আজকের কথা, সরি আমার ঠিক স্পষ্ট মনে পড়ছে না—

অপর্ণা হেসে কুটিপাটি—নাঃ, আপনি কিন্তু এড়িয়ে যাচ্ছেন। এসব দিনের কথা কেউ কি কখনও ভুলতে পারে? মানুষের জীবনে একবারই আসে। আর সারাজীবন আমাদের স্মৃতিতে সেই আনন্দের বিষাদের উত্তাপের মুহূর্তগুলি থেকেই যায়···

হঠাৎ কি যেন হলো। দীপঙ্কর সামনের দিকে লম্বা করে তাকাল। মুখে মৃদু মধুর হাসি। কিছু বলল না। আসলে আর কিছু ওর বলারও ছিল না। পিনাকী মুখার্জি, সুনীল রায়চৌধুরী তখন পড়লেন সহকারী পরিচালক শ্যামল চক্রবর্তীকে নিয়ে। শ্যামলের বিয়ের দিন দ্রুত ঘনিয়ে আসছে। বেচারি বাইরে যতই স্মার্টনেস দেখাক—অপর্ণা বললেন, আসলে শ্যামল কিন্তু ভেতরে-ভেতরে প্রচণ্ড নার্ভাস। কারণ, সুখের তীব্র টানাপোড়েন সবই তো ওই নার্ভের মধ্যে······।

মলিনা দেবীর সঙ্গে আজকাল আমাদের দেখা খুবই কম হয়। কিন্তু দেখা হলে মুহূর্তে আন্তরিকতার যে স্নিগ্ধ আবহাওয়া উনি অনায়াসে সৃষ্টি করেন, তার জন্যে আমরা অনেকেই ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ। এই লেখা প্রসঙ্গে ওঁর কথা মনে হল। আমি ওঁর সঙ্গে ইদানীং কাজ করেছি 'বনপলাশির পদাবলী' ছবিতে। এই বয়সে এত পরিশ্রম যে উনি কিভাবে করেন বুঝতে পারি না। প্রায় প্রতি রাতে-ই ওঁর থিয়েটার প্রোগ্রাম থেকে সারারাত জেগে উনি এসেছেন ছবির আউটডোর শুটিং করতে। সবাই অবাক। কয়েকদিন পর পর এই ব্যাপারটা হতে উত্তমকুমার একদিন বললেন, আপনি দেখছি অসম্ভবকে সম্ভব করলেন, এটা আমি কোনদিন ভুলব না।

'মহাপ্রস্থানের পথে' তখন সিনেমায় উঠছে। উনি ছবির সন্ন্যাসিনীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন। পরে জানা গেল—একটা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করলেন উনি। কেউ সম্ভবত এই চরিত্রে মলিনা দেবীর নির্বাচনকে কটাক্ষ করে থাকবে। সেটা ওঁর কানে পৌঁছেছিল। আর যায় কোথা। যে-ক'দিন শুটিং করেছেন—দিনে একবার মাত্র স্বপাক আহার হবিষ্যি করেছেন, রাত্রে শুয়েছেন বিচালির ওপর কম্বল বিছিয়ে, মাথায় তেলের অভাবে চুল রুক্ষ হয়েছে, জট পাকিয়েছে। পরেছেন গৈরিক বসন। থেকেছেন খালি-পা। হয়নি চরিত্র? আলবৎ হয়েছে। ছবি রিলিজ হবার পর ওঁর অভিনয় দেখে সবাই চমকে গেছেন। তারপর 'রানী রাসমণি' ছবি। কি অসম্ভব ব্যক্তিত্বপূর্ণ চরিত্র। মলিনা দেবী দেখুন সে-চরিত্রের কি মহিয়সী রূপ দিয়েছেন পর্দায়। অন্তরালে ঘটেছে: উনি শুটিং করতে এসেছেন, প্রোডাকশন ম্যানেজার জানতে এসেছিল আজ লাঞ্চে উনি কি খাবেন, মলিনা দেবী নিঃশব্দে মাথা নেড়েছেন, আজ উপবাস। তারপর যতদিন ও-ছবির শুটিং করেছেন প্রতিদিনই উপোস, প্রতিদিনই পুজা-অর্চনা। প্রচণ্ড গরমে একফোঁটা জল পর্যন্ত খাননি। প্রশ্ন করতে আমায় একদিন বললেন, ভাই, অভিনয়টা আমার কাছে সাধনা।

আর একটা ঘটনা স্মরণ হচ্ছে, পার্থপ্রতিম চৌধুরীর 'ছায়াসূর্য' ছবির শুটিং হচ্ছে। সেদিন ক্যামেরার সামনে অভিনয় করছিলেন শর্মিলা ঠাকুর

আর মলিনা দেবী। নিজের হতকুচ্ছিত মেয়ে ঘেঁটু (ফুল, যে-ফুলে শিবপুজো হয় না) কোথায় কি একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে এসেছে না কি টাকা চুরি-ফুরি একটা কিছু ঘটেছে। সবার ধারণা—ওটা ঘেঁটুরই কীর্তি। ঘেঁটু যেই মায়ের মুখোমুখি হয়েছে, আর যায় কোথা, রাগে দুঃখে ক্ষোভে মা তখন থর-থর করে কাঁপছেন কারণ যে সন্তানকে কেউ চায় না, সেই ঘেঁটুকে মা সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন। আজ তার বিশ্বাস চলে গেছে—এগিয়ে এসে তিনি ঠাশ-ঠাশ করে মেয়ের গালে দুটি চড় মেরে কান্নায় ভেঙে পড়ছেন—এই হচ্ছে সমগ্র দৃশ্যটা।

রিহার্সাল হলো। মলিনা দেবী তো উড়িয়ে দিলেন। তবে চড়টা তখন মারলেন না—ওটা ভাই টেকের সময় করব। শর্মিলা বললেন, আপনি কিন্তু খুব জোরে মারবেন। তা না হলে আমার রিঅ্যাকশানটা কিন্তু ভাল হবে না···। মলিনা দেবী সহাস্যে ঘাড় নেড়েছিলেন।

টেক।

থর-থর করে কাঁপতে কাঁপতে মা এগিয়ে আসছেন···শেষ পর্যন্ত তুই চোর হলি, চোর! ছি ছি ছি, আজ আমি তোকে—আমি আমি মেরে ফেলব—

ঘেঁটু বলছে—মা তুমি বিশ্বাস কর, আমি চুরি করিনি—

মা এগোচ্ছেন—ওরা বলেছে তুই চোর—তুই চোর, তোকে আমি···মা সপাটে মারবেন বলে হাত তুলেছেন। ঘেঁটু আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করছে না। এই মা তাকে মারবে এটা সে বিশ্বাস করতে পারছে না—

হঠাৎ যেন কি হলো। উদ্যত হাত নেমে যাচ্ছে, মলিনা দেবী কাঁদতে কাঁদতে ফ্লোরে বসে পড়েছেন। চারিদিকে একটা কনফিউশ্যান। কাট কাট। ক্যামেরা বন্ধ হলো। আলো নিভে গেল। শর্মিলা বিব্রত। পরিচালক অপ্রস্তুত। মলিনা দেবী কাঁদতে কাঁদতে বলছেন—না আমি রিনকুকে কিছুতেই চড় মারতে পারব না, কিছুতেই না······

জানতে চাওয়া হয়েছিল, কেন কি হল? উনি ভগ্নকণ্ঠে জানালেন, চড় মারতে গিয়ে আমি আমার মেয়ের মুখ দেখছি ওখানে। আমি পারব না।

ফিল্ম লাইনে প্রচুর গাধার গল্প আছে।

এর একটা গল্প আমার অন্তত বিস্মরণ হবার কথা নয়। একবার আমরা 'হীরের প্রজাপতি' নামে একটা ছবির শুটিং করতে কিছুদিন মাইথনে গিয়েছিলাম। ছবিটি পরিচালনা করছিলেন বিখ্যাত তথ্যচিত্র নির্মাতা শান্তিপ্রসাদ চৌধুরী। দারুণ রাশভারী মানুষ! দীর্ঘদিন বিলেতে কাটিয়েছেন। ওখানে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে দেশে ফিরে ফিল্ম তৈরি করছেন। যাই হোক আমরা উঠেছিলাম ডি. ভি. সি-র ইন্সপেকশান বাংলোয়। খাশা ব্যবস্থা।

শুটিং হচ্ছে হচ্ছে হঠাৎ শান্তিবাবু একদিন আমায় ডেকে বললেন—এবার যে একটি গাধা চাই।

আমি ভাবলাম উনি ঠাট্টা করছেন। হেসে বললাম—পেয়ে যাবেন। কবে চাই?

—কাল, পরশু।

ব্যাপারটা মজার। তৎক্ষণাৎ প্রোডাকশন ম্যানেজার মহাদেব সেনকে ডেকে বললাম—ওহে একটি গাধা চাই।

ও ভাবল—ঠাট্টা। মুচকি হেসে বললে—মাত্তর একটা। তা কখন চাই?

—কাল সকালে। শুটিং-এ লাগবে। ডিরেকটারের অর্ডার।

— অ।...পুরুষ্টু?

—হ্যাঁ।

—বেশ পাবে।

সেদিন আর বেশী কথা হলো না। দিন দুয়েক পর শান্তিবাবু আবার ডেকে পাঠালেন।

—পেয়েছো?

—কী?

—গাধা?

—গাধা?

তারপর এসব ক্ষেত্রে যা হয়, কেশে গলা সাফ করে আমতা আমতা—ইয়ে অর্থাৎ—ওটা বাস্তবিক ছবিতে লাগছে তাহলে ?

শান্তিবাবু অবাক। —লাগছে মানে নিশ্চয় লাগছে। তুমি ঠাট্টা ভাবলে নাকি ?

এরপর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকার কোনো অর্থ হয় না। আমি ধাঁ। আরে রামচন্দ্র। কেলেঙ্কারী আর কাকে বলে। এক ছুটে মহাদেব সেন—এই যে মাস্টার, সেই গাধার ব্যাপারটা সেদিন বলেছিলাম, তার কি হলো ?

তখনও ওর ধারণা এটা ঠাট্টা। একগাল হেসে আমায় কিছু বাক্য দেবার উদ্যোগ করতেই—আরে না না, ব্যাপারটা সিরিয়াস। গাধা লাগবেই। শান্তিবাবু তো জোর করলেন। এখন একটা ব্যবস্থা করো।

—সত্যি সত্যি গাধা লাগছে ?

—হ্যাঁ ভাই।

মহাদেবের মাথায় হাত। ওর সন্দেহ এ তল্লাটে গাধা বোধহয় নেই। থাকলে নিশ্চয় একটা দুটো চোখে পড়ত। মহাদেব একটা ব্যাকুব ভঙ্গী করে বললে—দেখছি খুঁজে—

রাত্রে বললে, অসম্ভব গোটা মাইথন চষেছি, এখানে গাধার 'গা' নেই। ও বাপু আমি পারব না। তুমি শান্তিবাবুকে বলে দাওগে।

'একটা গাধা খুঁজে বের করতে পারলে না' ফিক ফিক হাসির ডোজে চড়ানো এই কথাটা শোনার জন্যে কার ইচ্ছে আর শান্তিবাবুকে গিয়ে 'ওটা মশায় পাওয়া গেল না' বলে ?

আমাদের হন্তদন্ত ভঙ্গী দেখে অনুপকুমার জানতে চাইলেন, কী ব্যাপার তোমাদের—প্রবলেমটা কী ? মহাদেব ফস করে বললেন—গাধা ! ডিরেকটারের রিকুইজিশন শটে গাধা দেখাবেন, অথচ······

অনুপকুমার আমায় জনান্তিকে ডেকে বললেন, একদম চেপে যা। আমায় যা বলেছিস বলেছিস, আর কেউ শুনলে তোদের লাইফ হেল করে ছাড়বে। গাধা একটা খোঁজার জিনিস হলো, এঁ্যা ?

তখন যাওয়া হলো মাইথনের এক সবজান্তা ভদ্রলোকের কাছে। তাঁকে এটা সেটা নানা বাক্য দিতে দিতে সুযোগ বুঝে জিগ্যেস করা হলো হ্যাঁ মশাই, একটা গাধার সন্ধান দিতে পারেন ?

এক লহমা চুপচাপ। তারপর হঠাৎ ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে আইসক্রীম গলায় বললেন, মশায় বয়সটা আপনাদের চাইতে আমার কিঞ্চিৎ বেশী-ই। আর আমার বৈঠকখানায় বসে আমার সঙ্গে এয়ার্কি—এটা এট্টু বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে। আপনারা এক্ষুনি কেটে পড়ুন—

—মানে ব্যাপারটা…

—নো নো নো কিছু শোনাশুনি নেই…কি আসপদ্দা, আমার কাছে গাধা খুঁজতে এয়েচে, গেট আউট গেট আউট—

রাস্তায় পড়ে মহাদেব আমাকে দু'দুবার হত্যা করার ব্যর্থ চেষ্টা করল। তোমার জন্যে এই হেনস্থা—

এরপর রাস্তার লোক ধরে ট্রাই করা হলো। তারা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমাদের দেখে-টেখে সরে পড়ল। কিছু বললই না। বটগাছের তলায় এক সাধু বসে নানা কেরামতি করছিলেন, তাঁকে প্রশ্ন করতে তিনি বললেন এখানে পাবে না বাপু, আমি সব খবর রাখি। তোমরা বরং আসানসোলে যাও। বাজারের পেছনে ধোপাদের একটা বস্তি আছে…

ডি. ভি. সি-র একটি ভ্যান আমরা সারাক্ষণের জন্য ভাড়া নিয়েছিলাম। ড্রাইভারটি স্থানীয় লোক। নাম ইয়াকুব। শান্তশিষ্ট ধরনের লোক। কাট-টু আসানসোল। অনেক খুঁজে পেতে শেষে ধোপাদের আস্তানাটা পাওয়া গেল। তখন সবে সন্ধ্যে হয়েছে। ঘরের সামনে একটি লোক বসে হুকো খাচ্ছিল। অতগুলো সাহেবকে দেখে সে অবাক—কি চাই আইজ্ঞা ?

—তোমার নাম ধলা রজক ?

—হঁ আইজ্ঞা।

—তোমার গাধা আছে ?

—গাধা ? হঁ আইজ্ঞা।

—ওটা আমাদের চাই।

বলতেই ধলা রজকের চোখ কপালে।—কেনে? গাধাটো আপনাদের চাই কেনে?

বুঝিয়ে বলা হলো, গাধা বায়োস্কোপে নামবে আহা কি কপাল ব্যাটার —ধলা রজক আফশোষ করলে—ও পারবেক নিই বাবু, শালা বড় টেটিয়া হ্যঁ হ্যঁ হ্যঁ চিল্লাই বাবু গাঁ-টা মাৎ করবেক, মনে লিচ্ছে কাজটা ও পারবেক নাই—

—সে দায়িত্ব আমাদের, আমরা বুঝিয়ে বললাম, তবে মাগনায় নয় হে টাকা কিছু সেই সঙ্গে আমরা দেব, খোরাকী, রাহা খরচা। শুনে ধলা রজক সামান্য চিন্তা করল। ততক্ষণে সেখানে একটা ছোটখাটো ভিড় জমে গেছে। সবার চোখে মুখে কৌতূহল। গাধা সিনেমায় নামবে—এ কল্পনারও অতীত। তারপর কিঞ্চিৎ প্রাপ্তিযোগ আছে। কেউ কেউ বলেই ফেলল গাধাটো কেনে আইজ্ঞা, আমাদেরকেই দেন কেনে নামায়ে। তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে একচোট বিতণ্ডা। আমরা বললাম, না, গাধাটা চাই।

শেষে ধলা রজক একটা প্রশ্ন তুলল—ওঁয়াকে কবে চাই আইজ্ঞা?

—কাল ভোরবেলায়। সামান্য একটু কাজ। দুপুর নাগাদ আমরা ওকে বিদায় করে দেব।

ধলা রজক বললে যে তার গাধাটা বড় হতচ্ছাড়া, পোয়াটেক পথ বড়জোর হাঁটবে, তার বেশী নয়। অতএব আমরা বললাম, ঠিক আছে, আমরা ভ্যানে চাপিয়ে ওকে লোকেশানে নিয়ে যাচ্ছি যেমন তেমনি পৌঁছে দেবার ব্যবস্থাও হবে। দুখানা দশ টাকার নোট হাতে পেয়ে ধলা রজক খুব উল্লসিত। ভোঁ করে দৌড়ে গিয়ে গাধাটাকে ধরে বললে—লিয়ে যান এজ্ঞে।

আমরা গাধা নিয়ে চলেছি আর পাড়া ভেঙ্গে লোক চলেছে আমাদের পেছন পেছন। সবাই মজা পেয়েছে এই ঘটনায়। ভ্যান ড্রাইভার ইয়াকুবকে খুঁজে পাওয়া গেল না। জ্যোতি রায় বললেন, সে হবেখন। আগে গাড়িতে মাল লোড করো।

সে এক কাণ্ড। গাধা গাড়িতে আর উঠতে চায় না। গলায় দড়ি বেঁধে হেইয়ো হেইয়ো টানাটানি কিন্তু ব্যাটা নড়েচড়ে না। বাজারের মুখোমুখি এই কাণ্ড দেখে লোকের কি প্রচণ্ড ভিড়। নানা মানুষের বিভিন্ন মন্তব্য শুনতে শুনতে মহাদেব সেন তো ক্ষেপে লাল। এমন সময় ইয়াকুব এসে হাজির। পরিচিতি লোকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। সেখান থেকে পান চিবুতে চিবুতে এসে এই কাণ্ড দেখে তার চক্ষু স্থির। হাউমাউ করে ভিড় ঠেলে সে এসে বললে—একি করছেন, একি করছেন ?

মহাদেব তখনও ক্ষিপ্ত।—দেখতেই তো পাচ্ছো। নাও, একটু ঠেলে তোলো ব্যাটাকে।

দু পাশের ঠেলায় গাধা ততক্ষণে তার কণ্ঠ দিতে শুরু করেছে। হুঁ হুঁ করে কি বিকট আওয়াজ তার। সবার কান ঝালাপালা হবার দাখিল। ইয়াকুব হাতজোড় করে বললে—বাবু আমার সব্যনাশ হয়ে যাবে।

—কেন কেন ? তোমার আবার কি হলো ?

ইয়াকুব বললে—কি সব্বোনাশা কাণ্ড করছেন আপনারা বুঝতে পারছেন না স্যার। আমার চাকরী চলে যাবে। এই ভ্যানে গাধা যদি সওয়ারী হয় তো আমার লাইসেন্স বাতিল হবে। কেউ রুখতে পারবে না।

জ্যোতি রায় বললেন—আঃ, তুমি একদম কথা বলো না। বলে দুখানা দশ টাকার নোট তার হাতে গুঁজে দিলেন। ব্যস, সব ঠাণ্ডা। উল্টে ইয়াকুব গিয়ে গাধাটাকে ভটাভট কষে দুটো লাথি—এঃ, ব্যাটা সেন রাজার ছেলে, কোলে করে গাড়িতে তুলতে হবে। চল্—

স্থানীয় লোকেরা গাধাটাকে যথেষ্ট অপমান করল। একচোট মুষ্টিযোগও দেওয়া হলো। তারপর ধলা রজক এসে কি সব ট্রিক করল ব্যাটা সুড় সুড় করে গাড়িতে উঠে সটান শুয়ে পড়ল প্লাটফর্মে। আমরা রাতদুপুরে গিয়ে পৌঁছালাম মাইথনে।

সেই গাধা নিয়ে আমরা পুরো একটা দিন শুটিং করেছিলাম। এখন তাড়াহুড়োয় হয়েছে কি ওর আওয়াজ রেকর্ড করা হয় নি। কলকাতায়

ফিরে ছবির প্রোজেকশান দেখে শান্তিবাবু বললেন—সব ঠিক আছে, কিন্তু গাধাটার সাউণ্ড কোথায়? শটের মধ্যে যে চেঁচিয়েছে, সব বোঝা যাচ্ছে—

অতএব আবার গাধার ডাক রেকর্ডিং। মহাদেব সেন শুনেই চাকরী ছেড়ে দিয়ে হাওয়া দিল। আমি প্রধান সহকারী। আমার সরে পড়ার রাস্তা নাই। দিন দুয়েক কলকাতার বিভিন্ন রজক পাড়ায় পেট্রোল পুড়িয়ে খুব ঘোরাঘুরি হল কিন্তু গাধা আর পাওয়া গেল না। ধাপা অঞ্চলের রজকরা বললে, এই মাগ্‌গি-গণ্ডার বাজারে কে আর গাধা রাখে। তাই আমরা ঠেলায় করে মোট বয়ে যাচ্ছি।

অগত্যা ডাকা হলো কিছু হরবোলাকে। স্টুডিওতে একদিন সবাইকে ডেকে মাইক্রোফোনের সামনে লাইন করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলা হল একে একে ডেকে যান ভাই সকল। আর একটা মনিটার করতেই রেকর্ডিস্ট প্রায় উন্মাদ। কিন্তু সে-ডাক শান্তিবাবুর পছন্দ হলো না। আমরা ছবিতে শেষ পর্যন্ত গাধার ডাক না দিয়েই রি-রেকর্ডিং করে দিলাম।

কিছু দিন আগে 'আবদাল্লা মর্জিনা' ছবিতে কিছু গাধার প্রয়োজন পড়েছিল। এই বস্তু তো আর ভাড়ায় পাওয়া যায় না। অতএব দীনেন গুপ্ত দূর-দূরান্তের এক বাজার থেকে না কোত্থেকে যেন দুটি গাধা কিনে এনেছিলেন। ওরা স্টুডিওতেই থাকত। ছবির কাজ শেষ হবার পর দীনেন গুপ্ত স্থির করলেন—বেচে দিতে হবে। কিন্তু ক্রেতা? কেউ আর গাধা কিনতে চায় না। দু-একজন রজককে পটিয়ে-পাটিয়ে আনা হয়েছিল। তারা এমন দর দিল যে দীনেন গুপ্ত হেসে অস্থির। হাজার টাকার মাল মাত্র বিশ টাকায় বিক্রি! কাটো ভাই, সোজা কেটে পড়। তারপর দীনেন গুপ্তের অর্ডার—ওদের মুক্তি দিয়ে দাও। অ্যাদ্দিন ঘরের খেয়েছে, এবার চরে খাক। ওদের বাঁধন কেটে দেওয়া হল। কিন্তু কিছুতেই স্টুডিও ছেড়ে যেতে চায় না। দুপুরে খাবার সময় হলে হঁ হঁ করে বিকট চেঁচায়। শুটিং-এ বিঘ্ন হয়। রেকর্ডিস্ট ভদ্রলোক থান ইঁট ছুড়ে মারেন রাগের চোটে। তবুও যেতে চায় না। এতই বেহায়া। প্রমাদ গুণে

দীনেন গুপ্ত শেষ পর্যন্ত গাধা দুটিকে একজন শান্তশিষ্ট ক্রেতাকে বিনামূল্যে গছিয়ে দিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

'বিলাত ফেরৎ' ছবিতে একটি গাধার দরকার পড়ায় গাধা কেনা হয়েছিল। একদিন রাত্রে বালিগঞ্জে শুটিং। সেখানে গাধার প্রয়োজন পড়ল। প্রোডাকশন ম্যানেজারের মুখ শুকিয়ে চুন, কি করে লোকেশানে নিয়ে যাবে? দেরী হলে কেলেঙ্কারী। পরিচালক তাড়াতাড়ি নিয়ে যেতে অর্ডার দিয়েছেন। বেচারা। করলো কি একটা অ্যাম্বাসাডার গাড়ি ভাড়া করে তার ড্রাইভারকে ডবল টাকা কবুল করে গাধাকে ঠেলে তুলল গাড়িতে। তাতে তার কি বিকট চিৎকার। ছবি শেষ হবার পর গাধাটিকে নিয়েও বেধেছিল একই সমস্যা। পরে একজন অনিচ্ছুক রজকের কাঁধে চাপিয়ে তবে সকলের রেহাই। ব্যাটা পাড়ার লোকের ঘুম মাটো করছিল বলে দ্রুত অভিযোগ উঠছিল।

একদিন জয়শ্রী রায়ের সঙ্গে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে আমাদের তুমুল আড্ডা হয়ে গেল। জয়শ্রী আড্ডা দিতে ভালবাসেন। ওঁর বক্তব্য, আড্ডা না দিতে পারলে ঠিক কাজ করার মেজাজ আসে না।

একজন নবাগতা নায়িকাকে নিয়ে আমাদের বেশ কৌতূহল আছে। তিনি নাকি এখন গভীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন। অবিবাহিতা কুমারী মেয়ে স্ক্রীনে সবে নাম-টাম করেছেন—অতএব প্রেমে পড়বেন—এ আর কি এমন আশ্চর্য কথা? কিন্তু যার সঙ্গে তিনি প্রেমে পড়েছেন বলে বাজারে কথা চালু হয়েছে, মুস্কিল বেধেছে তাঁকে নিয়েই। ছেলেটি খুব বুদ্ধিমান। নায়িকার সঙ্গে হুট করে প্রেমে পড়ার মত ছেলে নন তিনি। নায়িকার সঙ্গে প্রেমে পড়লে অনেক হুজ্জুৎ অনেক হ্যাপা। সে-সব সামলে প্রেম চালিয়ে যাওয়া, উঁহু মনে হয় না তাতে উনি রাজী হবেন।

জয়শ্রীকে প্রশ্ন করতে উনি মিটি মিটি হেসে বললেন, ওসব আমি জানি না বাপু। কে কার সঙ্গে প্রেমে পড়ল—তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।

জয়শ্রী বললেন বটে, কিন্তু কথার ভঙ্গীতে বোঝা গেল মাথাব্যথা খুব আছে। আমি আরও ন্যাড়া করে কিছু কূট প্রশ্ন করতে—

—আঃ ভাল্লাগে না এসব কথা—

সবাই চুপ। চুপ কিন্তু মিটিমিটি হাসি। ভাবখানা, সবাই জানি সবাই বুঝি অতএব···

জয়শ্রী রায় সুন্দরী মেয়ে। কনভেণ্টে পড়া মেয়ে। একবার এক বিউটী কনটেস্টে 'মিস ক্যালকাটা' হয়েছিলেন। হাসলে ওঁর গালে সুন্দর টোল পড়ে। মুখশ্রী আরও স্নিগ্ধ হয়। উনি বেশ থেমে থেমে চাপা নরম ভঙ্গীতে কথা বলেন। আর হ্যাঁ, যত বলেন তার চেয়ে বেশী মনোযোগ দিয়ে শোনেন। দু-হাঁটুর ওপর থুতনী রেখে, একদৃষ্টে সাগ্রহে শোনার যদি তেমন ইণ্টারেষ্ট পান।

সেদিন টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওর মাঠে বসে আমরা, ওদিকে লোড শেডিং চলছে, একজন বিখ্যাত কমেডিয়ান হেঁটে যাচ্ছিলেন, বিরক্ত ভ্রূকুঞ্চিত মুখ, আমি হেঁকে—কোথায়?

—শুটিং-এ।

—কি ছবি?

—তিন পরী ছয় হুলো—বলে তিনি ধাঁ করে অদৃশ্য হলেন ওই প্রকাশ্য দিবালোকে। আর জয়শ্রী হেসে হেসে হেসে অস্থির। হাসির গমকে তার শরীর কেঁপে কেঁপে কেঁপে, একজন ভাগ্যিস 'হ্যাচ্চো' দিয়েছিল, জয়শ্রী ব্রেক কষার মত থেমে শেষবারের মত—তিন পরীর কথা বুঝলাম, আমি নিজেই একজন পরী, কিন্তু ছয়—

বাকিটা বলা হতেই পারে না কারণ ছাই হাসিটা এতই দুরারোগ্য ব্যাধি যে বড় বড় ডাক্তারও ফেল পড়ে যায়। আর সুন্দরী মেয়েরা হাসলে তারা আরও বেশী করে ফেল পড়ে। বিশেষ করে সেই সুন্দরী মহিলা যদি আবার ফিল্মের নায়িকা হয়···। বলা বাহুল্য, উল্লেখ্য ছবিটির নাম 'তিন পরী ছয় প্রেমিক'।

জয়শ্রী বললেন, আমরা পিকনিকের আউটডোরে গিয়ে একবার একটা

মজা করেছিলাম। আমরা ছিলাম তিনজোড়া। আমি, আরতী, অর্চনা (বোম্বের বাঙালী নায়িকা, ডাক নাম বুলা)। আর ছেলেদের ভেতর ছিল রঞ্জিৎ মল্লিক, সমিত ভঞ্জ, ধৃতিমান চ্যাটার্জি।

পিকনিক ছবির আউটডোর হচ্ছিল বিহারের তোপচাঁচী লেকে। পরিচালক ইন্দর সেন। একটানা প্রায় পঁচিশ দিনের আউটডোর। ফলে সবাইকে মানিয়ে নিয়ে ওখানেই থাকতে হয়েছিল। ডাকবাংলো ছাড়া ঝরিয়া ওয়াটার ওয়ার্কসের দু-একটি খালি বাড়ি এ-বাবদ নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। জয়শ্রীরা সবাই ছিল বাংলোতে, ছেলেরা কিছু দূরের একটি কোয়ার্টার্সে। আর ছবির দৃশ্যে দৃশ্যে যারা রোল করবে, প্লে-ব্যাক গানে ঠোঁট মিলিয়ে গান করবে, হাসবে, কাঁদবে, ঝগড়া করবে এবং সবশেষে ভালবাসার জোয়ারে উহুঁ উহুঁ··· প্রতিদিন শুটিং-এর পর যখন বিকালের পড়ন্ত আলোয় পথ চিনে পাখীরা কুলায় ফিরবে, দেহাতি মানুষেরা যখন পাহাড় টপকে নিজেদের বস্তিতে ফিরে যাবে, তোপচাঁচীর আকাশ ছেয়ে যখন মসলিন অন্ধকার ক্রমে ক্রমে গাঢ় কালো মখমল হয়ে যাবে, তখন? নায়ক-নায়িকারা মুখের রং ধুয়ে-মুছে নিশ্চয়ই মুখোমুখি বসবে—দু দণ্ড আলাপের বনলতা সেন হয়ে, না কি জয়শ্রী?

জয়শ্রী বললেন—সে আর বলতে। মেকআপ তুলে ছবির কস্ট্যুম ছাড়তেই যেটুকু সময়, তারপর তাড়াতাড়ি সামান্য একটু চা-খাবার খেয়েই ওরা ছুটিতে রোজই উধাও—

—এ্যাঁ? ওরা বলতে কারা?

—বুলা আর ধৃতিমান।

—আরেব্বাস, তাই নাকি?

জয়শ্রী হেসে বললেন, ব্যাপারটা প্রথমে খুবই মামুলী ছিল। ওরা শুটিং-এর সময় একটু বেশী যা গল্প-সল্প করতো। আমরা ভাবলাম, একটা কিছু তো করতে হবে। তাই ওদের দুজনকে টার্গেট করা হলো। যখনই দেখা হয়, মিষ্টি করে হেসে—ইয়ে, এই যে ধৃতিমান, বুলা কোথায়?

—বুলা? ধৃতি অবাক।—কেন, ওই তো লোকেশানে বসে আছে। শট দিচ্ছে।

—অ।...তা একলাটি বসে আছে কেন। একটু কম্পানী দিন। বেচারি মুষড়ে পড়েছে মনে হচ্ছে। দেখছেন না—স্লাইট বিরহিনী ভঙ্গীতে তাকাচ্ছে। আপনাকেই খুঁজছে বোধ হয়—

ধৃতিমান প্রথমে ব্যাপারটা ধরতে পারে নি। পরে যখন—

—এই যে বুলা—

—উঁ?

—একা একা কেন ভাই—আরতিই প্ল্যান ভেঁজে নিয়ে হয়ত পেছনে লাগল, ওদিকে ধৃতি যে ছটফট করছে—

—ধ্যাৎ ধ্যাৎ—সলজ্জ ভঙ্গীতে জবাব দিয়েছে বুলা।

অথচ এই করতে করতে ওরা যখন বাস্তবিক ফিল্ডিং-এ নেমে পড়ল, তখন সবাই চুপ।—আরে যাঃ, সত্যিই ওরা প্রেমে পড়ল নাকি?

আরতি তখন মুখ ঠোঁট ফুলিয়ে—পড়লই তো। যেমন লেগেছিলে পেছনে। আমার পেছনে লাগলে হয়ত আমিও—

বয়সটাই এমন প্রেমে প্রেমে প্রেমে ভেসে ভেসে ভেসে হাল্কা মেঘে মেঘে মেঘে—পড়তেই চায় প্রাণ। বেশীর ভাগ ফিল্ম তো ওই নিয়েই। আর বেশীর ভাগ দর্শক ওই নিয়েই। সব পাঠক-পাঠিকাও ওই নিয়ে। জয়শ্রী বললেন, উঃ, আমাদের কি মজা। প্রবীর এসেছিল লোকেশানে (জয়শ্রীর স্বামী), সব শুনে সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে মন্তব্য করল—তোমরা ডেঞ্জারাস। জয়শ্রীর ভ্রূকুটি—কেন, ডেঞ্জারাস কিসে? তুমি প্রেম করো নি আমার সঙ্গে? দিনের পর দিন ঘোরোনি আমার জন্যে?

প্রবীর তৎক্ষণাৎ রণেভঙ্গ। বাই বাই করে সটান কলকাতার পথে নিজের গাড়িতে। জয়শ্রী হেসে বন্ধুদের বললে—পালিয়ে বাঁচল প্রবীর।

এবার টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে আমি মানে রঞ্জন মজুমদার বল্লাম, বাবু, এবার একটা সলিড গল্প বলো, পাঠক-পাঠিকাদের শোনাই। গেঁজিয়ে যাচ্ছে যে—

জয়শ্রী বললে, বাজে কথা, জমিয়ে লিখতে না জানলেই বরং সে ভয়টা থাকে। যাকগে, এবার মূল কাহিনীতে আসা যাক। প্রতিদিন শুটিং শেষ হবার পর আমরা সব গল্প করতে বসতাম। দেখতাম, ধৃতি আর বুলা প্রতিদিন একটু একটু দূরে সরে যাচ্ছে। শেষটায় ওরা পাহাড়ের নীচের দিকে নেমে যেতে আরম্ভ করল। আমাদের চোখের সম্পূর্ণ আড়ালে। আমরা তখন ওদের থেকে নজর সরিয়ে সামনের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে নানা মজার গল্পে-সল্পে ডুবে থাকতাম। এই রকমই একদিন, আমি আরতি সমিত প্রবীর গোল হয়ে বসে আছি, ম্যারাথন আড্ডায় মশগুল, অনেকক্ষণ সময় কেটে গেছে, ধৃতিরা এখনও ফেরেনি, অন্ধকার ঘুট ঘুট করছে, হঠাৎ আমার নজর পড়ল সামনের পাহাড় থেকে শাদা পোশাক পরা লম্বা মত একটি মানুষ নেমে আসছে নীচের দিকে। আমার খটকা লাগল। এই অন্ধকারে জঙ্গল মাড়িয়ে লোকটা নামছে কি করে? আলো না নিয়ে? আমি প্রবীরকে খোঁচা দিতে সে আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে তৎক্ষণাৎ তাকাল। সে-ও অবাক। ব্যাপারটা সকলের নজরে পড়ে গেছে। সমিত অবাক। আমার দিকে সপ্রশ্নে তাকাল। আমি ভ্রূ-ভঙ্গী করে আমার অজ্ঞানতা বোঝালাম। মানুষটি নামছে ঠিক যেন সিনেমার শ্লো-মোশানে। হাটছে না, যেন বাতাসে ভাসছে। কাছে আসছে, কিন্তু একটা মানুষের শরীরের আউটলাইন ছাড়া অবয়বটা পরিষ্কার হচ্ছে না আমাদের চোখে। হয়ত গাঢ় অন্ধকারের জন্যেই। কি জানি। লোকটা রাস্তায় নেমে বাঁ দিকে ঘুরে ব্যারেজের দিকে নামতে আরম্ভ করল। আমরা সবাই তীক্ষ্ণ নজরে সেদিকে তাকিয়ে। আরে, ওর কি মাথা খারাপ? অত উঁচু থেকে নেমে আবার কোথায় চলেছে? উত্তেজনায় সমিত ভঙ্গ তো ঠেলে উঠেই দাঁড়াল, ইয়েস, লোকটা ব্যারেজের দিকে ওই রকম শ্লো-মোশানে, যেন হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে নেমে যাচ্ছে। আমরা হতভম্ভ। হঠাৎ উল্টোদিক থেকে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। অন্ধকার ভেদ করে ধৃতি আর বুলা দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে। উত্তেজিত ভঙ্গী।

—তোমরা এতক্ষণ এখানে ছিলে সবাই?

ধৃতির জবাবে আমি বললাম—হ্যাঁ, কেন?

সামান্য ইতস্ততঃ করে ধৃতি বললে—দেখ, একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম। আমাদের প্রায় গা ঘেঁষে একটি লম্বা মত লোক, মুখটা ঠিক দেখতে পেলাম না, নীচে ব্যারেজের দিকে নেমে গেল। আমাদের ডাকে সাড়া পর্যন্ত দিল না। ব্যাপারটা কেমন আনক্যানি লাগছে। তাই তাড়াতাড়ি চলে এলাম—

আমরা সমস্বরে বললাম, আমরাও দেখেছি, তোমরা যেদিকে ছিলে, ওই দিকেই যাচ্ছে—

বুলার সুন্দর মুখে নিমেষে ভয়ের ছাপ।

ধৃতিমান পুরুষ মানুষ। হেসে ব্যাপারটাকে হাল্কা করবার চেষ্টা করে বললে—নিশ্চয় স্থানীয় কোন লোক। তবে লোকটার সাহস আছে স্বীকার করতেই হবে। ব্যারেজের ওপাশের কোন গ্রামে যাচ্ছে বোধহয়।

কাট-টু পরের দিন সেই একই সময়। ধৃতিরা যথারীতি প্রেম করতে ব্যারেজের দিকে অদৃশ্য হয়েছে। আমরা কজন বসে আছি পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে। অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে ক্রমশঃ।

মুখ ফুটে না বললেও সবার মনের মধ্যে আগের রাত্রের ব্যাপারটা খচ্‌খচ্‌ করছে। দেশলাই জ্বালিয়ে সমিত সিগারেট ধরাচ্ছে, প্রবীর সেই আগুনে নিজেরটা ধরাবে বলে সামনে যেই ঝুঁকেছে—

আরতি হঠাৎ যেন মৃদু আর্তনাদ করল। আমরা যন্ত্রচালিতের মত সামনের দিকে তাকিয়েই রোমাঞ্চিত; লোকটা নামছে। সেই শাদা পোশাক, সেই শ্লো-মোশান, সেই সবকিছু অবিকল গত রাত্রের মত।

সমিত বরাবরই ডানপিটে। হাতের সিগ্রেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অস্ফুট কি যেন উচ্চারণ করতে করতে উঠে দাঁড়াল। তারপর আমরা বাধা দেবার আগেই লোকটাকে অনুসরণ করে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল। আমরা ত্রিশ গজের মধ্যে দুজনকে দেখতে পাচ্ছি। সমিত দ্রুত পা চালাচ্ছে, লোকটাকে পেছন থেকে ধরবে বলে, কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি—অসম্ভব। দুজনের সমান দূরত্ব থেকেই যাচ্ছে। সমিত চেঁচাচ্ছে—কোন

হায়। ঠ্যাহর যাও—। লোকটি দাঁড়াচ্ছে না। একই গতিতে, যেন ভাসতে ভাসতে ব্যারেজের দিকে নামছে। এক সময় সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এবার সমিত ফিরছে। হেঁটে নয়, যেন দৌড়ে।—ওরা কোথায়? ধৃতি, বুলা? ওরা কোথায়?

দূর থেকে ওদের আওয়াজ পাওয়া গেল। ওরাও ছুটছে।—এই যে আমরা, বুবু উই আর হিয়ার—

ধৃতি অন্ধকারের ভেতর থেকে ছুট্টে বেরিয়ে এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল। পরিষ্কার ভয় পাওয়া মানুষের চেহারা। বুলা আমার শরীর ঘেঁসে দাঁড়াল। কাঁপছে। সমিতের (বুবু) কণ্ঠে প্রবল উত্তেজনা। বললে, এক মুহূর্ত আর এখানে নয়। লেটস গো ব্যাক—

আমরা এতগুলো মানুষ, এক রকম ছুটতে ছুটতে ডাকবাংলোয় ফিরে এলাম। সবাই হাফাচ্ছে। সবাই সবায়ের দিকে তাকাচ্ছে, কিন্তু কেউ কোন কথা বলছে না। আসলে বলার মত পরিস্থিতিও নয়।

ধৃতিমান অনেকক্ষণ পরে বললে—এখন যে যার ঘরে চলে যাওয়াই ভাল। কাল কথা হবে। গুড নাইট।

কাট-টু-কাট পরদিন আমাদের শুটিং-এর শেষ দিন। ইন্দরকে আমরা কিছু বলিনি। কি হবে বলে? দিনের আলোয় পাহাড়, লেক, রাস্তা, ঘাট সব পরিষ্কার। রাতটা যেন দুঃস্বপ্ন। ফরগেট-ফরগেট।

ইন্দর বলল, ভাই আজ নাইট শুটিং-ও করতে হবে। ডে-নাইট প্রোগ্রাম করে লোকেশান শুটিং করতে পারলে তবে এযাত্রা আউটডোর শেষ হতে পারে। তোমাদের সকলের সহযোগিতা চাই—

সবাই একবাক্যে রাজী হয়ে গেল। দীর্ঘ দিন বাইরে থাকার ফলে এখন কলকাতা সবাইকে আকর্ষণ করছে। সবাই এবার বাড়ি ফিরতে চাইছে।

কিন্তু রাত্তিরবেলা? আবার সেই বিভীষিকা? ইন্দরকে বলি-বলি করেও বলা হয়নি কথাটা। সেদিন আবার পরিপূর্ণ অমাবস্যা। কে যেন কথাটা শুনিয়ে দিল। রঞ্জিৎ মল্লিক ডাকবাংলোর চৌকিদারকে প্রশ্ন

করেছিল—এটা কি ব্যাপার। চোখের বিভ্রম নয়ত? সে লোকটা স্পষ্ট জবাব দেয়নি। তা-না-না-না করে পাশ কাটিয়েছে। রাত্রে শুটিং হবে জেনে জয়শ্রী নিজেই চৌকিদারকে ডেকে পাঠাল। প্রথমে লোকটা কিছুতেই বলতে চায় না। পীড়াপীড়ি করতে শেষ পর্যন্ত কবুল করল, ব্যারেজের পেছনে যে-ঘর, সেখানে বেশ কিছু দিন আগে একটি লোক আত্মহত্যা করেছিল। নিশ্চয় কোন পারিবারিক ব্যাপার ছিল। চৌকিদার স্বীকার করল, তারপর থেকে নিয়ম করে এটা হচ্ছে। অবশ্য কারো ক্ষতি করে না।

—গভীর রাতে দরজা ঠেলাঠেলি, জানলায় ঠক্ ঠক্?

—ওরই কীর্তি।

—না কোন মতলববাজ লোক?

চৌকিদার সভয়ে বললে, নেহি মেমসাহাব, সন্ধ্যার পর লেকের এই অঞ্চলটা জনমানবশূন্য হয়ে যায়। আপনারা আছেন বলে আমি সাহস করে এখানে থাকছি। আপনারা চলে যাবেন, আমিও তালা এঁটে দিয়ে সরে পড়ব। দারুণ খতরনাক জায়গা। এখানে বদমাশলোক আসতেই সাহস পাবে না।

ভরা অমবস্যার রাত্রে সেদিন আমরা যে কী ভাবে শুটিং করেছি, আমরাই জানি। আমি আরতি বুলা রঞ্জিৎ সমিত ধৃতি—সবাই গা ঘেঁসাঘেঁসি করে থেকেছি। রাস্তার ওপর হাজার হাজার ক্যাণ্ডেল পাওয়ারের আলো জ্বালিয়ে শট নেওয়া হয়েছে, কিন্তু সাহস ক'রে আমরা কেউই সামনের পাহাড়ের দিকে তাকাতে পারিনি।

তাহলে বুলা?

—মানে?

—মানে ধৃতিমান, বুলা এরা তাকায় নি?

জয়শ্রীর কি হাসি।—হ্যাঁ তাকিয়েছে, ফাঁকে ফাঁকে নিজেদের দিকে যতটুকু তাকানো যায়। প্রেমের গল্প আর ভূতের গল্প পাশাপাশি চলতে সব সময়ই পারে। এ আর কি এমন একটা বড় কথা?

আজ অকস্মাৎ স্বর্গত ছবি বিশ্বাসের কথা মনে হল।

ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে একটা সাবেক আমলের ছবির প্রোজেকশান হচ্ছিল। ছবি দেখে বেরিয়ে এসে একদল দর্শক অভিভূতের মত ক্যাণ্টিনে বসলেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর হঠাৎ ওঁদের একজন বললেন, ছবিদার অভিনয়ের বাস্তবিক কোন জবাব নেই—

অদূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন ঋত্বিক ঘটক। উনি সম্ভবত নিজের ছবির কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ওঁর সঙ্গে ওঁর ষোড়শী কন্যা, কিশোর পুত্র। ঋত্বিক মুগ্ধ পিতা। বাৎসল্যের মধুর হাসি ওঁর মুখে, সস্নেহে মৃদুকণ্ঠে ওঁদের কি-সব যেন বলছিলেন। আর সেই মুহূর্তে ওঁকে ওখানে দেখে আমার হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সেই ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল।

কল্পনা করুন – ছবি বিশ্বাস আর ঋত্বিক ঘটক মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন। একটা দারুণ ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ অনিবার্য। দুজনেরই দীর্ঘ ঋজু চেহারা, উদ্ধত ভঙ্গী, দর্পিত সংলাপ। হায় লড়াই আসন্ন।

ঋত্বিক তখন শংকরের "কত অজানারে' কাহিনীর চলচ্চিত্র-রূপ দিচ্ছেন। শক্তিমান পরিচালক উনি, একটা অভাবনীয় সম্ভাবনায় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রভূমি তখন অস্থির, ঋত্বিক একটা কালচারাল ফ্রন্ট থেকে এসে সরাসরি চলচ্চিত্রে যোগ দিয়েছেন, নতুন কিছু সৃষ্টির প্রচেষ্টায় টগবগ করে উনি যেন ফুটছেন। আর ওদিকে ছবি বিশ্বাস—বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্রে এক অবিসম্বাদী প্রতিভা। আত্মবিশ্বাস এবং শ্লাঘা—এ দুটিই ওঁর চরিত্রে বিপুলভাবে মূর্ত, ওঁর দাপটের কাছে বেশীর ভাগ মানুষকে নত হতে হয়, প্রয়োজনে আত্মসমর্পণও। নতুন পরিচালক পেলে ছবি বিশ্বাস তাকে বাজিয়ে নেবার অছিলায় কিঞ্চিৎ কচলেও দিচ্ছেন তখন।

টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে 'কত অজানারে'র সেট তৈরী হয়েছে। ছবি বিশ্বাস রেস্পনী, অসীমকুমার সুব্রত ব্যারিস্টার। টেম্পল বারের শেষ ইংরাজ ব্যারিস্টার রিটায়ার করে ভারতবর্ষ ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে যাচ্ছেন ইংল্যাণ্ডে। সুব্রতর কাছ থেকে রেস্পনী বিদায় নিচ্ছেন। বিদায় নেবার আগে তিনি নিজের কালো গাউনটি সুব্রতকে দিয়ে যাচ্ছেন।

রেম্পনী কালো গাউনটি আবার উত্তরাধিকারীসূত্রে পেয়েছিলেন তাঁর গুরুর কাছ থেকে। গাউনটি সম্পর্কে রেম্পনীর আশ্চর্য শ্রদ্ধা, মমতা এবং বিশ্বাস জড়িয়ে রয়েছে। তিনি গাঢ় কণ্ঠে বলছেন, আমি আমার দেশের গ্রামে ফিরে যাচ্ছি। ওখানে গিয়ে আমি একটা কটেজ বানাব, নিজের হাতে বাগান তৈরী করব, জীবনের শেষ কটা দিন ইচ্ছে আছে শান্তিতে ওখানে কাটিয়ে দেব। কিন্তু সুব্রত, এই তোমার জীবনের শুরু। তোমাকে আমার এই গাউনটি দিয়ে গেলাম। যখনই জীবনে হতাশা দেখবে, আত্মবিশ্বাসের অভাব হবে, মামলায় বুঝবে পরাজয়—তখনই এই গাউনটি গায়ে দেবে। দেখবে এই গাউনই তোমায় ঘিরে রাখবে বর্মের মত, কোন আঘাতই তোমায় স্পর্শ করবে না। সমস্ত হতাশা আর পরাজয়ের মাঝখান থেকে এই আশ্চর্য গাউনই তোমাকে সযত্নে টেনে আনবে আলোয়, অনিবার্য জয়ের পথ······

এবার রেম্পনী এগিয়ে যাবেন।

মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে আসবে জুনিয়ার ব্যারিস্টার সুব্রতও।

আসন্ন বিদায়ের বেদনায় দুজনের চোখে আসবে জল। সুব্রতর ঠোঁট আবেগে থরথর করে কেঁপে উঠবে। পিতৃসম এই বৃদ্ধ ইংরেজ ব্যারিস্টার রেম্পনী ওর পিঠে মৃদু হাত বুলিয়ে দেবেন, সান্ত্বনা দেবেন, মুছিয়ে দেবেন চোখের জল।

ভয়ঙ্কর শক্ত দৃশ্য।

আর টেকিং-এর কায়দায় ফেলে তাকে আরও শক্ত করে তুলেছেন ঋত্বিক ঘটক। ক্যামেরা তোলা হয়েছে ক্রেনে। দিলীপরঞ্জন মুখার্জি ক্যামেরাম্যান। দিলীপের স্বাধীনভাবে এই প্রথম ছবি, ইতিপূর্বে উনি সহকারীর কাজ করেছেন। ফলে দিলীপও নার্ভাস। একটাই শট, কিন্তু অন্তত 'আঠারোটা পজিশন' করার ফলে দিলীপের অবস্থা শোচনীয়। দুজন সহকারী নিয়ে তিনি সেটে লাইট করতেই যাকে বলে নাস্তানাবুদ। ঋত্বিক তাঁকে ডেঁটেছেন, যেভাবেই হোক এ-শট আমার পারফেকট চাই দিলীপ, ভুল হলে তোমার কিন্তু রেহাই নেই।

ক্রেনের দীর্ঘ বাহুতে চড়ে ক্যামেরা সেটের মধ্যে বাজপাখির মত উড়বে, ঘুরবে স্থির হয়ে দাঁড়াবে, এগোবে এবং প্রয়োজনে পেছোবেও। কখনও রেম্পনী, কখনও সুব্রত—এঁদের প্রতিটি অভিব্যক্তি স্পষ্টভাবে ধরতে হবে, যেন কোন কিছুই বাদ না পড়ে, আণ্ডারস্ট্যাণ্ড দিলীপ? ঋত্বিকের হুঙ্কার।

বেচারি।—ইয়েস বস। আসলে দিলীপ কাঁপছেন। যেন বলির পাঁঠা।

ফ্লোরে একটা অঘোষিত যুদ্ধ।

আমায় একজন ফিসফিস করে বললেন, কি বুঝলে?

আমিও ফিসফিস—কিছু বুঝতে পারছিনে···কেমন যেন 'গরম' মনে হচ্ছে। কি ব্যাপার বল তো?

চারিধারে চট করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে গলা আরও খাটো করে তিনি বলছেন, যুদ্ধ হচ্ছে যুদ্ধ। ঋত্বিক ঘটক ছবি বিশ্বাসকে আজ একহাত নেবে বলে তৈরী হচ্ছে—

—ছবি বিশ্বাসকে? আমার তো প্রায় আকাশ থেকে পড়া।—সেকি? কেন? ঝগড়াঝাঁটি নাকি?

—প্রায় সেই রকম। ছবিদাও যেমন। যখন-তখন যাকে তাকে টাইট দিয়ে বেড়ান। ব্যাপারটা ঋত্বিকের নয়, মৃণাল সেনকে নিয়ে। কোন একটা ছবিতে মৃণাল সেনকে ছবিদা অনর্থক নাস্তানাবুদ করেছিলেন, ঋত্বিক আজ তার জের টানছে। সহজে ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না।

ঋত্বিক ঘটক আর মৃণাল সেন প্রাণের বন্ধু। মৃণালকে টাইট দেওয়া মানে বন্ধুবৎসল ঋত্বিককেও, ব্যাপারটা এইভাবে কবে কোনদিন ঘটেছিল, আজ প্রতিশোধের সুবর্ণসুযোগ এসেছে যখন···

সভয়ে প্রশ্ন করলাম—তাহলে কি আজ কেটে—

—ধ্যাৎ, তুমি কেন কাটবে, তোমার সঙ্গে তো লড়াই না, মুখে ছিপি এঁটে দাঁড়িয়ে দেখব আমরা। আমাদের কি?

ঋত্বিক ঘটক তখন আগুনের গোলার মত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মাঝে মাঝে কোত্থেকে যেন এলাচওলা পান মুখে পুরে ঘুরে ঘুরে আসছেন। মুখখানা তাঁর ক্রমশ থমথমে গম্ভীর হয়ে আসছে। ফ্লোরে প্রচণ্ড গরম।

ঋত্বিক ঘটকের ভাবভঙ্গী দেখে সবাই সন্ত্রস্ত পা টিপে টিপে চলাফেরা করছে।

কিছুক্ষণ পর ছবি বিশ্বাস ফ্লোরে এসে দাঁড়ালেন।

ঋত্বিক একবার ঘাড় বাঁকিয়ে তাঁকে এক নজর দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ভাল-মন্দ কিছুই বললেন না।

ছবি বিশ্বাসের শরীরটা তখন ভাল যাচ্ছিল না। দিন কতক হাঁফানীর টানটা বেড়েছে। (আহা, এটা সত্যি, এ রোগটা ছবি বিশ্বাসের দীর্ঘদিনের, যেন পোষা একটা কিছু, পৃথিবীতে এমন নজীর আর নেই যে একজন অভিনেতা তাঁর শরীরের পোষা রোগকে নিজের শিল্প সৃষ্টি কাজেও এমন সাফল্যের সঙ্গে লাগিয়েছেন যেমন আছে ছবি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে। নাটকের এক দুরূহ মুহূর্তে ছবি বিশ্বাস তাঁর হাঁফানীর টান-কে এমন সূক্ষ্মভাবে প্রয়োগ করেছেন—একটা প্রয়োজনীয় 'পজ'কে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করেছেন যে ভাবলে সত্যিই অবাক হতে হয়। দর্শকেরা তারিফ করে যখন হাততালি দিয়েছেন তখন তাঁরা বুঝতেই পারেন নি—এটা নিছক হাঁফানীর টান।) ফ্লোরে ঢুকে তিনি যেন বাতাসে কিসের গন্ধ পেলেন। সদা স্তিমিত চোখ দুটি দপ করে একটা সতর্ক ভঙ্গীতে উজ্জ্বল হলো। ছবি বিশ্বাস সারা ফ্লোরে চোখ বুলিয়ে নিলেন। তাঁর অস্পষ্টভাবে মনে পড়ল কয়েকদিন আগে এক বন্ধুর মুখে শোনা—ওখানে একটু মেপে মেপে পা ফেলবেন ছবিবাবু, ঋত্বিক ফিল্মের ল্যাংগুয়েজটা খুব ভাল বোঝেন, বেশ উঁচু জাতের কারিগর। উনি, ওঁরা, কথাটা স্মরণ রাখবেন।

মৃণাল সেনকে ঘাঁটিয়ে সেটা কি উনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ছবি বিশ্বাস? ধীরে ধীরে ফ্লোরের একপাশে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন ছবিবাবু। হাঁফানীর টানটা গরমে আরও বাড়ছে যেন।—কে কোথায় আছো। আমায় এক গ্লাস জল দাও। বুদ্ধিমান মানুষ ততক্ষণে হাবে-ভাবে বুঝে নিয়েছেন পরিস্থিতিটা। তাঁর বিরুদ্ধে এখানে একটা চাপা ষড়যন্ত্র চলছে। কাঁচা ভাষায় তাঁকে ঋত্বিক ঘটক 'এঁটে' দেবার জন্য দিলীপ, ভুল' ব্যূহ রচনা করেছেন। ভঙ্গীটা নিঃসন্দেহে জবরদস্ত।

চোখের সামনে প্লাটফর্মের ওপরে তৈরী সেটে নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছেন পরিচিত কলাকুশলীরা। তাঁরা মাঝে মাঝে আড় চোখে ছবি বিশ্বাসকে দেখছে, আর দেখছে ঋত্বিক ঘটককে। ঋত্বিক ক্যামেরার পাশে কোমরে দু-হাত রেখে দাঁড়িয়ে ক্যামেরাম্যানকে নির্দেশ দিচ্ছেন। ছবি বিশ্বাস হাঁফানীর টান সামলাতে এক সময় কেমন যেন ঝিম মেরে গেলেন। ক্লান্ত দেহে চেয়ারে মাথা রেখে চোখ বুজে তিনি বিশ্রাম করতে লাগলেন। কিন্তু বেশী সময় নয়, তাঁর তন্দ্রা হঠাৎ ভাঙল ঋত্বিক ঘটকের ভারীকণ্ঠস্বরে—ছবিবাবু?

ছবি বিশ্বাস ঈষৎ ঘাড় বাঁকিয়ে, স্তিমিত চোখে, স্বভাবসুলভ মন্থর ভঙ্গীতে বললেন—বলুন।

ঋত্বিক ঘটক এবার প্রয়োজনের চেয়েও কিঞ্চিৎ তেজী কণ্ঠে বললেন—আপনার সিনটা বুঝে নিন—

ছবি বিশ্বাস এবার অস্বাভাবিক নরম এবং বিনীত ভঙ্গীতে বললেন—বুঝিয়ে দিন।

ঋত্বিক স্পষ্টতই চটলেন। আর কণ্ঠে সেটা গোপন না করেই তীব্রস্বরে বললেন—যেন মনে হচ্ছে আমি আপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটালাম। কিন্তু তা তো নয়। সিনটা শেষ করে আপনি যত ইচ্ছা বিশ্রাম করবেন, আপত্তি করব না। এখন একটু চাঙ্গা হয়ে বসুন তো—

—আমি যথেষ্ট চাঙ্গা হয়ে বসে আছি ঋত্বিকবাবু আপনি আমায় অনর্থক ভুল বুঝছেন, এটাই আমার বরাবরের অভ্যাস। খুব শান্ত এবং অমায়িকভাবে ছবি বিশ্বাস জবাব দিলেন।

—বেশ, আপনার পার্টটা মুখস্থ করে নিন। অনেকখানি ডায়লগ আছে। আর পুরো ব্যাপারটা বেশ খটোমটো—

—কিন্তু নিজে হাতে করে আমি তো কখনও পার্ট মুখস্থ করি না ঋত্বিকবাবু। ওটা আমার স্বভাববিরুদ্ধ—

—তাহলে?

—কাউকে আমার কানের কাছে পার্টটা পড়তে হয়—

—অ। ঋত্বিক ঘটক কথাটা শুনে ভেতরে ভেতরে রেগে কাঁই যে হলেন—এতে আর সন্দেহ কি! সামান্য চুপ করে থেকে তীব্রস্বরে উনি বললেন—বেশ। আমি নিজেই আপনার কানের কাছে তাহলে পার্টটা পড়ছি। তা কবার পড়তে হবে শুনি?

—তিনবার।

—তিনবার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মাত্র তিনবার।

—আচ্ছা—হুঙ্কারটা নিজের ভেতরে চালান করতে করতে কথাটা ঋত্বিক বললেন। তারপর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ছবি বিশ্বাসের কাছে বসে, বিনা ভূমিকায় পার্ট পড়তে লাগলেন। ছবি বিশ্বাস তাঁর সেই পূর্ববৎ চোখ বুঁজে তন্দ্রাচ্ছন্ন শ্লথ ভঙ্গীতে চিত্রনাট্যের সংলাপ শুনতে লাগলেন। বার কয়েক হাত নেড়ে থামতে বললেন। কখনও আগের দুটো লাইন বেশী পড়তে বললেন। কখনও বিশেষ একটি শব্দকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে উচ্চারণ করতে অনুরোধ করলেন। তারপর নিজে বিড় বিড় করে সেই শব্দটি আবৃত্তি করলেন, ভঙ্গীটা—এটা হুবহু এভাবে না বললে যেন গোটা মহাভারতটাই অশুদ্ধ হবে, হতে পারে। এক সময় পড়া শেষ হল। সামান্য চুপ থাকার পর ঋত্বিক ঘটক জানতে চাইলেন—ছবিবাবু, আর পড়াবার দরকার আছে কি?

ছবি বিশ্বাস মুদিত চোখেই বললেন—না। ধন্যবাদ ঋত্বিকবাবু।

ঋত্বিক ঘটক তৎক্ষণাৎ একটা ভ্রূভঙ্গী করে উঠে পড়লেন।

ছবি বিশ্বাস ঝিমোতে ঝিমোতেই একটা ডাব খেলেন। অসীমকুমার এতক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলেন। বুঝতে তাঁর অসুবিধা হচ্ছিল না যে আজ এখানে একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটতে চলেছে। অসীমকুমার তাতে খুব নার্ভাস। ঋত্বিক ঘটক স্থান ত্যাগ করতে অসীমকুমার এগিয়ে এলেন।

—ছবিদা?

—উঁ।

অসীমকুমার সবিনয়ে তাঁর নিবেদন পেশ করলেন—ছবিদা, রাজায় রাজায় লড়াইতে যেন এই অধম উলুখাগড়ার প্রাণ না যায়, একটু দেখবেন দাদা—

ছবি বিশ্বাস হেসে তাঁকে আশ্বস্ত করলেন—আরে তুই হচ্ছিস গিয়ে আমার বশম্বদ প্রজা, তোর ভয় কি? তুই কিছু চিন্তা করিস না। আমি আছি।

আবেগে অসীমকুমার তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে ছবি বিশ্বাসের পদধূলি মাথায় ঠেকালেন।

ঋত্বিক হুঙ্কার দিলেন—কই ছবিবাবু, এবার সেটে আসুন। আমি তৈরী।

ছবি বিশ্বাস সেদিকে তাকালেন। শান্ত সমাহিত দৃষ্টি। বললেন—আমিও তৈরী ঋত্বিকবাবু।

ছবি বিশ্বাস উঠে দাঁড়ালেন। তারপর অভিজাত ভঙ্গীতে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন শুটিং-জোনের দিকে।

মেক-আপ-ম্যান শেষবারের মত রেম্পনী আর সুব্রতর মুখে পাউডারের পাফ বুলিয়ে দিয়ে গেল।

ঋত্বিক ঘটক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন সামনের দিকে। দিলীপরঞ্জন মুখার্জি ইষ্টনাম জপে ক্যামেরার ভিউ ফাইণ্ডার চোখ লাগালেন।

ঋত্বিক-হুঙ্কার শোনা গেল—সাইলেন্স ইন দি ফ্লোর।...

এক লহমায় সমস্ত ফ্লোর নিথর হয়ে গেল। এখানে ফুট কাটে কার সাধ্য!

—অল লাইটস!

ছবি বিশ্বাস তাকালেন অন্ধকারের দিকে। তিনি আলোর বন্যায় ভেসে গেছেন যে!

ঋত্বিক-কণ্ঠ আরও তীব্র—স্টার্ট সাউণ্ড।

ক্লাপস্টিক ঠোকার শব্দ বাতাসে মিলিয়ে এল।

—অ্যাকশন!

কলকাতার টেম্পেল বারের শেষ ইংরেজ আইনজ্ঞ বিদায় নিচ্ছেন প্রিয় ভারতভূমি থেকে, বিদায় নিচ্ছেন প্রিয় সহকারী সুব্রতর কাছ থেকে, বিদায় নিচ্ছেন নিন্দা এবং প্রশংসা থেকে, শিক্ষাগুরুর কাছ থেকে পাওয়া কালো গাউনটির ওপর তিনি গভীর মমতায় হাত বুলিয়ে সুব্রতকে এগিয়ে দিচ্ছেন, দুচোখ জলে ভরে উঠছে তাঁর, একদলা কান্না গলায় এসে আটকে গেছে, তিনি অস্ফুট ভগ্নকণ্ঠে সংলাপ বলছেন, আর—

আর ক্যামেরার বহু পেছনে দাঁড়িয়ে আমরা রুদ্ধশ্বাসে এ-দৃশ্য দেখছি, অজ্ঞাতসারে আমাদের চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে, রেম্পনীর দুঃখে আমরা পরাভূত, সুব্রতর চোখও বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে, সুব্রতর মত আমরাও প্রায় যখন—

দীর্ঘবাহু ক্রেন এগিয়ে যাচ্ছে সন্তর্পণে, ছবি বিশ্বাসের ক্লোজে চার্জ হয়ে যাচ্ছে, দিলীপরঞ্জন যেন কাঁটা হয়ে সিঁটিয়ে ক্যামেরার হাতল ধরে বসে আছেন, একটা কি হয় কি হয় ভাব—ছবি বিশ্বাস শট উৎরে দিলেন।

ঋত্বিক ক্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন—অপূর্ব চমৎকার—

ছুটে গিয়ে ছবি বিশ্বাসের হাত চেপে ধরলেন—এত শক্ত শট অথচ কত সহজে কত সুন্দরভাবে আপনি শেষ করলেন, রিয়ালি ওয়াণ্ডারফুল। আপনাকে আজ কি বলে যে অভিনন্দন জানাব ছবিবাবু ঠিক করতে পারছি না…

এতক্ষণে সেই দমবন্ধ আবহাওয়াটা কেটে গেছে। সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

ছবি বিশ্বাস ধীরে ধীরে গায়ের কোট খুলতে বললেন, আমি ছবি বিশ্বাস, আমি কি খুব খারাপ অভিনয় করি ঋত্বিকবাবু?

প্রতিশোধের বাসনা তখন প্রীতিতে রূপান্তরিত। ঋত্বিক জবাব দিলেন না। তাঁর সারা মুখে তখন খুশীর আলো জ্বলছে, ছবি বিশ্বাসের বাহুতে তিনি নিঃশব্দে চাপ দিলেন।

ছবি বিশ্বাস তাঁর অলৌকিক কৃতিত্বে বধ্যভূমিকে সেদিন রঙ্গভূমি করে তুললেন—সময় তার সাক্ষী।

ছবি বিশ্বাস অগ্রসর হলেন। যেতে যেতে কাকে যেন শুনিয়ে বললেন, ব্রাদার এটাই পৃথিবীর চিরকালের নিয়ম—পুরানো চাল ভাতে বাড়ে। রেস্পনীরা-ই চিরকাল সুব্রত ব্যারিস্টারের জয়যাত্রার পথ নিষ্কণ্টক করে, গাউন এগিয়ে দেয়……। ঋত্বিক, তোমার জয় হোক এই প্রৌঢ় অভিনেতা তোমাকে সেই আশীর্বাদই করে যাচ্ছে।

·

একে উত্তমকুমার তায় আবার সুপ্রিয়াদেবী। এঁদের নিয়ে গ্রামাঞ্চলে আউটডোর শুটিং? ছবির প্রোডাকশন কন্ট্রোলার পারিজাত বসুর মত অমন জাঁদরেল মানুষ যিনি অতীতে অনেক বড় বড় ছবির আউটডোর শুটিং অক্লেশেই করেছেন—তাঁর মুখও গম্ভীর হয়।

দেবু বাঁড়ুজ্যে মন্তব্য করল—দাদা, একে রামে রক্ষা নেই সুগ্রীব দোসর। সর্বনাশ! ওঁরা দুজনে লোকেশানে গিয়ে দাঁড়ানো মাত্তর সব চৌপাট হয়ে যাবে কিন্তু…

একথা একা দেবু বাঁড়ুজ্যে কেন, আমরাও বিলক্ষণ জানি। পপুলার ফিল্ম আর্টিস্টদের নিয়ে আউটডোর শুটিং করার কথা ভাবলে এখন ধাঁ করে তিন সাড়ে-তিন ডিগ্রী জ্বর এসে যায়। আর উত্তমকুমারকে নিয়ে ভাবলে তৎক্ষণাৎ শুধু জ্বরই নয়, ওই সঙ্গে হৃদপিণ্ডেও ভূমিকম্প হতে পারে। তারপর ভাবুন, সে ছবির পরিচালক স্বয়ং যদি উত্তমকুমার হন, তাহলে—

দেবু বাঁড়ুজ্যে আত্মসমর্পনের ভঙ্গীতে দু'হাত তুলে তৎক্ষণাৎ বলল, দাদা আমায় ছুটি করিয়ে দিন, আমি বাড়ি চলে যাব—

সেবার লক্ষ্মীপুজোর দিন উত্তমকুমার তাঁর ইউনিটের সকলকে বাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বিরাট খাওন-দাওনের একটা ব্যাপার ছিল। আর ছিল আউটডোর শুটিং-এর প্ল্যান এবং প্রোগ্রাম করা। পুজোর অব্যবহিত পর পরই উনি ওঁর অন্যান্য সব ছবির ডেটস বাতিল করে নিজের ছবির জন্য তুলে রেখে দিয়েছিলেন। এখন যেমনভাবে হোক সে-ডেটসগুলো কাজে লাগাতেই হবে। ছবির শুটিং শেষ করে দিতে হবে। এরজন্যে

মাস্টার প্ল্যান চাই। এমন নিখুঁতভাবে করতে হবে যাতে একটা দিনও অপচয় না হয়।

একজন সাফ বললেন, না: পশ্চিমবাংলার কোন গ্রামে এ-ছবির শুটিং করা সম্ভব নয়। যেখানেই যাবেন, লোকের প্রচণ্ড ভিড় হবে, কাজ হবে না। শুধু তো উত্তমকুমার-ই নন, এ ছবির অন্যান্য আর্টিস্টদের কথা চিন্তা করুন। সুপ্রিয়াদেবী, বাসবী নন্দী, অনিল চ্যাটার্জি, মাধবীদেবী, মলিনা দেবী, বিকাশ রায়, জহর রায়, নির্মলকুমার—কে নেই? সবাই আছেন। না, অসম্ভব—

অথচ শুটিং এক-দুদিনের নয়, একটানা পনের-বিশ দিনের। গ্রামাঞ্চলের বিস্তীর্ণ একটা অঞ্চল ঘুরে ঘুরে শট নিতে হবে। নদী চাই, নালা চাই, ক্ষেত-খামার চাই—চাই দিগন্তবিস্তৃত ধানের ক্ষেত, বাড়ি চাই, ঘর চাই, পুকুর চাই, বাস চাই, জিপ চাই, মোটর চাই, মানুষ চাই, যাত্রাদল চাই, এমন কি একটা শ্মশানও চাই—

উত্তমকুমার সপ্রশ্নে আমাদের দিকে তাকিয়েছিলেন।

সবাই চুপ।

—বলুন এবার, এ-সবই তো চাই, কিন্তু কাজটা আসলে কিভাবে হবে তার একটা প্ল্যান অন্তত দিন কেউ।

সেদিন অনেক চিন্তা-ভাবনার পর স্থির হলো, হাওড়ার জগৎবল্লভপুর গ্রামে ছবির যেসব লোকেশান দরকার প্রায় তার সবটাই পাওয়া যাবে। অতএব জগৎবল্লভপুরে এই আউটডোর শুটিং-এর একটা চান্স নিয়ে দেখতে হবে।

মাত্র এর কিছুদিন আগে ওই গ্রামে উত্তমকুমার-সুচিত্রা সেনকে নিয়ে একটা ছবির বহির্দৃশ্য তোলা হয়েছে, নির্বিঘ্নেই হয়েছে। আসলে ওই গ্রামের অধিবাসী শ্রীসত্যনারায়ণ খাঁ-মশায়ের উদ্যোগে সেটা সম্ভবপর হয়েছিল। খাঁ-মশায় আমাদের চলচ্চিত্রশিল্পে একজন সুপরিচিত মানুষ, একজন নামজাদা চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী। যদিও তিনি শহরে থাকেন কিন্তু মনেপ্রাণে একজন খাঁটি গ্রামীন মানুষ। জগৎবল্লভপুরের উন্নতির জন্যে খাঁ-মশায় উদার হাতে খরচ করেছেন। স্কুল-কলেজ রাস্তা-ঘাট থেকে শুরু

করে মায় একটা হাসপাতাল—অক্লান্ত পরিশ্রম করে গড়ে তুলেছেন। আশপাশের দশ-বিশটা গ্রামের মানুষ খাঁ-মশায়কে শ্রদ্ধা-ভক্তি করে, ওঁর মুখের কথার ভীষণ মূল্য দেয়, অতএব—

খাঁ-মশায় একবাক্যে রাজী হয়ে গেলেন,—নিশ্চয় শুটিং করবেন, তবে একটা শর্ত আছে—

—কি শর্ত ?

—আমার বাড়িতে সবাইকে উঠতে হবে কিন্তু—

আর এই ব্যাপারটাকে শিল্পী এবং কলাকুশলীরা বড্ড ভয় পান। এই সত্যনারায়ণ খাঁ-মশায়ের বাড়িতে থাকা, খাওয়া-দাওয়া করার ব্যাপারটাকে। তার কারণ ভদ্রলোক খাইয়ে খাইয়ে লোকজনকে প্রাণে মারার উপক্রম করেন। খাবে না বলে ওঁর কাছে পার পাওয়া যায় না। উনি জোর-জবরদাস্ত করে খাওয়াবেন। একবার একজন স্টুডিওর ইলেকট্রিশিয়ান বেগতিক দেখে সটকে পড়েছিল। আমি ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজন কলাকুশলী এবং শিল্পীকে জানি যাঁরা খাঁ-মশায়ের নাম শুনলেই কেমন যেন নার্ভাস হয়ে যান।

উত্তমকুমারের পক্ষে অন্য পরিচালকের ছবিতে গিয়ে আউটডোর শুটিং করা আর নিজের ছবির শুটিং করা—এ দুটোর মধ্যে তফাৎ অনেকটা। আরে আমি-ই তো উত্তমকুমারের অন্যান্য ছবিতে নিজে কাজ করেছি। দেখেছি, শুটিং-এর চার পাঁচদিন আগে ইউনিট লোকেশানে পৌঁছেছে, সমস্ত ব্যবস্থা হয়েছে, শুটিং-এর আগের দিন রাত্রে হয়ত উত্তমকুমার লোকেশানে পৌঁছেছেন। পরদিন কড়া সিকিউরিটির মধ্যে মেকআপ নিয়ে কস্টুম পরে মূল স্পটে পৌঁছেছেন, শট দিয়েছেন এবং প্যাকআপ হবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে করে ডাকবাংলোই বলুন বা হোটেলে—ফিরে গেছেন। কোথাও কোন আঁচড়-টি তাঁর গায়ে লাগেনি। বা ভিড় সামলাতে হয়নি। বা রোদে পুড়তে হয়নি। বা দৌড়ঝাঁপ করে শট অ্যারেঞ্জ করতে হয়নি। বা সময়মত আর্টিস্টরা লোকেশানে কিভাবে পৌঁছাবেন তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়নি। বা ফিল্ডে কেউ গোঁসা করেছে, গিয়ে তার মনোরঞ্জন করতেও হয়নি।

কিন্তু এবার তাঁর দায়িত্ব ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। আমায় তো একদিন হেঁকে বললেন—কাছাকাছি থাকবেন, আর চেঁচাতে পারছি না। কই চিত্রনাট্যের খাতাটা দিন, এই ডায়ালাগটা মশাই আবার লিখতে হবে, সিচুয়েশান চেঞ্জ করে গেছে—

ঘর্মাক্ত পরিশ্রান্ত এই পরিচালক-অভিনেতার তখন একমাত্র আশঙ্কা—কি মশাই সিডিউল শেষ পর্যন্ত উঠবে তো? এ-লোকেশানে আর কিন্তু ফেরা যাবে না—

ভিড় ভিড় আর ভিড়। যেদিকে দৃষ্টি যায় শুধু কালো কালো মাথা। আর কানফাটা চিৎকার, উল্লাস, নৃত্য। যে-সব মানুষকে শুধু পর্দাতে দেখতে পাওয়া যায় তাঁরা যদি অকস্মাৎ দোরগোড়ায় এসে হাজির হন তাহলে ব্যাপারটা হঠাৎ কিরকম দাঁড়ায়—একবার অনুমান করুন।

প্রথম দিনের একটা নমুনা দিই: উত্তমকুমার লোকেশানে যাবেন। স্টুডিওতে গিয়ে শুনলাম সঙ্গে সুপ্রিয়াদেবী যাচ্ছেন, সোমাও যাচ্ছে। ভেরি গুড। আমরা তখন মাস্টার প্ল্যান দেখে দেখে গাড়ি ছাড়ছি একটার পর একটা। পঁয়ষট্টি জনের একটা বিরাট ইউনিট। সঙ্গে তাদের নিজেদের লটবহর, ক্যামেরা, লাইট-ইকুইপমেন্টস, সাউণ্ড, কস্ট্যুম, মেকআপের মালপত্র, রান্নাবান্নার কিছু জিনিস—এক একটা গাড়ি বোঝাই হচ্ছে আর তৎক্ষণাৎ গুডবাই হচ্ছে, এমন সময় পারিজাতদা এসে বললেন, এই রঞ্জন তুমি এখন যেও না, রাত্রে যাবে।

—কেন দাদা?

—উত্তমকুমার ফোন করেছিলেন, বললেন, রঞ্জন আমার সঙ্গে যাবে। চিত্রনাট্য নিয়ে আলোচনা আছে—

—ও. কে. বস্—

কাট-টু রাত্রে গাড়ি হাওড়া ব্রিজ ছাড়িয়ে টাউনে পড়ল। সবে সাড়ে নটা। রাস্তাঘাট রীতিমত জমজমাট। দোকানপাটে ক্রেতা-বিক্রেতা, আলোর ফুলঝুরি। উত্তমকুমার আর সুপ্রিয়াদেবী নিজের নিজের রুমালে মুখ আলতো করে ঢেকে রেখেছেন। আমি ড্রাইভারের পাশে। চারিদিকে

নজর রাখছি। ড্রাইভারকে বলা ছিল—গাড়ি কোন কারণেই দাঁড়াবে না, কেউ রুখতে চেষ্টা করলেও না।

গাড়ি কদমতলার রাস্তা ধরল।

দূর থেকে দেখা গেল একটা বাড়িতে ফাংশন হচ্ছে, লাউডস্পীকারে গান ভেসে আসছে। শ্রোতারা ভেতর থেকে উপচে রাস্তায় এসে পড়েছে। সবাই মনোযোগ দিয়ে গান শুনছে। গাড়ি যাতায়াতের রাস্তাও বুঁজে গেছে তাদের ভিড়ে।

উত্তমকুমার সতর্ক হলেন, রুমালে ঘন ঘন মুখ মুছছেন সুপ্রিয়া দেবী, তিনি মাথা হেঁট করে কি-যেন খুঁজছেন, গাড়ির গতি মন্থর হয়ে এসেছে, শ্রোতারা গানের দিকে কান খাঁড়া রেখেই পেছন ফিরে গাড়িটা দেখেছে। গাড়ির ভেতরে কে আছে উৎসাহী তা-ও দু'একজন দেখবার চেষ্টা করছে, ওদের প্রায় গা ছুঁয়ে গাড়ি অলস ভঙ্গিতে এগোচ্ছে। ব্যস, আর মাত্র একটি দঙ্গল পাশ কাটাতে পারলেই সামনে রাস্তা ফাঁকা। এগোচ্ছে এগোচ্ছে, একটা সাংঘাতিক ক্লাইমেকসের দিকে যাচ্ছে যেন, এমন সময় হঠাৎ—

উঃ, হঠাৎ একটা কানফাটা চিৎকার—আরেঃ, এ-যে গুরু— !

মাত্র একটা লহমার বিরতি। তারপর যা ঘটল, না মশায়, তার বর্ণনা লেখার ক্ষমতা আমার অন্তত নেই। চিৎকার, উল্লাস, হৈচৈ, টুইস্ট নৃত্য, গাড়ির চারপাশে মানুষের যেন কঠিন দেয়াল, ধুমধাড়াক্কা আওয়াজ, মাইকের ঘোষণা,—গুরু এসেছে, গুরু—

চোখের নিমেষে আমি গাড়ির উইণ্ডস্ক্রীন তুলে দিয়েছি। তাতে গাড়ির ভেতরটা গরম হয়ে গেছে। উত্তমকুমার কি আর করবেন, মৃদু হাসছেন, গল গল করে ঘামছেন। সুপ্রিয়া দেবীর মুখে প্রচণ্ড বিরক্তি, সোমা অবাক, ড্রাইভারের চোয়াল কঠিন, নীচু হয়ে সে কি যেন দেখছিল। তাড়াতাড়ি বললাম, গাড়ি চালু রাখো, বন্ধ করো না একদম।

উত্তমকুমারের শত শত ফ্যান চেঁচাচ্ছে, কাঁচের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দেখবার চেষ্টা করছে, অনুনয় করছে—একটু বাইরে এসে দাঁড়ান, চোখের দেখা একবার দেখব, তারপর আমরা গাড়ি ছেড়ে দেব—

সেটা প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব।

ড্রাইভার চেষ্টা করল যদি এগিয়ে যাওয়া যায় কিন্তু মানুষের সেই কঠিন পাঁচিল ঠেলে এগিয়ে যাবার তখন আর যেন কোন উপায়ই নেই। কয়েকটি ছেলে সটান গাড়ির সামনে শুয়েই পড়ল। গুরুকে ওরা গাড়ি থেকে বের করবেই। গুরুকে ওরা যখন হঠাৎ পেয়ে গেছে তখন ভাল করে একবার দেখবেই। দেখবে সুপ্রিয়া দেবীকেও। এমন সুযোগ লাখে একটা আসে না, অতএব—

আর রাত যত বাড়ে, ভিড়ও তত বাড়ে। খবর ততক্ষণে রটে গেছে বিভিন্ন জায়গায়। ছেলেমেয়েরা ছুটে আসছে দলে দলে।

সেদিন যে কি ট্রাবল পেয়েছিলেন উত্তমকুমার আর সুপ্রিয়া দেবী, তা আর বলার নয়। জনপ্রিয়তা মানুষের কতবড় শত্রু—এতো চোখের সামনে প্রায় রোজই দেখি। শেষ পর্যন্ত উত্তমকুমারকে বাইরে বেরিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিলই। একদল উৎসাহী বলিষ্ঠ ছেলে কর্ডন করে একটা পাশ ফাঁকা করে দিয়েছিল—উত্তমকুমার সহাস্যে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কানফাটা চিৎকার। সেটা আনন্দেরই অভিব্যক্তি। হাওড়া টাউনের গভীরে সেদিন রাত্রে রাস্তার ওপরে দেখেছি—একটা চোখের দেখার জন্য লোকে পাগল কতটা হয়, কতটা পাগল হতে পারে। না মশাই, আমি জনপ্রিয় হতে চাইনে, আমার খুব শিক্ষা হয়েছে।

লোকেশানে একদিন পারিজাত বসুকে ডেকে উত্তমকুমার বললেন, একটা এমন লোকেশান দেখুন, একটা নদী—নদীর দু-পাশে গ্রাম, গান পিকচারাইজেশান আছে—

—কদিন শুটিং করবেন ওখানে?

—দিন তিনেক তো বটেই—

—দেখছি।

চারিদিকে লোক পাঠানো হল। দিনতিনেক পর পারিজাত বসুর লোক খবর আনলো—মাইল পনের দূরে এই রকম একটা লোকেশান আছে বটে তবে নদী নয়, একটা মস্তবড় ক্যানেল আছে। চলবে?

উত্তমকুমার আমায় বললেন, একবার দেখে আস্থন তো—

বললাম, একবার আমি যাব আবার আপনি যাবেন—দেরী হয়ে যাবে, তারচেয়ে বরং চলুন একসঙ্গে ঘুরে দেখে আসা যাক।

—বেশ, তাই হোক।

পরদিন আমাদের অফ-ডে। সবাই গল্পগুজব খেলাধূলো নিয়ে ব্যস্ত। খাঁ-মশায় বড় বড় মাছ এনেছেন। কাটাকুটি হচ্ছে, যেন যজ্ঞিবাড়ি রান্না চেপেছে, ছবেলায় কম করেও ছুশো জনের পাত পড়ছে। আমরা সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম কয়েকজন। পীচ ঢালা স্থন্দর রাস্তা। ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে ফুলস্পীডে গাড়ি ছুটছে। লোকালয় ক্রমে সরে যাচ্ছে। আমরা ফাঁকায় পড়লাম। দিগন্তবিস্তৃত ধানের ক্ষেত। দৃশ্যপটের পরিবর্তন হলো। এবার জঙ্গলের শুরু। গাইড আঙুল দিয়ে দূরের একটা জায়গা দেখিয়ে বললে – ওই যে ওই গ্রামটা—

বাঃ, লোকেশান দেখে সবাই খুব খুশি। বিরাট একটা খাল, আর তার ছপাশে যেন ছবির মত করে সাজানো মাটির কুঁড়ে ঘর। চাষী আর জেলেদের পাশাপাশি অবস্থান। লোকগুলোকে খুব সরল আর সাদাসিধে বলে মনে হল।

একদল শহুরে লোক দেখে গ্রামের লোকেরা প্রথমে খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল। পারিজাতদা তাদের আশ্বস্ত করলেন—ভয় নেই, আমরা তোমাদের এখানে একটু বেড়াতে এসেছি। তা তোমাদের এই গ্রামের মোড়ল কোথায়?

একজন প্রৌঢ়, সে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, আমাদের গতি-প্রকৃতি সতর্কভাবে লক্ষ্য করছিল, তাকে কয়েকজন ঠেলে দিল আমাদের দিকে।

উত্তমকুমার সহাস্যে বললেন—আপনি?···তা আপনার নাম কী?

—এজ্ঞে বেন্দাবন—

—মোড়ল?

—ওই মোড়লই বল আর বেন্দাবন, ক্যানে আপনারা এখানে কী জন্যে এসেছ?

উত্তমকুমার বললেন, আমরা এখানে ছবি তুলব।

ছবি তোলা? ওরা সবাই পরস্পরের দিকে অবাক চোখে তাকালো। সেটা আবার কি ব্যাপার?

পারিজাতদা বললেন, সিনেমা আছে না? সেই সিনেমার ছবি তোলা হবে—

যেন এতক্ষণ পরে ওদের মুখে আলো ফিরে এল।—সিনেমার ছবি। কবে, কখন? আমরা দেখতে পাব?

আর এরই মধ্যে একটি ছোকরা বুঝতে পেরে গেছে যে সে সাক্ষাৎ উত্তমকুমারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে হুপ করে তার এক লম্ফ। বয়োজ্যেষ্ঠরা তো অবাক। কি হলোরে। তারপর একে একে সবাই চিনে ফেলেছে। এবার সকলের মুখে আনন্দের হাসি। খুব খুশি সবাই। হাঁকডাক করতে আশপাশের ছেলে ছোকরার দল এসে পড়ল। তাদের অধিকাংশই স্কুল-কলেজে পড়ে। তারা নিয়ম করে বায়োস্কোপ দেখে।

পারিজাতদা তখন বেন্দাবনকে নিয়ে পড়লেন।—বুঝলে মোড়ল, আমরা যদি তোমাদের এই গ্রামে ছবি তুলি, আপত্তি করবে না তো?

সামান্য দ্বিধাগ্রস্ত মোড়ল বললে—না না, আপত্তি কিসের······

—এখানে খান দুয়েক নৌকো পাওয়া যাবে তো? আমরা পয়সা দেব।

—অ্যাঁ, নৌকো? হ্যাঁ তা-ও পাওয়া যাবে—তবে কিনা······

—বল বল, বলে ফেল—

বেন্দাবন কিন্তু করে বললে—মানে পেস্তাবটা একবার সবাইকে করলে ভাল হতো না?

—কিসের পেস্তাব?

—মানে আপনারা যে বায়োস্কোপ করবে বলছ, দশজনের মতামত নিতে পারলে ভাল হতো—

—বেশ তাই নাও। এই আমরা রইলাম দাঁড়িয়ে।

গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর একটু সরে গিয়ে নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ

গুজ গুজ করল। তারপর এক গাল হেসে বেন্দাবন বলল—না কর্তা, কারো আপত্তি নেই। আপনারা ছবি তুলে লেন।

সেই মত সাব্যস্ত হলো, পরদিন সকালে আমরা আসব শুটিং করব, সন্ধ্যের সময় চলে যাব। মোড়ল প্রতিশ্রুতি দিল আমাদের যে এই শুটিং-এর ব্যাপারটা সে গোপন রাখবে এবং সব রকম সহযোগিতা করবে।

বেন্দাবন খুশি মুখে আমাদের গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিল। বলল—বাবু, এতো আমাদের কত বড় সৌভাগ্য। আপনারা উত্তমকুমার মশায়দের নিয়ে এ-গাঁয়ে ছবি তুলতে আসবেন, আমাদের কত আনন্দ—

পরদিন আমাদের ওই লোকেশানে পৌঁছাতে কিছু দেরী হয়ে গেল। গাড়ি থেকে নেমে উত্তমকুমারের চক্ষুস্থির; চারিদিকে মানুষজনে থৈ থৈ করছে। ওঁকে নামতে দেখে লোকজন চারিদিক থেকে পিল পিল করে ছুটে এল—এসে গেছে এসে গেছে এসে গেছে—

বেগতিক দেখে পারিজাতদা ছুটলেন মোড়লের সন্ধানে। কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। তার একজন সাকরেদকে পাওয়া গেল। সে বললে, মোড়ল টাউনে গেছে, এই এলো বলে—

তৎক্ষণাৎ ছোট একটা কনফারেন্স হল আমাদের। উত্তমকুমার তো চটে ফায়ার।—নাঃ, শুটিং আমি করবই তা সে যতই ভিড় হোক না কেন এখানে।

সঙ্গে সঙ্গে ইকুইপমেণ্টস নেমে গেল লোকেশানে। গাড়ি ক্যাম্পে ফেরৎ গেল সুপ্রিয়া দেবীকে আনবার জন্যে। নৌকায় চড়লেন উত্তমকুমার। বেলা যত বাড়ে লোকের ভিড়ও তত বাড়ে। নৌকোয়, গরুর গাড়িতে, বাসে, টেম্পোয়—লোকের যেন আসার আর কামাই নেই। খালের দু-পাড় উপছে কাতারে কাতারে মানুষ। সবাই শুটিং দেখতে চায়, উত্তমকুমার-সুপ্রিয়া দেবীকে স্বচক্ষে দেখতে চায়। চিৎকার, চেচাঁমেচি, হৈ-চৈ।

হঠাৎ পারিজাতদা লাল মুখ করে ভিড় ঠেলে ছুটে এলেন। তারপর যা বললেন শুনে আমরা হাসব না কাঁদব কিছুক্ষণ স্থির করতে পারলাম না। গণ্ডগোলটা বাধিয়েছে ওই মোড়ল নিজে। বায়োস্কোপের গন্ধ পেয়ে সে

প্ল্যান করেছে এই সুযোগে কিঞ্চিৎ গুছিয়ে নেবার। রাতারাতি পাশের বিশখানা গাঁয়ে ঢেঁড়া পিটিয়েছে এই বলে যে বেন্দাবন মোড়লের ব্যবস্থায় তাদের গ্রামে উত্তমকুমারের ছবির শুটিং হচ্ছে। যারা উত্তমকুমারকে স্বচক্ষে দেখতে চায় যেন অবিলম্বে চলে আসে। টিকিট মাত্র দশ পয়সা। এ সুযোগ হেলায় হারাইবেন না। সপরিবারে যারা দেখবে তাদের দর্শনীমূল্য মাত্র এক টাকা। সব ভালভাবে দেখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। উত্তমকুমারের সঙ্গে কথা বলাইয়া দেবার মূল্য ধার্য হইয়াছে মাত্র দুই টাকা। আর সারাদিন উত্তমকুমারের পাশে পাশে থাকিবার মূল্য মাত্র আড়াই টাকা।

বেন্দাবন বাসের টিকিট কিনে এনেছিল। নিমেষে তা ফুরিয়েছে। এখন সদরে গেছে আরও টিকিট আনতে। ভলিন্টিয়ারে তামাম জায়গা ছেয়ে গেছে। প্রচুর আণ্ডারহ্যাণ্ড হয়ে যাচ্ছে এই অবসরে। দু-একজন বিজ্ঞ ব্যবসায়ী এরই মধ্যে আবার পটাপট চায়ের পান-বিড়ির দোকানও দিয়ে বসে গেছে। দিব্যি তাদের ফলাও ব্যবসা চলছে। স-পরিবারে দর্শনার্থীদের সংখ্যা অনেক। তারা উত্তকুমারকে তখনও চোখের দেখা দেখতে না পেয়ে ক্ষেপে ভোম। বেন্দাবনকে তারাও খুঁজছে। পেলে নাকি তার ছাল-চামড়া তুলবে…। আসলে বেন্দাবন কেটে গেছে।

আতঙ্কে আমাদের হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। একটা ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি দাড়িয়ে আমরা। চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। খট খট মেটালিক শব্দ, আশে-পাশে, মাথার ওপর, অটোমেটিক ম্যাগাজিন লোড হচ্ছে। রাইফেলের বুকে সেফটি ল্যাচ তার অনেক আগেই খুলে গেছে। দেখতে না পেলেও বুঝতে পারছি—প্রতিটি রাইফেল, ষ্টেনগান আর লাইট মেসিনগানের ট্রিগারে আঙ্গুল ধীরে ধীরে চেপে বসছে, সবাই এখন একটা মাত্র সিগন্যালের জন্য অপেক্ষা করছে—ফায়ার!

সার্জেন্ট উধম সিং মরিয়া হাতে অটোমেটিক রিভলবার বাগিয়ে সন্তর্পণে

এগিয়ে যাচ্ছে সামনের বেহড়ের দিকে। তার মুখে কঠিন, শীতল একটি মাত্র নির্দেশ—টেক কভার, গোলী চলেগী···চলনা আজ বহুত জরুরী হ্যায়···

চারিদিকে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা। আমি সামনের দিকে এগোবার চেষ্টা করতেই প্রদীপকুমার বাধা দিলেন। স্পষ্ট ভয় পাওয়া মানুষের কণ্ঠস্বর —কোথায় যাচ্ছো?

—অ্যাঁ?···ইয়ে, দেখি মঞ্জুদি কোথায় রামদা কোথায়। এক্ষুনি যা হোক একটা ডিসিশান নিতে হবে। উই কান্ট রান দিস রিস্ক প্রদীপদা···

প্রদীপকুমার খপ করে কাঁধ চেপে ধরলেন।—না, তুমি দাঁড়াও। আমি একলা পড়ে যাব···

আমি আর প্রদীপকুমার তখন গ্রামের একেবারে শেষ সীমানায় অন্ধকারে একেবারে অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে। অদূরে বিভীষিকাময় চম্বলের বেহড়। এর কোন কূল নেই কিনারা নেই। হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে মোরেনা জেলা ছাড়িয়ে ভিণ্ড জেলার দিকে, ভিণ্ড পার হয়ে রাজস্থান বর্ডারের দিকে। খতরনাক, বিলকুল খতরনাক।

মঞ্জু দে যখন বেহড়ের এই গ্রামে নাইট শুটিং করবার অনুমতি চেয়েছিলেন, ফিপ্‌ফ্‌থ্‌ ব্যাটেলিয়ান সিকিউরিটি ফোর্সের অধিনায়ক কর্ণেল শীতলে কিন্তু প্রথম সুযোগেই ইয়েস বলতে চাননি। সামান্য ইতস্তত করে বসেছিলেন—এর মধ্যে আবার নাইট শুটিং কেন? একটু রিস্কি হয়ে যাচ্ছে না?

—কিসের রিস্ক?

মৃদু হাসি।—রিস্ক ডাকুদের। যে জন্যে গত দশদিন আমি একটা আস্ত প্লেটুন আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে ডিউটিতে পাঠাচ্ছি।

সুবেদার রামবিলাস সিংকে জরুরী তলব দিলেন কর্ণেল। ইয়েস বলবার আগে তার রিপোর্ট নেওয়া দরকার। আর্মি ইন্টেলিজেন্স কি বলতে চায় সেটা জেনে নেওয়া দরকার। কোন্‌ ডাকাতের দল বেহড়ের কোন্‌ এলাকায় এখন অপারেট করছে—খবরটা এখন একমাত্র সিকিউরিটী ফোর্সের গোয়েন্দা বিভাগই দিতে সক্ষম। আর সেটাই তাদের কাজ।

সুবেদার রামবিলাস সিং এসে বুটে বুট ক্লিক করে দাঁড়াল—হুজুর—

—মাধো সিং-এর দলের হালফিল খবর?

সুবেদার জানাল—মাধো সিং রেওয়াতে একটা এনকাউন্টারে ফেঁসেছিল গত সপ্তাহ। ওর দলের একজন গায়েব। আর তারপর থেকে কোন খবর নেই—

—মাখন সিং?

—গত পরশু সে সালা মহকুমায় দলবল নিয়ে একবার ঘুরে গেছে। মনে হয় মোরেনা জেলার ভেতরেই এখন সে অপারেট করছে—

—কোন ডাকাতির খবর?

কি যেন বলতে গিয়ে থমকে গেল সুবেদার। আমরা কয়েকজন অপরিচিত মানুষ। কর্ণেল ওকে চোখের ইঙ্গিতে আশ্বস্ত করলেন। তখন সুবেদার কবুল করল, গত সপ্তাহে আমাদের এলাকাতেই পাঁচ ছ'টা ভারি ডাকাতি হয়েছে, দুটো কিডন্যাপিং হয়েছে।

—শেঠ?

—হানজী।

কর্ণেল চোখ নামিয়ে কি যেন ভাবলেন, সামান্য। তারপর বললেন—থ্যাঙ্ক ইউ সুবেদার, ইউ মে গো নাউ—

বুটে বুট ক্লিক করে সুবেদার অ্যাবাউট টার্ণ, তারপর গট গট করে চলে গেল।

কর্ণেল মৃদু হেসে বললেন—সব তো শুনলেন, এখন কি করবেন বলুন।

উপায় নেই। প্রদীপকুমারের এ ছবির জন্যে দেওয়া ডেটস ফুরিয়ে আসছে। ওঁকে নিয়ে কাল পরশুর মধ্যে ওই সব দৃশ্যের শুটিং না করলেই নয়। কলকাতা থেকে এত টাকা-পয়সা খরচ করে আসা—এখন আধা-খ্যাচড়া অবস্থায় চলে যাওয়ার কোনই অর্থ হয় না। তা ছাড়া, মঞ্জু দে-র মত এমন সাহসী মেয়ে আমাদের দেশে বাস্তবিকই বিরল। উনি যে সাহস করে অভিশপ্ত চম্বল-এর মত ছবি করতে নেমেছেন—এটাই যথেষ্ট। তারপর ষাটজনের একটা বিরাট ইউনিট নিয়ে, প্রায় হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে

এসেছেন চম্বলের ভয়ঙ্কর ডাকাত অধ্যুষিত এলাকায়—মোরেনা জেলায়—এটা ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে এখনও আমার গা শির শির করে।

ক্যামেরাম্যান রামানন্দ সেনগুপ্ত আমতা আমতা করলেন—তাই তো, সবাই যখন ইয়ে করছে তখন···

মঞ্জু দে হেসে ফেললেন—আহা, মরলে শুধু আপনি একাই তো মরছেন না, আমরাও যাক সেই সঙ্গে। শুনছেন তো প্রদীপ আর কিছুতেই তার ডেট এক্সটেণ্ড করতে চাইছে না।

নার্ভাস হওয়ার অবশ্য কারণ ছিল।

কয়েকদিন আগে আমরা দুর্ধর্ষ বেহড়ের প্রায় পঞ্চাশ মাইল ভেতরে একটা পুলিশ আউটপোষ্টের কাছে শুটিং করছিলাম। সেদিন আমাদের ছিল ডাকাতের সীন। প্রদীপকুমার, শেখর চ্যাটার্জি, রবীন ব্যানার্জি, সুনীল ভট্টাচার্য প্রভৃতিদের নিয়ে প্রায় ত্রিশজনের একটা দলের গুলি চালনার দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ করা হচ্ছিল। শটের বিরতিতে আমরা মাঝে মাঝেই গুলি গোলার আওয়াজ পাচ্ছিলাম। এখন আমাদের নিজেদের শুটিং-এ এত বেশী শব্দ হচ্ছিল যে দূর থেকে ভেসে আসা শব্দটার ব্যাপারে কেউ বিশেষ খেয়াল করেনি। খেয়াল হল লাঞ্চ ব্রেকের সময়। বেহড় থেকে আমরা সবাই সমতলে উঠেছি, লাঞ্চ খাবো বলে, হঠাৎ দেখি আমাদের সঙ্গের সিকিউরিটী ফোর্সের একদল জোয়ান একটা জীপের কাছে দাঁড়িয়ে খুব উত্তেজিত ভঙ্গিতে কি যেন দেখছে, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে হাত-পা নেড়ে।

মেকআপম্যান শম্ভুর সব ব্যাপারেই একটু যেন বেশী কৌতূহল। সে সরল মনে গিয়েছিল ব্যাপারটা কি দেখে আসবে বলে। আসতে আর পারেনি ; ওখানে এক বিকট চিৎকার করে দড়াম করে পড়েই সে অজ্ঞান।

পরে জানা গেল সব। আমরা যখন শুটিং করছি তখনই ডাকাতের একটা দল ওই এলাকা নাকি পার হয়ে যাচ্ছিল। আমাদের গুলি-গোলার শব্দে ওরা প্রথমে ঘাবড়ে যায়। তারপর গোটা ব্যাপারটা না বুঝে ওরা বোকার মত হঠাৎ সিকিউরিটী ফোর্সকে তাগ করে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ

করে। সিকিউরিটী ফোর্সদা এই রকম একটা আকস্মিক অবস্থার জন্যে তৈরী ছিল না। তারা এসেছিল প্রধানত আমাদের গার্ড দিতে। সেদিন কমাণ্ডে ছিল ভীর সিং। বাইনোকুলার দিয়ে দেখতে গিয়ে সেই প্রথম আবিষ্কার করে—ডাকাতরা গুলি চালাতে চালাতে বেহড়ের গোলক ধাঁধায় অদৃশ্য হচ্ছে। বাস আর কি—ফায়ার! ডাকাতদের তাড়া করতে করতে এরা চার মাইল পর্যন্ত ছুটেছে। তার মধ্যে পাকা আমের মত ফেলেছে তিনটিকে। ফোর্সের একজন জখম হয়েছে। তাকে জীপে করে তৎক্ষণাৎ মোরেনার হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তারপর সমস্ত এলাকা তন্ন তন্ন করে খুঁজে এ পর্যন্ত সেই তিনটি লাশ খুঁজে পাওয়া গেছে। এখনও খোঁজা চলছে, যদি আর কাউকে পাওয়া যায়।

শুনে, শুটিং তো আমাদের মাথায়। এতবড় একটা এন্‌কাউণ্টার হয়ে গেল—আমরা বুঝতেই পারলাম না। শেখর চ্যাটার্জি বললেন—কি সর্বনাশ। অ্যাক্টিং করতে এসে শেষ পর্যন্ত প্রাণ খোয়াব নাকি? ও রঞ্জন, মঞ্জু দেবীকে বলো, এক্ষুনি প্যাক আপ করে চল ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই……

রামানন্দ সেনগুপ্ত এমনিতেই সামান্য খুঁৎখুঁতে প্রকৃতির মানুষ। তিনি শেখর চ্যাটার্জিকে সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন করলেন।

পিণ্টু এসে খবর দিল—রামদা, আরও একটা লাশ পেয়েছে ওরা। সিকিউরিটীর লোকদের কী ফূর্তি। আসলে ওরা বড় ইনাম পাবে শুনলাম। ডাকাত মারলেই নাকি ক্যাশ রিওয়ার্ড।

প্রদীপকুমার নিজের ব্যক্তিগত দামী একটা রাইফেল আর একটা পিস্তল এনেছিলেন বোম্বে থেকে। ও-তুটো সব সময় নিজের সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন। দেখি, এই ঘটনা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পিস্তলটি হাতে করে ঘুরছেন। ভঙ্গিটা নিঃসন্দেহে বিব্রত। কাছে এসে রামানন্দকে বললেন—রামবাবু, ব্যাপারটা মোটেও সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না কিন্তু। এতগুলো লাশ পড়ে যাবার পর ভেবেছেন ওরা সব পালিয়ে গেছে? উহুঁ, ওরা নিশ্চয় আশে-পাশে কোথাও লুকিয়ে আছে। চান্স পেলেই হিটব্যাক

করবে। চম্বলের ডাকাত—ওয়ার্ল্ড ফেমাস আউট-ল। এদের দমন করা অসম্ভব ব্যাপার।

বোম্বের মণি ভট্টাচার্য এর কিছুদিন আগে এসেছিলেন চম্বল এলাকায় শুটিং করতে, মুঝে জীনে-দো ছবির, সঙ্গে আর্টিষ্ট ছিলেন সুনীল দত্ত আর ওয়াহিদা রেহমান। মোরেনার চম্পক কাগজের রিপোর্টার অশ্বিনী আমায় গল্প করে বলল, সে মশাই ওয়াহিদাকে ওরা গায়েব করে দেবে বলে ঠিক করে ফেলেছিল। ওকে কিডন্যাপ করতে পারলে তো লাখ লাখ টাকার মামলা। শেঠজীদের ধরে র‍্যামসাম আদায় করা এখনকার ডাকাতির একটা মস্তবড় রেওয়াজ। সেখানে ওয়াহিদাকে একবার তুলতে পারলেই তো কাম ফতে। এক চ্যান্সে সারা জীবনের রোজগার হাতের মুঠোয়। কিন্তু ওদের ব্যাড লাক, শেষ পর্যন্ত ওরা পারেনি। আফটার অল ওরা বোম্বের ফিল্ম লাইনের ধুরন্ধর লোক, বাতাসে উল্টো গন্ধ পেয়েই দে হাওয়া। রাত্রে সদলবলে ডাকাতি করতে এসে ডাক বাংলোয় ঢুকে ওরা দেখে, পাখী উড়ে গেছে। মাঝখান থেকে বেচারি চৌকিদারের জীবনটা গেল। রাগের চোটে ওরা ওকেই গুলী করে মারল।

সেদিন ওখানে দাঁড়িয়ে পর পর শোয়ানো চারটে রক্তাক্ত লাশ দেখে আমার তো মাথাটাই বোঁ করে ঘুরে গেল। মধ্যপ্রদেশের গাঁয়ে-গঞ্জে চাষাভূষোদের দেখতে যেমন হয়, এদের দেখতেও ঠিক তাই আর পোষাক-আশাকও অবিকল সেই রকম। খাঁকি শার্ট আর মালকোছা দিয়ে পরা মোটা সুতোর ধুতি। সঙ্গে কাপড়ের একটা ঝোলা ব্যাগ। তাতেই ওদের সর্বস্ব—সম্পত্তিই বলুন বা যা-কিছু। একতাড়া কারেন্সী নোট। একতাল সোনা। একরাশ বুলেট। বিড়ি, গাঁজা, দেশী-বিলেতী মদের বোতল। কিছু ওষুধপত্র। একটা জীর্ণ রামায়ণ। খুচরো পয়সা। দেশলাই। আর প্রত্যেকেরই সঙ্গে একটি করে দামী রাইফেল। একজনের রাইফেলে আবার একটা শক্তিশালী টেলিস্কোপ লাগানো।

সার্জেণ্ট উধম সিং একদিন ক্যাম্পে আমায় গল্প করতে করতে বলেছিল দারুণ একটা কথা।—চম্বলে একবার যে মানুষ রাইফেল হাতে করে বেহড়ে

নেমে যায়, অ্যামিউনেশান ফ্যাক্টরীতে তার নামে সঙ্গে সঙ্গে একটা বুলেট তৈরী হয়ে যায়।

অর্থাৎ পুলিশের গুলীতেই হোক বা কোন বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তেই—একদিন বুলেটে ঝাঁঝরা বুক নিয়ে তাকে এই চম্বলের রক্ত-পিপাসু মাটিতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে হবে। কি সাংঘাতিক কথা ভাবুন।

সেদিন আর লাঞ্চের পর শুটিং করা সম্ভব হয়নি। আমরা তড়িঘড়ি লোকেশান প্যাক আপ করে মোরেনায় ফিরে গিয়েছিলাম, চারধারে সিকিউরিটী ফোর্সের কড়া পাহারায়······

অন্ধকারের মধ্যে রিভলবার বাগিয়ে ঠিক যেন শিকারী বিড়ালের মত সন্তর্পণে সার্জেণ্ট উধম সিং এগিয়ে যাচ্ছে। মুখে বিড় বিড় শব্দ—টেক কাভার···গোলী আজ জরুর চলেগী···চলনা বহুত জরুরী হ্যায়···

চোখের নিমেষে যেন ভোজবাজি হল একটা। আমরা ছবির মত সাজানো এই গ্রামে যখন এসেছি তখনও পুরুষেরা ঘরে ফেরেনি। মেয়েরা কৌতূহলী চোখে দূর থেকে আমাদের শুধু দেখেইছে। মঞ্জু দে, রামানন্দ সেনগুপ্ত আর আমি সিকিউরিটী গার্ড নিয়ে গ্রামে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে। জোয়ানরা রাইফেল বাগিয়ে দলে দলে গ্রামে ঢুকেছে, ডোর-টু-ডোর সার্চ করেছে, প্রশ্ন করেছে আর মেয়েরা দাপটের সঙ্গেই সে সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছে—লজ্জা করে না? গ্রামের পুরুষেরা যখন মাঠে চাষের কাজ নিয়ে ব্যস্ত তখন এসেছো সার্চ করতে? তোমরা মরদ না জেনানা? থুঃ থুঃ।

বেল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের মানুষেরা একে একে ফিরে এসেছে। তারা তো অবাক। সিপাই-শাস্ত্রী নিয়ে একদল ভিনদেশী মানুষ, যন্ত্রপাতি নিয়ে এখানে কি করছে? ওরা ভীড় করে এসেছে। প্রশ্ন করেছে। উধম সিং ওদের বুঝিয়ে বলেছে, আজ তোমাদের এই গ্রামে বাঙালীবাবুরা সিনেমার ছবি তুলবে, খুব মজা হবে—

সিনেমা ওরা বোঝে না। অথবা বুঝতে চায় না। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর ঘরে ফিরে কোথায় একটু বিশ্রাম করবে তা নয়—এ কোথাকার এক উট্‌কো উৎপাত জুটে গেল? অ্যাঁ?

মোড়লকে ডাকা হল।

সে বললে—আমি একা কিছু বলতে পারব না। পঞ্চায়েত বসুক।

বসল পঞ্চায়েত। প্রচুর তর্ক-বিতর্ক হৈ হল্লা করে শেষে ওরা বলল—তোমাদের সঙ্গে এরা এসেছে কেন?

—কারা?

—এই মিলিটারী। এদের কি মতলব?

—এরা মানে এরা আমাদের দোস্ত-বন্ধু, এমনিই সঙ্গে এসেছে। এরা তোমাদের কোন ক্ষতি করবে বলে আসেনি—

—এরা আমাদের দুশমন।···তোমরা চলে যাবে আর এক একটা ডাকাতের দল এসে আমাদের গাঁয়ে হামলা করবে, জেরা করবে, মারবে ধরবে কাটবে, স্রেফ পুলিশ এসেছিল বলে—তখন? তখন তোমরা আমাদের বাঁচাবে?

উধম সিং সব শুনে বললে—রাগে আমার শরীর জ্বলছে। শালা এরা কেউ ডাকু নয়, ছ্যাঁচড়া হারামী, নইলে নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপর অনর্থক অত্যাচার করে? যখন-তখন এসে খানা পাকাতে বলে? মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট করে? খুন-খারাবী করে? আরে তাদের হাতে রাইফেল আছে, আমাদেরও আছে—আয়, মায়ের দুধ যদি খেয়ে থাকিস তো লড়ে যা, সামনাসামনি লড়ে যা, বাহাদুরের মত লড়ে যা—মরতে তো সবাইকে একদিন হবেই—

—অ্যাটেনশান কোম্পানী! আমরা এখানে আজ গোটা রাত থাকব। দু-মাইল আগু পিছু এই মহল্লা সীল করে দাও। একটা মাছিও যেন গলতে না পারে, দেখি শালা ডাকুরা কি করে···নিন্ সন্ধ্যে হয়ে আসছে, আপনারা শুটিং শুরু করুন।

ওয়াকী-টকী মূহূর্তে সজীব হয়ে ওঠে। চারিদিকে কর্ডনিং হচ্ছে। পাকা দু-মাইল জায়গা জুড়ে। ওপেন থাকছে শুধু গ্রামের পশ্চিমদিকের বেহড়। হেড কোয়ার্টার রিপোর্ট হচ্ছে ঘন ঘন। এমন সময় বেতারে খবর এল—প্রদীপকুমার লোকেশানের দিকে ম্যুভ করছেন, সঙ্গে সিকিউরিটি

আগে, সিকিউরিটি পেছনে। কুয়ারী নদীর পূব দিকের ঢালে যে রাস্তা, গাড়ি ওখান দিয়ে নামবে—ওভার।

আমাদের ডাবু গাঙ্গুলীর বিরাট জেনারেটর এক সময় সশব্দে চালু হয়েছে। একসঙ্গে অনেকগুলো বাতি জ্বলে উঠেছে। ফলে চির অন্ধকারে পড়ে থাকা বেহড়ের বিভীষিকা ঘেরা এই গ্রামটি আজ হঠাৎ যেন আলোর বন্যায় ভেসে গেছে। ছবির শিল্পীরা একে একে মেকআপ নিয়ে ডাকাতের রূপসজ্জায় ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। প্রবীণ শব্দযন্ত্রী অবনী চ্যাটার্জি সাউণ্ড ভ্যানে বসে 'মনিটার' শুনেছেন। শটের রিহার্সাল নিয়েছেন ক্যামেরাম্যান রামানন্দ সেনগুপ্ত। পরিচালিকা মঞ্জু দে এরপর একসময় টেক চেয়েছেন। তারপর শুরু হয়েছে চিত্রগ্রহণের পালা।...

...বাইজী পুতলীবাঈ-কে সঙ্গে নিয়ে ডাকু সুলতান সিং ডাকাতি করতে বেরিয়েছে। পুতলী নাচনেওয়ালী। সুলতান তাকে আসলে একজন নির্মম ডাকুতে রূপান্তর করতে চায়। সেদিন ঝড়ের বেগে সুলতান সিং সদলবলে রাতের অন্ধকারে গ্রামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। চতুর্দিকে গুলী চলছে। সন্ত্রস্ত গ্রামবাসীরা ছোটাছুটি করছে প্রাণভয়ে। বিকট আর্তনাদ করে কে যেন ধপ করে মাটিতে গড়িয়েও পড়ল। সুলতান সিং জীঘাংসায় হাঃ হাঃ হাঃ করে হাসছে। ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে পুতলীবাঈ। আতঙ্কে তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এসেছে এই রকম এক উত্তেজিত মুহূর্তে—

—হুশিয়ার...হুশিয়ার—বাঘের মত ক্ষিপ্র গতিতে লাফিয়ে উঠেছে উধম সিং। ওয়াকী টকী সজীব হয়ে কিছু বলছে—চেক টু ইয়োর ওয়েষ্ট ফ্ল্যাং...ওভার।

উধম সিং চেঁচিয়ে উঠেছে—বন্ধ করো। কোম্পানী, বি অন ইয়োর গার্ড—দুশমন নজদীগ হ্যায়, হু-শি-য়া-র।

লাইটস অফ লাইটস অফ। ডাবু গাঙ্গুলী উঠে জেনারেটারের মেন সুইচ বন্ধ করতেই ধ্বক শব্দে জেনারেটারটা প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনী দিয়েই নীরব হয়ে গেছে। ঝিঁ...ঝি...ঝি...ঝি...ঝি। এখন শুধু ঝিঁঝির ডাক।

তারই মধ্যে পশ্চিম বেহড়ের দিক থেকে ভেসে আসা বাতাসে কিসের শব্দ শুকছে সার্জেন্ট উধম সিং ? অস্পষ্ট একটা কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে না ? শুনুন তো কান পেতে !

আমাদের হৃদপিণ্ড তখন যেন লাফাচ্ছে। প্রদীপকুমারের একটা হাত আমার কাঁধে শক্ত করে ধরা। সমস্ত গ্রামটা নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে যেন টুপ করে তলিয়ে গেছে। বাড়ির ছাতে, গাছের মাথায়, শান্ত্রীর শক্ত হাতে ধরা রাইফেলের নল এখন পশ্চিমদিকে বাগানো। লাইট মেশিনগানার মাটিতে বুক দিয়ে পড়েছে। অব্যর্থ লক্ষ্যে এখন সে হৃদপিণ্ড ছ্যাঁদা করবার জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছে। হায় ঈশ্বর…

ফায়ার !

উঃ, কল্পনা করুন সে দৃশ্য, ঘন অন্ধকারের বুক চিরে একটা নরম শব্দ সুঁইইইইইশাক্-শাক্-শাক্, আলোর রোশনাই ছুটছে তো ছুটছে তো ছুটছেই—জ্বলন্ত ট্রেসিং বুলেট খুঁজছে তার দুশমনকে, অভিশপ্ত বেহড়ের অলিতে-গলিতে, সেই সঙ্গে উধম সিং-এর—ইয়ে সাহাব মৌত হ্যায়, আজ মরনাই হ্যায়, দেখ লো ইয়ে জিন্দেগী মোতকে বারে কেইসে আজ কামাল হো যাতা হ্যায়…

সেদিন ভোর রাত্রে, অর্ধমৃত আমরা সবাই কোন গতিকে ফিরে এসেছিলাম মোরেনাতে। অত্যন্ত নিরীহ ফিল্ম টেকনিশিয়ান এবং শিল্পী কয়েকজন। এবং তার মাত্র একদিন পরেই আমরা কলকাতায়। হাঃ!

মাইকেল সেভেনবার্গ আর রোজী ফ্রো-র সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ রাজকাপুরের শীততাপনিয়ন্ত্রিত আর. কে. স্টুডিওতে। সেদিন ওখানে একটা বিগ বাজেটের রঙীন হিন্দী ছবির শুটিং হচ্ছিল। ফ্লোরে একদল হিপি ছেলেমেয়ে, জেল্লাদার পোষাক পরে নানা ঢং করছিল। প্রতাপকে জিগ্যেস করতে সে বললে, আজ জন্মদিনের পার্টির শট্ নেয়া হচ্ছে। ছবির হিরো যেহেতু বিলেতফের্তা, তাই এইসব বিদেশী ছেলেমেয়েদের সেটে রিকুইজিশান দেওয়া হয়েছে। নাচ হচ্ছে, নাচ !

লাঞ্চ ব্রেকের পর ফ্লোরের বাইরে হঠাৎ দেখি দুটি ছেলেমেয়েকে কেন্দ্র করে হিপিদের বেশ একটা ভিড় জমেছে। এক্‌সট্রা সাপ্লায়ার ইয়াকুব গলদঘর্ম, হাত পা নেড়ে ওদের কি-যেন বোঝাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু হিপিরা বুঝতে না বা বুঝতে চাইছে না। ইয়াকুব আমায় দেখে বললে, দেখুন সাহাব, এই লোকেরা কি খতরনাক আদমী, পুরো অ্যাডভ্যান্স খেয়েছে, ফের বলছে এখুনি চলে যাবে, প্যাক-আপ হওয়া পর্যন্ত থাকবে না। বলুন তো, পার্টি আমায় ছেড়ে কথা কইবে? মেরে আমার চামড়া গুটিয়ে দেবে—

মাইকেল সেভেনবার্গ বলল, আলবৎ দেবে। তুমি আমাদের ধোঁকা দিচ্ছ, আমরা বলেছিলাম আট ঘণ্টা শিফটের জন্যে পাঁচ ডলার দিতে হবে, এখন শুনছি আড়াই ডলার, অতএব আমরা নেই ভাই। চার ঘণ্টা হয়ে গেছে, এখন আমরা চলে যাব—

ইয়াকুব শাসালো—ই-ই-ইঃ, যাও দেখি বুঝি তোমার কত বড় ক্ষমতা।

মাইকেল মৃদু হেসে বললে—তুমি আটকাও দেখি, চলে এসো রোজী।

ওরা সত্যি সত্যিই চলে যাচ্ছে দেখে ইয়াকুব হতভম্ব, ব্যাকুবের মত এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে হঠাৎ উর্দ্ধশ্বাসে ওদের পেছনে ছুট—এই সাহেব, সাহেব—আরে সত্যি সত্যিই চলে যাচ্ছ নাকি? আমি কিন্তু ভীষণ হাঙ্গামায় পড়ে যাব। তোমরা কন্টিনিউটী আর্টিষ্ট, প্রত্যেক শটে তোমাদের দরকার, এঃ—

মাইকেল বললে—পাঁচ ডলার করে দেবে তো?

ইয়াকুব তখন মরিয়া—দেব দেব, নিশ্চয় দেব, কসম।

মাইকেল বলল, কিন্তু তোমাকে বিশ্বাস নেই। নগদ দিলে থাকব নইলে চলে যাব।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে ইয়াকুব ভেতরের পকেট থেকে এক তাড়া নোট বের করে তা থেকে গুনে গুনে কিছু টাকা মাইকেলের হাতে দিল। মাইকেল সঙ্গে সঙ্গে বলল—বাঃ, কম দিলে কেন?

—কোথায় কম?

—নিশ্চয় কম, ডলার বাজারে বিক্রি করলে কত পাওয়া যায় জানো না বুঝি? ন্যাকামো করবে না—

ইয়াকুবের সে কথা শুনে কি প্রচণ্ড ক্রোধ। দাঁতে দাঁত পিষে বলল —কসম, আর যদি কোনদিন তোমাদের কাজ দিই—যত্তসব—বলে আরও কিছু নোট ওর হাতে গুঁজে দিতে তবে গিয়ে ব্যাপারটার একটা ফয়শালা হলো। মাইকেল আর রোজী আবার হাসিমুখে ফ্লোরে গেল।

ইয়াকুব ফোঁস করে এক নিঃশ্বাস ফেলে বললে—দেখলেন তো সাহাব, এরা কি রকম তেএঁটে মাল এক-একটা, হিপিদের মত গোলমেলে মানুষ দুনিয়ায় খুঁজে পাবেন না স্যার···

এরপর একদিন চার্চগেট স্টেশনে, ওদের সঙ্গে দেখা। ওরা দল বেঁধে কোথায় যেন যাচ্ছে। মাইকেল আর রোজী ওদের ঝোলা খুলে কি-যেন সব করছে।

আমি এগিয়ে গিয়ে হেসে বললাম—কি, কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

ওরা বলল—দেশলাই আছে তোমার কাছে?

দিলাম। ও হরি, দেখি ওরা গাঁজার কল্কে ধরাল। সঙ্গে একটা ডুগডুগি। সেই ডুগডুগি বাজিয়ে ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে মাইকেল বলল, দাঁড়াও এট্টু, মন্তর পড়ি—ব্যোম শঙ্কর, কাটা হরেণ টঙ্কর, যিস্‌কো খানা উস্‌কো পিন —হরহরহর মহাদেও—তারপর কষে টান, সাবাশ, কল্কেয় ভক ভক আগুন ছুটে একাকার। দেখে আমার তো চক্ষুস্থির। আরে করে কি ব্যাটারা। তারপর গরম কল্কেটা রোজীর পেলব হাতে তুলে দিয়ে পাক্কা দেড়-দু মিনিট দম আটকে পড়ে রইল মাইকেল। আর রোজীরও সমান ক্ষমতা, হ্যাঃ, কল্কে ফাটাবার ক্ষমতা রাখে যেন মেয়েটা। অনেকক্ষণ পর ধোঁয়া ছেড়ে মাইকেল বলল—মন্তরটা ঠিক ঠিক বলা হয়েছে তো?

বললাম—প্রায়।···ইয়ে, তো এখন চলেছ কোথায় তোমরা?

রোজী বলল—আমরা আজ নেপাল যাত্রা করছি। ওখান থেকে আরও কয়েকটা জায়গায় যাব। কিন্তু তুমি কে-হে?

বললাম—আমি বায়োস্কোপের লোক—

রোজী বলল—সরি, আমরা আর তোমাদের বায়োস্কোপে কাজ করব না। আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।

বললাম—না না, আমি তোমাদের ফিল্মের কাজ দিতে আসি নি। সেদিন আর. কে. স্টুডিওতে দেখেছিলাম বলেই আজ উপযাচক হয়ে কথা বলছি। কেন, রাগ করছ নাকি?

মাইকেল তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী করল—না না, সে রকম কিছু নয়। তবে তুমি এখন কেটে পড়ো তো। ভ্যাকর ভ্যাকর আর ভাল্লাগছে না।

অতএব আমি সরে পড়লাম।

তখন ভারতে রাশী রাশী হিপি ছেলে-মেয়ে আসছে। বোম্বের রাস্তায় প্রচুর চোখে পড়ছে। ছেলে-মেয়ে অবশ্য চেনবার উপায় নেই, এমনই বিচিত্র সব বেশভূষা ওদের। এল. এস. ডি., মারিজুয়ানা, ভাঙ, সিদ্ধি—এসব নিয়েই মেতে আছে ওরা। দেখে বড় কৌতূহল হত—কোত্থেকে এসেছে, কিইবা ওদের উদ্দেশ্য-আদর্শ, কি-ভাবে দিন চলে, অথচ প্রশ্ন করলে সদুত্তর পাওয়া যেত না।

এমন সময় হঠাৎ একটা যোগাযোগ হয়ে গেল। আইভরি মার্চেন্ট প্রোডাকশন তখন ভারতে একটা ছবি করছিলেন—'দি গুরু', জেমস আইভরি সে ছবির পরিচালক, আর ইসমাইল মার্চেন্ট প্রযোজক—টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্সের ব্যানারে তোলা হচ্ছিল ছবিটি। ওঁরা এদেশে কি ভাবে ছবিটি তোলা হচ্ছে—তার ওপরই একটি শর্ট ফিল্ম করতে মনস্থ করলেন। ইমেজ ইণ্ডিয়ার শান্তিপ্রসাদ চৌধুরীর সঙ্গে তখন আমার যোগাযোগ ছিল, ওঁরা আমাকেই সাজেস্ট করলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা টিম তৈরী হল। বোম্বের ক্লেম বাপ্তিস্তা, মাদ্রাজের মণীন্দ্র রাও আর কলকাতার আমি। একটা বড়গোছের টি. ভি. ইউনিট। বাপ্তিস্তা আমায় বোম্বেতে ব্যাপারটা ব্রিফিং করলেন, 'দি গুরু'র ওপর ছবি করা ছাড়া বিদেশী টেলিভিশানের জন্যে আরও একটা স্বতন্ত্র ছবি আমাদের করতে হবে—ভারতে এই যে রাশী রাশী হিপি আসছে—তার সঠিক কারণ খুঁজে

বের করতে হবে প্রথমে। আমি বললাম, তাহলে আমাকে হিপিদের নিয়ে যে ছবি হবে, তার দায়িত্বই বরং দেওয়া হোক।

তথাস্তু।

আমাদের প্রথম লোকেশান—বেনারস। খবর পাওয়া গেল, বাবা বিশ্বনাথের চরণে ঠাঁই নেবার জন্যে হাজার হিপি আর হিপিনী নাকি ওখানে জড়ো হয়েছে।

বেনারসের এয়ারপোর্টে নামতেই ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ মালুম পাওয়া গেল। হোটেল থেকে গাড়ী এসেছিল। ড্রাইভার ছেলেটি খুব চৌকস। বললে, হ্যাঁ বাবুজী, বহুৎ গোরা সন্ন্যাসী আব্ ইধর মে হ্যায়। সমঝমে নেহি আতা ক্যা মতলব—

সহকারী ক্যামেরাম্যান জাম্বলে বললে—মতলব সোজা। নেশা-ভাঙ করার এমন স্বর্গ তো ত্রিভুবনে আর কোথাও নেই, তাই এয়েছে—

সন্ধ্যেবেলায় চার্লস গ্রেগরী নামে একটি হিপির সঙ্গে দেখা হল। ও বললে, আমরা এখানে এসেছি মুক্তির সন্ধানে। আমরা মুক্তি চাই। আত্মার মুক্তি…

—ব্যস ?

—কেন, এটাই কি যথেষ্ট নয় ? আরে ওকি, ওকি হচ্ছে ? চার্লস হা-হা করে উঠল, তোমরা ছবি তুলছ নাকি।

জাম্বলে একগাল হেসে বললে—বিলক্ষণ।

চার্লস বলল—না না, ছবি-টবি আমি পছন্দ করি না। আলোচনা হচ্ছে—আলোচনা হোক, এর মধ্যে হুট করে আবার ছবি-টবি কেন ?

আমরা বুঝিয়ে বললাম—তোমাদের এই যে মহৎ উদ্দেশ্য, এটা যাতে সবাই তাড়াতাড়ি বোঝে, সেইজন্যেই এই ব্যবস্থা। আপত্তি করার কি আছে ?

চার্লস সখেদে বললে—বাঙালকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছ ? আমি বাবা সব বুঝি। তোমরা টু-পাইস কামাবার জন্যে এটা করছ। না বাবা, আমি ওর মধ্যে নেই—

জাম্বলে বললে—তুমি ভাল লিয়াজঁ করতে পারছ না, তুমি সর, আমি এক্ষুনি ওকে বাক্যবাণে কাৎ করে ফেলছি।

বলে জাম্বলে বলল—চার্লস সাহেব, গুপী-যন্তর বোঝ?

—হোয়াট গুপী যন্তর?

—কল্কে? বলে হাতের মুদ্রা করে দেখাল। হাসি আর যেন ধরে না চার্লসের মুখে—নিশ্চয় জানি, ইউ মিন গাঁজা?

—হ্যাঁ গাঁজা। জাম্বলে বললে—তোমার পারফরমেন্সটা একবার দেখতে চাই আমরা। দেখাবে?

চার্লস সহাস্যে তার থলে থেকে শ্রীকল্কে বের করে তৎক্ষণাৎ মশলা পুরে ফেলল। তারপর বললে—এইবার অগ্নিসংযোগ—

জাম্বলে মহা উৎসাহে দেশলাই জ্বালিয়ে দিল ওর কল্কেয়, আমাদের ক্যামেরা তকক্ষণে চালু হয়ে গেছে—জাস্ট দিস ইজ দি ওয়ে ওয়ান হ্যাজ টু স্মোক, এর কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমি ভারশূন্য একটা মার্গে যদি না ওঠো তো কি বলেছি।

' পুণ্যস্রোতা গঙ্গার ঘাটে তখন সবে সন্ধ্যে নামছে। হিপি আর হিপিনীরা টাউন ভ্রমণ শেষ করে সেখানে একে একে ফিরছে। আমেরিকান, ইতালীয়ান, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, কানাডিয়ান, বৃটিশ, স্ক্যাণ্ডানেভিয়ান।

জাম্বলের ঠিকই নজর আছে। ব্যাটারী সান-গান লাইট ওদের দিকে পয়েন্ট করা আছে, আমাদের সিগন্যাল পাওয়া মাত্রই পটাপট সেসব জ্বেলে দেবে, আর ওরা কেউ আপত্তি জানাবার আগেই দু'তিনশো ফুট একসপোজ করে নেবে ক্যামেরাম্যান মণীন্দ্র রাও। আমরা গোটা পরিকল্পনাটাই এভাবে করে রেখেছিলাম। হঠাৎ জাম্বলের আর্তনাদে আমরা ওদের দিকে চোখ ফিরিয়েই থ'। আরে রামচন্দ্র, একেবারে বিবস্ত্র হয়ে ওরা ঝুপ ঝুপ করে নেমে পড়ছে গঙ্গার জলে।

চার্লসের শট নিয়ে নেওয়া হয়েছে ততক্ষণে। সে এবার চেঁচিয়ে ডাকল—ব্রো, এদিকে এসো, মিট আওয়ার ইণ্ডিয়ান ফ্রেণ্ডস—

ব্রো তখন জলে।

চার্লস বললে—ব্রো হচ্ছে কানাডিয়ান, ইন্সিডেণ্টালী শি ইজ মাই হাজব্যাণ্ড—

'শি' কথায় চমক লাগল জাম্বলের।—সেকি, ব্রো ছেলে, না মেয়ে?

—মেয়ে।

—তোমার হাজব্যাণ্ড কি করে হল? মেয়ে তো?

চার্লস বললে—ওই হচ্ছে ব্যাপার। ওটাই আমাদের হিপিইজম বলতে পার। পুরুষরাই চিরকাল স্বামী হবে? কেন? মেয়েরাও তো হতে পারে। ব্রো, কাম অন, এট্টু আলাপ কর এদের সঙ্গে—

জাম্বলে লাফিয়ে উঠে বললে, সর্বনাশ, ও-যে ন্যাংটো, এখানে আসবে নাকি?

—আলবৎ আসবে। আসতে পারলেই আসবে। তোমাদের এখানকার পুলিশরা বড্ড টেঁটিয়া, নইলে এইরকম একটা ট্রপিক্যাল কান্ট্রি, গরমের দেশ, এখানে গুচ্ছের জামা-কাপড় পরে সঙ সেজে বেড়াবার কোন অর্থ হয় না—

—চার্লস, তোমার গার্ল-ফ্রেণ্ডের শট নেব আমরা?

—ব্রো যদি চায় নিশ্চয় নেবে। ওকে তোমরা কিছু অফার কর। ভাঙ, সিদ্ধি অ্যাণ্ড ফ্রেণ্ডশিপ—

জাম্বলে বলল—নিশ্চয় নিশ্চয়।

মণীন্দ্র রাও খাটো গলায় প্রশ্ন করল—সব ঠিক আছে, লেকিন সেন্সার?

বললাম, চলবে তো ছাই ওদের দেশের টেলিভিশানে। ওদের আবার ওসব বালাই নেই। বিলিতি মেয়ে এদেশে নেংটো হয়ে জলে কেলি করছে, আইডিয়াটা ইকুয়ালি থ্রিলিং টু দেম। আমাদের দেশে পথে-ঘাটে ধর্মের ষাঁড় চরছে—সে-সব শট তো দেখে ওরা, এবার বার্থ-ডে-স্যুটে বিলেতি মেয়েও দেখুক কেমন গঙ্গার জলে নাইছে।

মেয়েদের বয়স ধরে কার সাধ্য। তবে বিলেতি মেয়েদের শরীরে যে যৌবন দীর্ঘস্থায়ী হয় এটা ট্রপিক্যালের আমরা জানি। ব্রো নামক মেয়েটি

ঝোঁ করে জল থেকে উঠে আসতেই মণীন্দ্র রাওয়ের কান লাল। বললে, বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে, চার্লস, এনাফ অফ ইট, প্লীজ, এবার ওকে কাপড়-চোপড় পরতে বল।

ওধারে কিছু লোক স্নান করছিল। ওই দৃশ্য চোখে দেখে তারা তাজ্জব। মুহূর্তে ভিড় জমে গেল আঘাটায়। বাইস্কোপ-কা শুটিং চল্ রহা হ্যায়, বড়ি আনন্দ কি বাৎ ভাই, বোম্বেসে কোন আয়া?

জাম্বলের কি বিরক্তি।—কেউ আসেনি ভাই কেউ আসেনি। তোমরা কেটে পড় তো দয়া করে।

চার্লস সহানুভূতি দেখিয়ে বললে—আহা তাড়াচ্ছ কেন? আমাদের দেখবার জন্য তোমাদের লোকজন তো সর্বত্রই ভিড় করে, কিছু প্যালাও পড়ে। সেইজন্যে আমরা কখনো কিছু বলি না। দেখুক দেখুক।

আর ঠিক সেই সময় হঠাৎ মাইকেল সেভেনবার্গের সঙ্গে দেখা। আমায় দেখে মৃদু হেসে বলল, আবারো দেখা হল। তোমরা এখানে শুটিং করছ নাকি?

বললাম—হ্যাঁ, তবে তোমার সেই বোম্বের হিন্দী ছবি নয়, এটা টেলিভিশানের জন্য একটা স্পেশাল ফিচার তোলা হচ্ছে—'হিপিস অ্যারাউণ্ড ইণ্ডিয়া', ইচ্ছে করলে তুমিও ইণ্টারভিউ দিতে পার।

মাইকেল হাসল।

—কোথায় আছো?

মাইকেল বলল—ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের পাশে লঙ্কা নামে একটা জায়গা আছে, সেখানে একটা ভাঙাচোরা বাড়ী ভাড়া করে আছি আমরা—

—তোমার সেই গার্ল ফ্রেণ্ড, সে কোথায়?

মাইকেল ভ্রূ-ভঙ্গী করল—রোজীর কথা জানতে চাইছ? রোজী এখন নেপালে। ওর ইচ্ছে ও ওখানেই থেকে যাবে।

—কেন, কি হল।

—রোজী খুব টায়ার্ড ফিল করছে। কিছুদিন আগে ওর একটা বাচ্চা হয়েছে, ও আর আমাদের সঙ্গে ঘুরতে পারছে না।

মাইকেল বৃটেনের ছেলে। রোজী স্টেটসের। ওরা দুজনেই শিক্ষিত। জীবনে এক একটা মুহূর্ত আসে যখন নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ, দারুণ অর্থহীন, সব কিছুর আকর্ষণকে বিড়ম্বনা বলে মনে হয়, তখন হঠাৎ একদিন কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়েছিল। মধ্যপ্রাচ্যে এসে রোজীর সঙ্গে ওর দেখা। ভোগবিলাসের চূড়ান্ত করার পর রোজী জীবনের প্রকৃত অর্থ খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছিল অকস্মাৎ-ই একদিন। ওর জীবনে তখন ভাললাগা মন্দলাগা বলে তখন কোন অনুভূতিই ছিল না। এল. এস. ডি আর মারিজুয়ানার নেশায় বুঁদ হয়ে এদেশ থেকে ওদেশে শুধু যাওয়াই যখন জীবনের একমাত্র কাজ—তখনই হঠাৎ মাইকেলের সঙ্গে ওর দেখা।

ভাল।

মাইকেল বলল—এসব তোমাকে বলছি কেন হে? তুমি কে?

—আমি একজন শ্রোতা।...বলতে তোমায় একদিন হতই। আর শ্রোতা কেউ না কেউ একজন থাকতই। ধর আজ সেই শ্রোতা আমি—

—বটে।...তাহলে শোন, আমি শুনেছিলাম ভারতের একজন যোগী, লণ্ডনে সে একদিন মস্ত মিটিং করে বললে, আমার সঙ্গে চল, জীবনের সব অকৃতকার্যতা, অকৃতার্থতার, অকৃতজ্ঞতার শেষ দেখাব আমি, নতুন একটা পয়েন্টে দাঁড় করিয়ে দেব—, নতুন জীবন শুরু হবে তোমাদের সকলের—কাম অন্—

জাম্বলের তার রেকর্ডিং মেশিন অন করেছে ততক্ষণে, মণীন্দ্র রাও তার শক্তিশালী অ্যারিফ্লেকস্ ক্যামেরা, ম্যাগাজিনের মধ্যে সেলুলয়েডের ফিতে সমগ্র দৃশ্য এবং শব্দকে সতর্কতার সঙ্গে গ্রহণ করতে শুরু করেছে।

—তারপর?

—তারপর এদেশে এসে দেখলাম বিরাট বুজরুকি, লোকটা স্রেফ ধাপ্পা দিয়েছে আমাদের। আসলে ও নিজেই জানে না ওকে। যেমন আমরাও জানি না আমরা কোথায় যাচ্ছি—কোথায় আমাদের আসল উত্তরণ......

রাত্রি দেড়টা পর্যন্ত আমরা শুটিং করছি, লঙ্কার সেই ভগ্নগৃহ স্তূপে।

কুড়ি পঁচিশটি জোয়ান ছেলেমেয়ে নেশায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য। তারা বকছে, বাঁশি বাজাচ্ছে, নাচছে, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরছে, প্রলাপ বকছে, হাসছে, কাঁদছে, যৌনক্রিয়া করছে। আমরা যেন পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যাওয়া একখণ্ড আশ্চর্য মানুষ নামক জীব, এই মুহূর্তে ইতিহাসের পাতায়, ফিল্মের ইমালশানে যেটা আশ্চর্য বিশ্বস্ততার সঙ্গে রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে আগামী দিনের অনামা কোন মানব-সভ্যতার জন্যে…

পরদিন আমরা সবাই বেনারসের পশ্ হোটেল 'হোটেল-ড্য-প্যারিসে'। বৃটেনের তরুণী চলচ্চিত্রাভিনেত্রী রীটা টুশিংহ্যাম ইন্টারভিউ দেবেন। আর দেবেন বৃটেনের জনপ্রিয় নায়ক মাইকেল ইয়র্ক। ওখানে অপর্ণা সেনের সঙ্গে দেখা। উনি 'গুরু' ছবির শুটিং-এ এসেছেন, ওঁর স্বামী সঞ্জয় সেনও এসেছেন। সঞ্জয় আমার অনেক দিনের বন্ধু। উৎপল দত্তর ইন্টারভিউ নেওয়া হল।

আমরা ফিরে আসছি। সারাদিনের কাজ শেষ। পরদিন সকালে হৃষিকেশ যাবার কথা। ওখানে বিটল রাজা জর্জ হ্যারিসন এসে মহর্ষি মহেশ যোগীর আশ্রমে উঠেছে। শোনা গেল, ফ্রাঙ্ক সিনাত্রার সদ্য তালাক দেওয়া স্ত্রী মিয়া ফারো-ও এসেছে। এক ডজন টি. ভি. ইউনিট নাকি ওখানে দমাদ্দম শুটিং করছে।

হোটেলে ফিরে দেখি, মাইকেল একটা স্লিপ রেখে গেছে। তাতে একটা ঠিকানা। লেখা, 'তোমাদের এই ছবির একটা প্রিণ্ট এই ঠিকানায় পাঠালে সঙ্গে সঙ্গে বিক্রী হয়ে যাবে। ওরা কিনবে, কারণ আমার অনেকগুলো মুভিশট ওর মধ্যে আছে। আমার নৈতিক অধঃপতনের এমন খোলাখুলি ছবি ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি, যদিও আমার মত অধঃপতিত পুরুষ পৃথিবীতে দ্বিতীয় কেউ নেই বলেই আমার নিজের ধারণা। আমি, এক অভিজাত পরিবারের ছেলে। টাকা পয়সা মান প্রতিপত্তি কিছুরই অভাব নেই। আর নেই বলেই আমি নিজের ওপর ভীষণ বিরক্ত। এক্ষুনি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছি। মনে হচ্ছে এখন আত্মহত্যাটাই একটা করার মত জিনিস। বাই।'

আমি হৃষিকেশে গিয়েছিলাম। সেখানে সহস্র ঘটনার মুখোমুখি হয়েছি। কিন্তু মাইকেলের মত আর একটি ঘটনার কিন্তু পুনরাবৃত্তি হয়নি।

এইচ. জি. ওয়েলস সাহেব তাঁর লেখায় এক অত্যাশ্চর্য টাইম মেশিনের কল্পরূপ দিয়েছিলেন। বায়োস্কোপে সেই কাহিনীর চিত্ররূপ দেখে আমরা মহা তাজ্জব—বাপস, বাস্তবিক এমন একটা মেশিন পয়দা করতে পারলে কত না মজার ঘটনা উল্লেখ করা যায়। ধরা যাক্ এই মুহূর্তে পরিস্থিতিটা সেইরকম, ইত্যবসরে আসুন টাইম মেশিনে চেপে আমরা একটু পিছিয়ে আমাদের কলকাতার বায়োস্কোপের সবচেয়ে বেশী মজা যে দশকে—সেই চল্লিশের দশকে চলে যাই। কী?

জেনে রাখুন, তখন সুদূর মাদ্রাজ থেকে প্রযোজকরা দলে দলে কলকাতায় আসতেন তামিল, তেলেগু ভাষার ছবি তৈরী করতে। এখন যেমন অসমীয়া, ওড়িয়া, মণিপুরী, মৈথিলী, ভোজপুরী ভাষাভাষী ছবি করতে ওঁরা সদলবলে এখানে আসেন, তখন তামিল, তেলেগু ছবি এখানে এসে করা ছাড়া বড় উপায় ছিল না। মলিনা দেবী নিজে আমায় একদিন বললেন, ভাই, আমরা হাতিমার্কা এন. টি. স্টুডিওতে একই ছবির দু'তিনটে ভার্শানের শুটিং করেছি—

—মাদ্রাজী?

—হ্যাঁ, তা-ও করেছি।

—কিন্তু করতেন কিভাবে? তামিল ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি জানতেন?

মুচকি হাসি মলিনা দেবীর। —ডায়লাগ খুব কমই থাকতো। তাছাড়া আমরা সেই ভিনদেশী ভাষা কাগজে লিখে নিয়ে মুখস্থ করতাম, ডায়লাগ ট্রেনার থাকতেন। উচ্চারণে ভুল হলে তিনি শুধরে দিতেন। বেশী কথা কি, এখনও হিন্দী ছবির ক্ষেত্রে ট্রেনার রেখে তবে অ্যাকটিং করতে হয়। মোটকথা, ভাবটা ফুটিয়ে তুলতে পারলেই হল।

খাঁটি কথা। কলকাতায় তনুজা এই একই নিয়মে পরের পর কতকগুলো বাংলা ছবিতে অভিনয় করে গেছেন। বাংলা-হিন্দী মিলিয়ে অ্যাকটিং

করেছেন বহু অ-বাঙালী। আমাদের এখানকার নন্দিতা বসু, সম্প্রতি যিনি 'নগরদর্পণে' ছবিতে অভিনয় করতে কিছুদিন কলকাতায় এসেছিলেন, উনি তামিল ছবির একজন নামী অভিনেত্রী। ওখানে বেশ কিছু ছবিতে অভিনয় করে নন্দিতা বেশ প্রশংসা পেয়েছেন। লিলি চক্রবর্তী একটি তেলেগু ছবিতে বেশ সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। তেমনি এন. বিশ্বনাথন খাঁটি দক্ষিণ ভারতীয় হয়ে বাংলা ছবিতে যা অভিনয় করেছেন—দেখে তাজ্জব হতে হয়।

মলিনা দেবী সহাস্যে বললেন—ভাষাটা কিছু নয় ভাই, আসলে অভিনয়টাই বড় কথা। ওটা ভাল রকম যদি কেউ রপ্ত করতে পারে, যে কোন ভাষায় সে দাপটের সঙ্গে অভিনয় করতে পারে। আমার তো তাই বিশ্বাস···

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, তখন মাদ্রাজী প্রযোজকরা এখানে আসতেন তামিল বা তেলেগু ছবি তৈরী করতে। প্রধান প্রধান শিল্পীরা অবশ্য সঙ্গে আসতেন। ছোটখাটো পার্টের জন্যে স্থানীয় লোকজনই যথেষ্ট, এক্সট্রা হলে তো কথাই নেই। একবার এই রকম একটা পার্টি এসেছে, ছবিটি পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছেন নীরেন (বেণু) লাহিড়ী, সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বও ওঁর। ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে ছবির শুটিং আরম্ভ হলো একটা শুভদিন-ক্ষণ দেখে। পৌরাণিক কাহিনী। ফলে সেট সেটিং-এর অসম্ভব গ্র্যাঞ্জার। বটু সেন আর্ট ডিরেক্টার।

বটু সেন জানতে চাইলেন—কি রকম সেট ভাই ?

নীরেন লাহিড়ী জানালেন—মস্তবড় একটা রাজ দরবারের সেট লাগিয়ে দিন আপনি। একটানা সাতদিন ওখানে আমাদের শুটিং করতে হবে বটুবাবু, তাই বুঝে-সুঝে সেটটা তৈরী করবেন—

বর্তমানে বাংলা চলচ্চিত্রের সবচেয়ে প্রবীণ শিল্প-নির্দেশক হচ্ছেন এই ফেমাস বটু সেন। ওঁর ক্রেডিটে প্রায় সাড়ে পাঁচশো ছবি ; সম্প্রতি ওঁর কর্মজীবনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে শিল্পী সংসদ ওঁকে সম্মান জানিয়েছেন। ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর বর্তমান সাউণ্ড ইঞ্জিনীয়ার জে. ডি.

ইরাণীর বাবা দিন্‌শা. এ. ইরাণীর সহকারী থেকে উনি কাজ শিখেছিলেন সেই ম্যাডানদের আমলে, সেদিন নীরেন লাহিড়ীর কথা শুনে উনি দুনিয়াকে তাজ্জব করে একটা অপূর্ব রাজসভার সেট তৈরী করেছিলেন। মাদ্রাজীরা তো দেখে থ। একড়ে নালু পো······

পটভূমি ক্লিয়ার তো? এবার আসুন সেই বায়োস্কোপে ঢুকে পড়া যাক। পরদিন সকালে নীরেন লাহিড়ী শুটিং করতে এসে হঠাৎ কি মনে পড়ায় ফ্লোরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

ছবির প্রোডিউস্যার তদ্দিনে নীরেন লাহিড়ীকে চিনে গিয়েছিলেন। হঠাৎ ওঁকে ওইভাবে ব্রেক কষে দাঁড়াতে দেখে তাঁর কৌতূহল—আবার কি হলো? এন্‌নি থিংগ্‌গ্‌গ রংগা?

অর্থাৎ—কিছু গণ্ডগোল আছে নাকি ভাই সাহেব?

নীরেন লাহিড়ী পায়চারী করতে করতেই জবাব দিলেন, কেমন যেন অন্যমনস্ক ভঙ্গীতে—নাথিং রং···কল গান্ধীবাবু—

গান্ধীবাবু খাশ বাঙালী এবং দু'দে প্রোডাকশন কণ্ট্রোলার।

তিনি নীরেন লাহিড়ীর আহ্বানে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। সাক্ষাৎ যেন বিনয়ের অবতার।—কী ব্যাপার স্যার?

পরিচালক তাকে একপাশে নিয়ে গিয়ে প্রথমতঃ কোঁস—অর্থাৎ দীর্ঘশ্বাস, তারপর ভগ্নকণ্ঠে—গান্ধীবাবু, আজ বোধহয় প্রেস্টিজ যায়—

—কেন স্যার? ব্যাপারটা কী?

—ব্যাপারটা গুরুতর। নীরেন লাহিড়ী বললেন—গতকাল এত করে ভাবলাম বলবো অথচ দেখুন আপনাকেই বলা হলো না। ইয়ে, আজ এই সেটে আমার কিছু সভাপণ্ডিত লাগবে যে। পারবেন সাপ্লাই করতে?

—বিলক্ষণ বিলক্ষণ। সুটিং-এ সভাপণ্ডিত যদি দরকারই পড়ে তো হেঁ হেঁ হেঁ, ও নিয়ে আপনি একদম ভাববেন না। বোঁদেকে পাঠাচ্ছি। এক্ষুনি জোগাড় করে আনছে।···ইয়ে, তা ক'টা নাগাদ পেলে আপনার সুবিধা হয় বলুন তো?

নীরেন লাহিড়ী সামান্য ইতস্তত করে জবাব দিলেন—ধরুন লাঞ্চের আগে।

—হুঁম···ক'জন সভাপণ্ডিত দরকার আপনার ?

—তিনশো।

—অ্যাঁ? বলেন কি? তিনশো লোক চাই? গান্ধীবাবুর চোয়াল ঝুলে যাবার দাখিল—একটু ইয়ে হয়ে গেল না ?

—কিয়ে ?

—না, মানে ব্যাপারটা একটু কঠিন হয়ে গেল কিনা, তাই বলছিলাম ···চিন্তাকুল ভঙ্গীতে গান্ধীবাবুর জবাবদিহি—তবে যাই হোক, জোগাড় ও আমি আপনাকে করে যখন একবার দেব বলেছি তখন নিশ্চিন্ত থাকুন, পেয়ে যাবেন। চলি স্যার—

বলেই গান্ধীবাবু যাঁহাতক অ্যাবাউট টার্ন, নীরেন লাহিড়ী হঠাৎ একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে—ও মশাই, ব্যাপারটা এখনও শেষ হয়নি যে—

গান্ধীবাবু ঘুরে সপ্রশ্নে—ঘাবড়াবেন না, তিনশ সাড়ে তিনশো লোক জোগাড় করে দিচ্ছি আমি—

—না, না, ন্যাড়া চাই ন্যাড়া—

—কি ন্যাড়া ?

—পণ্ডিত—

—মানে ?

—ইয়ে মানে সভাপণ্ডিত চাই—তবে ন্যাড়া—

—ন্যাড়া ? গান্ধীবাবুর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি—ন্যাড়া করে বলুন তো কি বলতে চাইছেন ? সভাপণ্ডিত চাইছেন তিনশো আবার ন্যাড়া-ফ্যাড়া কি ?

নীরেন লাহিড়ীর সপ্রতিভ ভঙ্গী। সাক্ষাৎ নাটোরের রাজবাড়ির ছেলে উনি। ব্যক্তিত্বে কারো চেয়ে কম যান না। সামান্য কেশে গলা সাফ করে বিব্রত ভঙ্গীতে বললেন—ওই তো বললাম সভাপণ্ডিতের কথা, ওটা ঠিকই আছে, কিন্তু মুস্কিল হয়েছে কি জানেন—মাদ্রাজের ব্রামহিনসরা ন্যাড়া মাথায় আবার ইয়াব্বড় বড় টিকি রাখে; সভাপণ্ডিত মানেটা এবার বুঝে নিন—

বলে, নীরেন লাহিড়ী ব্যস্ততার ভঙ্গী করে হঠাৎ ফ্লোরে ঢুকে গেলেন। আর এদিকে গান্ধী পতন হবার উপক্রম। পরিস্থিতিটা বুঝতে তাঁর বেশ কয়েক মুহূর্ত লাগল। অর্থাৎ এক্ষুনি তিনশো ন্যাড়া লোক চাই। শুধু ন্যাড়া হলেই চলবে না। সেই সঙ্গে মাথায় টিকি থাকাও দরকার—মাদ্রাজী ব্রামহিনস্‌দের ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায়।

বিহ্বলকণ্ঠে বললেন—একত্রে তিনশো ন্যাড়া এখন পাই কোথায় বলুন তো? দাদা, আজ দেখছি এক ভয়ঙ্কর রিকুইজিশান আমায় ধরিয়ে দিলেন…

নীরেন লাহিড়ী অমনি ফ্লোরের ভেতর থেকে হেঁকে বললেন—গান্ধীবাবু, বাঙালী টেকনিশিয়ানদের প্রেস্টিজ আজ কিন্তু সব আপনার হাতে। আসল কথা, মাদ্রাজী ফ্রেণ্ডদের আজ দেখিয়ে দিতে হবে—হ্যাঃ, আমরাই এক ডাকে তিন দুগুনে ছশো ন্যাড়া এনে ফেলতে পারি ক্যামেরার সামনে…

গান্ধীবাবুর চুল খাড়া। বোঁদে মিত্তির ওঁর সহকারী। এতক্ষণ ঘাপ্‌টি মেরে ছিল। এবার রঙ্গমঞ্চে এল যেন।—ক্ষেপেছেন। এই কলকাতা শহরে তিনটি ন্যাড়া যদি একত্রে পান তো জানলেন আপনার কপাল ভাল। তিনশো পাবেন কোথায়? নীরেনদার যেমন কথা—

—তাহলে?

—তাহলে নেই, এর মধ্যে তাহলে বলে আর কোন কথা নেই গাঁধিদা। লোকে ন্যাড়া হয় এক ছেরাদ্দে আর তেমন তেমন সংগিনী পেলে—

—বুঝলাম, কিন্তু একটা উপায় তো খুঁজে বের করতেই হবে। কাজটা আটকে গেলে তো ভাল কথা হবে না বোঁদে। রাগিসনে। ভেবে-চিন্তে একটা উপায় বের কর। তুই তো অসাধ্য সাধতে পারিস—

বোঁদে মিত্তির বিব্রত মুখে বললে—দাদা, এ অসম্ভব।

গান্ধীবাবুর আকুতি—বোঁদে বোঁদে, মোটা কমিশন—। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস্‌নি বাপ। একবার চেষ্টা করে দেখ—

তখন বোঁদে মিত্তির উবু হয়ে বসে বিড়ি জ্বালিয়ে চিন্তায় বসল। কি করে সমস্যার সমাধান হয়—ভাবতে লাগল। গান্ধীবাবুও তথৈবচ। এর

মধ্যে নীরেন লাহিড়ী এক চক্কর ঘুরে গেলেন,—ফ্লোরে লাইট করছি গান্ধীবাবু, একটু চটপট করুন—

হঠাৎ জ্বলন্ত বিড়ি ফেলে বোঁদে মিস্তির লাফিয়ে উঠতেই গান্ধীবাবু সাগ্রহে—পেলি নাকি কিছু?

—মাথায় একটা ফন্দি এয়েচে গাঁধিদা—বলে গলা খাটো করে বোঁদে মিস্তির গান্ধীবাবুর কানে কি সব যেন বলল। শুনে গান্ধীবাবু বললেন মন্দ বলিসনি কিন্তু বোঁদে···তাহলে দেখি একবার কপাল ঠুকে। তুই তাহলে এদিককার বন্দোবস্তটা করে ফেল, আমি বোঁ করে ঘুরে আসি—

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর পেছনে তখন ছিল পেল্লায় এক বস্তি। নানান দেশের লোকেরা সেখানে সহবস্থান করতো। গান্ধীবাবু সেখানে সুপরিচিত। এই বস্তিব কিছু লোক প্রয়োজনে বিভিন্ন ছবির একসট্রার কাজও করত।

গান্ধীবাবু যখন সেখানে পৌঁছালেন—বস্তির লোকজন তখন সবে রুজি রোজগারের ধান্দায় বেরুবে বলে প্রস্তুত হচ্ছে। বেশীর ভাগই কুলি কামিনের কাজ তাদেব। গান্ধীবাবুকে দেখে তারা ভীড় করে এল। ছবির কাজে তো কোন কায়িক পরিশ্রমের প্রয়োজন পড়ে না, অথচ রোজগার-টার বেশ ভাল, টিফিন পাওয়া যায়, বসে বসে নট-নটীদের নানা মজা দেখা যায়। গান্ধীবাবু একটা চায়ের দোকানের টুল টেনে নিয়ে তার উপর দাঁড়িয়ে প্রথমে কিঞ্চিৎ আওয়াজ দিলেন। ফলে ভীড় যা ছিল তা নিমেষে ডবল হলো। এরপর গান্ধীবাবু তেড়ে একখণ্ড বক্তৃতা দিলেন—রীতিমত ওজস্বিনী ভাষায়। বয়ানটা মোটামুটি এই রকম: অদ্য ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে বিরাট এক যজ্ঞের আয়োজন করা হইয়াছে। সেই যজ্ঞে প্রচুর সভাপণ্ডিত চাই। প্রত্যেক সভাপণ্ডিতের বিদায়েরও সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রত্যেককে একটি টাকা, একখণ্ড গামছা এবং পেট চুক্তি ভূরিভোজন। চলুন বন্ধুগণ, আজ সদলবলে ঝাঁপাইয়া পড়ি।

শুনে শ্রোতাদের মধ্যে বিপুল চাঞ্চল্য দেখা গেল।

দরকার তিনশো, ঝাঁপিয়ে এলো চারশো।

গান্ধীবাবুর হুঙ্কার—তফাৎ যাও, লাইন দিয়ে দাঁড়াও—

নিমেষে লাইন হল। কিছু লোক হঠাৎ ভলিন্টিয়ারী শুরু করে দিল—একে বাদ দেয়, তাকে ঢুকিয়ে দেয়। গান্ধীবাবু লাইন দেখে খুব খুশী। বেছে বেছে রোগা পটকা দেখে তিনি শ'তিনেক লোক নির্বাচন করে নিলেন। যারা বাদ পড়ল তাদের তো মুখ শুকিয়ে আমসী।

এবার মিছিল চলল স্টুডিওর দিকে। এমন অভিনব ঘটনা ইতিপূর্বে এখানে কেউ দেখেনি। সবার চক্ষুস্থির।

ওদিকে স্টুডিওতে রিহার্সাল যা দেবার বোঁদে মিস্তির আগেই দিয়ে রেখেছিল। মিছিল যাঁহাতক স্টুডিওতে ঢোকা—দড়াম করে লোহার গেট বন্ধ হয়ে গেল চোখের ইসারায়। তারপর শুরু হল সেই ঐতিহাসিক ঘটনা। স্টুডিওর ভোজপুরী দ্বারোয়ানরা তাদের লাঠিসোটা বের করে আরে যাঃ, কি পাঁয়তাড়া আর হুঙ্কার। আগন্তুকেরা হতভম্ভ। এ কিরে বাবা! এমন বিচিত্র অভ্যর্থনার জন্যে তারা আদৌ প্রস্তুত ছিল না। মাথার ওপর বন বন লাঠি ঘুরছে আর হুঙ্কার ছাড়ছে বিকট কণ্ঠে—দ্বারোয়ানদের এহেন চেহারা দেখে সভাপণ্ডিতেরা যৎ-পর-নাস্তি নার্ভাস।—গান্ধীবাবু এঁয়ারা এমন করতেছে কেনগো? কিন্তু কে কার কথায় কান দেয় তখন।

এরপর বোঁদে মিস্তিরের রঙ্গভূমিতে আগমন। সেকি ভয়ঙ্কর রুদ্র মূর্তি তার। মাদ্রাজী প্রযোজকরাও হতভম্ব। ব্যাপার-স্যাপার দেখে তাদের চোখও ছানাবড়া। হঠাৎ বোঁদে মিস্তিরের হুঙ্কার—হাজামলোগ্, আভি নিকাল আও।

বলার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল ডজন খানেক নরসুন্দর ঝটপট বেরিয়ে আসছে একটা ঘর থেকে। প্রত্যেকের হাতে একটা করে ধারালো ক্ষুর আর জলভরা বালতি। হবু পণ্ডিতের দল বিষম নার্ভাস। হঠাৎ নরসুন্দর কেন?

বোঁদে মিস্তিরের কঠিন নির্দেশ শোনা গেল—কামিয়ে দাও।

যাঁহা বলা নরসুন্দরের দল সোৎসাহে এবং ভীম বিক্রমে তাদের কাজে লেগে পড়ল। একজন করে ধরে মাথায় জল চাপড়ে দেয় তারপর চকচকে ক্ষুর দিয়ে নিমেষে মাথা চেঁচে সাফ করে দেয়। জেগে থাকে শুধু একখণ্ড টিকি।

দেখে পণ্ডিতদের মধ্যে মড়াকান্না পড়ে যায়—বাবাগো মাগো করুণ স্বরে অকুস্থল মুখরিত হয়ে ওঠে। পালাবার চেষ্টা বৃথা। ওদিকে রুদ্র দ্বারোয়ানের দল লাঠি হাতে থেকে থেকে রণহুঙ্কার ছাড়ছে। পালায় কার সাধ্যি। হাতে পায় ধরাধরি—চাই না গো—গামছা, টাকা ভুরিভোজ কিছুই চাই না, ছেড়ে দাও গো।

একদিকে শক ট্রিটমেণ্ট অন্যদিকে সাফ ট্রিটমেণ্ট—দুয়ের মাঝে পড়ে সভাপণ্ডিতের দলের ছুটোছুটি। ওপাশে বোঁদের আস্ফালন—মাথায় উকুন কিলবিল করছে, ব্যাটাদের চেঁচে দিয়ে কোথায় উপ্‌গার করছি, কোথায় খুশী হবে, তা না কেঁদেকেটেই মলো···অ্যাই চোপরাও মুখ্যুর দল···

একটা করে ন্যাড়া হয় প্লাস টিকি, নরসুন্দর তাকে ছাড়লে ধরে মেক-আপম্যান। সে মুখে থাবড়া মেরে মেরে রং মাখিয়ে ছাড়তেই ধরে ফেলে কস্টু্যমম্যান—সে শট্ করে সভাপণ্ডিতের পোষাক পরিয়ে দেয়। ফ্লোরে লাইট রেডি হয়ে গেছে। পরিচালক একে একে সব দেখে গান্ধীবাবুর ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন—তাড়া দিয়ে গেছেন—এট্টু হাত চালিয়ে কাজটা শেষ করে দিন। আমি শট নেবার জন্যে তৈরী।

সেদিন বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ গান্ধীবাবুর নেতৃত্বে তিনশো দিশী সভাপণ্ডিত প্রোসেশান করে হাজির হল তেলেগু ছবির বিরাট রাজদরবারের সেটে। পণ্ডিতদের জুল্‌জুল্ চাউনি। তাদের মুখে আর ভাষা নেই। মাদ্রাজী ডায়লাগ শুনে যেটুকু আশা ছিল তাদের মনে তাও অন্তর্হিত। বেলা একটায়, অবাক কাণ্ড, ক্লাপস্টিক পড়ল যথা-রীতি। এখন যদি কোনদিন টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে যান একবার স্মরণ করবেন গান্ধীবাবুকে। বেশীরভাগ সময় ওঁর ওখানেই কাটে। যত্ন করে পাশে বসিয়ে বিগত দশকের চলচ্চিত্র নির্মাণ পর্বের যেসব গল্প উনি শোনাবেন তা নিশ্চিতই আপনার স্মৃতিতে অমর হয়ে থাকবে। গান্ধীবাবু প্রসঙ্গে লিখতে লিখতে আর একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে। শুনুন। আমার নিজেরই অভিজ্ঞতা সেটা। ওই ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে 'রক্ততিলক' ছবি উঠছে। বিশ্বজিৎ বোম্বে থেকে এসে আমায় বলে গেলেন,

ভাই ডাকাতের যে দলটা সিলেকশান করবে সেটা বেশ দেখে শুনেই করো।

ছবিতে একটা চরিত্র ছিল—শ্যামলাল, নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ হতে হবে তাকে, রীতিমত পেলওয়ানী, মাথা অবশ্যই ন্যাড়া হবে। আর সেই বিশেষ চরিত্র খুঁজে বের করতে আমরা কজন হিমশিম খেয়ে গেলাম। কলকাতায় যত পালোয়ান আছে, মোটামুটি সবাইকে দেখা হল, কিন্তু কেউ-ই আর ন্যাড়া হতে চায় না। যারা চাইল তারা আবার অ্যাক্টিং করতে পারে না। আমরা রোজই স্টুডিওতে পালোয়ানদের ইণ্টারভিউ নিই, কিন্তু কিছুতেই আর পছন্দ হয় না।

একদিন স্টুডিওতে গিয়ে দেখি জনা-আষ্টেক পালোয়ান আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। সবাই বাঙালী। প্রত্যেকেরই বলিষ্ঠ চেহারা। ছাতি সাধারণ চল্লিশ, ফোলালে চুয়াল্লিশ। সবাইকে প্রথমে চা কফি দিয়ে আপ্যায়িত করা হল। তারপর ধীরে সুস্থে যেই বলা—আচ্ছা মশাই আপনারা ন্যাড়া হতে পারবেন তো?

—অ্যাঁ, ন্যাড়া হতে হবে? সর্বনাশ—

বললাম—চরিত্রের ওটাই হবে বিশেষত্ব। আর শুধু একবার ন্যাড়া হলে চলবে না, ছয় মাস ধরে ছবির কাজ চলবে, ওই ছয় মাসই ন্যাড়া থাকতে হবে! পারবেন?

শুনে ছয়জন উৎসাহী পালোয়ান-অভিনেতা তৎক্ষণাৎ ভীমবেগে সটকে পড়লেন। বসে রইলেন মাত্র দুজন। তাঁরা তখনও আশা ছাড়েননি। একজন তো সাজেস্ট করলেন—আচ্ছা স্যার যদি অভয় দেন তো একটা কথা বলি—

—বলুন।

পালোয়ান ঢোক গিলে বললেন—ইয়ে, বাজারে তো আজকাল কতরকম আর্টিফিশিয়েল জিনিষ বেরিয়েছে—টাক বা ন্যাড়া হওয়া যায়, যদি সেদিক দিয়ে ব্যাপারটা—

বলা হল—দেখুন আর্টিফিশিয়েল ব্যাপারটায় আমাদের আপত্তি আছে। আর তাছাড়া ক্যামেরার লেন্সের সামনে তো কোন জারিজুরি

খাটবে না, ধরা পড়ে যাবে। না না, কম্পালসারি ন্যাড়া হতে হবে মশাই।

এতে ওঁরা যা বোঝার বুঝলেন। এবং মানে মানে সরে পড়লেন।

অতএব চলেছে খোঁজাখুঁজি। পছন্দও হয় কাউকে কাউকে। কিন্তু ন্যাড়া প্রসঙ্গ এলেই হুদ্দাড় পালিয়ে যায় মানুষ। সে-এক যন্ত্রণা। আমরা ভাবি—দেশের হলো কি, অ্যাঁ? সামান্য ন্যাড়া অথচ তাও হতে চায় না কেউ! অথচ বোম্বেতে দেখ—শেঠি, হলিউডে দেখ—ইয়ুল ব্রাইনার ন্যাড়া হয়ে কেমন বাজার মাৎ করছে। ইদানীং জুলফি-ই ডোবাচ্ছে সবাইকে। মাথায় চুলের নামে তেমন খোঁজ নেই অথচ জুলফি একটা ইয়াব্বড় আছেই। কি করে থাকে কে জানে!

আমাদের তখন মরিয়া অবস্থা। শুটিং-এর দিন আগতপ্রায়, অথচ শ্যামলালের চরিত্রে আর লোক খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশ্বজিৎ বোম্বে থেকে ট্র্যাঙ্ক ফোনে জানালেন—তাহলে কি শেঠিকে নিয়ে যাব? তাড়াতাড়ি তোমরা কনফার্ম করো—

আমরা বলি—আর দু একটা দিন সবুর করো। ফাইন্যাল জানাচ্ছি।

হঠাৎ এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। দীনেন গুপ্তর 'মর্জিনা আবদাল্লা' ছবিতে অভিনয় করতে এসেছিল। দারুণ চেহারা। প্রোডাকশন-ম্যানেজার কমলকে বললাম—নজর রাখো, যেন পালিয়ে না যায়।

ভদ্রলোকের নাম দাশু নাগ। ওই তো বিশাল ব্যায়ামবলিষ্ঠ চেহারা কিন্তু এমন নিরীহ মানুষ আমি ইতিপূর্বে কখনো দেখিনি। হাওড়ার কোন এক বাজারে নিজের একটি দোকান আছে। দশকর্মা ভাণ্ডার ধরনের সখের মধ্যে মাছধরা আর যাত্রা করে বেড়ানো। বাঁধা ভীম। কখনো-সখনো ভাবনা কাজী। মাইথোলজিক্যাল যাত্রায় বেশ নাম-ডাক আছে। দাশুবাবুকে ছবির প্রস্তাব দিতে ভদ্রলোক তো লাফিয়ে উঠলেন—নিশ্চয় নিশ্চয় করব। বায়োস্কোপে অভিনয় করতেই তো এসেছি সখী—

—পারবেন ?

—নিশ্চিত।

কমল প্রায় বলেই ফেলেছিল। আমি তাড়াতাড়ি ইসারা করে মানা করলাম। শুধু বললাম—ঠিক আছে। কাল দশটায় এখানে আপনার শুটিং, চলে আসবেন।

দাশু নাগ হৃষ্টমনে চলে গেলেন। কমলকে বললাম—কিচ্ছু না, একজন নরসুন্দর ডেকে রেখো। দেখা যাক কি হয়।

—যদি রাজী না হয় ?

—হবে। কায়দা করে রাজী করাতে হবে। ছবির শুটিং তো আর আপসেট করা যায় না। বিশ্বজিৎ আজ ইভনিং ফ্লাইটে আসছে বোম্বে থেকে।

পরদিন সকালে দাশু নাগ স্টুডিওতে রিপোর্ট করলেন।

বললাম—এঃ, এত তাড়াতাড়ি এলেন ? শুনুন, একটা কাজ করতে হবে।

—বলুন।

—ইয়ে, ঝট করে ন্যাড়া হতে পারবেন ?

বিহ্বল দৃষ্টি দাশু নাগের।

—কেন বলুন তো ? আমি তো বাড়িতে কিছু বলেও আসিনি—

—তাতে কি হয়েছে। ব্যাটাছেলের অত বলাবলি কিসের ? আমরা পার্টটা একটু বাড়াব ভাবছি। ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট ক্যারেকটার তো, ন্যাড়া হলে চরিত্রটা দারুণ খুলবে—

—অ।

—চিন্তা করবেন না, এ বাবদ পয়সাও একটু বেশী দেওয়া হবে। যান, ন্যাড়া হয়ে আসুন—

—কিন্তু…

—কোন কিন্তু নয় মশাই। ফিল্মে ওরকম এট্টু-আট্টু করতেই হয়। কমল, এঁকে নিয়ে যাও ভাই। ন্যাড়া করে কস্টুম পরিয়ে সোজা ফ্লোরে নিয়ে চলে এস।

ভদ্রলোক কিছু বলবার আগেই ক্ষুর তার কাজ আরম্ভ করে দিল,

নিমেষের মধ্যে মাথা বিলকুল সাফ। দাশু নাগের হতভম্ভ ভাবটা তখনও কাটেনি। বিড় বিড় করে কি-সব বকতে বকতে কিছুক্ষণ পর ফ্লোরে এসে হাজির।

—বাঃ, চমৎকার দেখাচ্ছে। ওহে, কে আছ, ওর হাতে একটা বন্দুক ধরিয়ে দাও।

পরদিন সকালে ভদ্রলোক উত্তেজিত-ভাবে হাজির।

—এঃ, আমার যা সর্বনাশ করলেন আপনারা···

ভদ্রলোক সেদিন রাত্রে বাড়ী ফিরেছিলেন যেমন রোজ ফেরেন। দরজা খুলে ওঁর স্ত্রী ওঁকে দেখে প্রথমে অবাক, পরক্ষণে হাউমাউ কান্নাকাটি—ওগো তোমার একি দশা হলো। ভদ্রলোক যত বোঝান, আরে এটা ছবির জন্যে, স্ত্রীর মড়াকান্না তাতে আরও বাড়ে—ছবি-টবি মিথ্যে কথা, তুমি নিশ্চয় কিছু করেছ, তাই তোমার মাথা কামিয়ে দিয়েচে, ওগো আমার কি হলো গো···। হট্টগোলে ঘুমন্ত ছেলেমেয়েরা জেগে উঠেছিল। তারা বাবাকে ন্যাড়া দেখে কি উল্লাস—এমা, বাবা ন্যাড়া, বাবা ন্যাড়া। ধমক দিলেও শোনে না। পাড়াপড়শীরাও ছুটে এসেছিল। দাশু নাগকে দেখে তাদেরও নানা সন্দেহ।

এই তো গেল। মাসখানেক পর দাশু নাগ একদিন স্টুডিওতে এসে একটা গল্প বললেন: যাচ্ছিলাম কলেজ স্ট্রীট দিয়ে। ন্যাড়া মাথা। হঠাৎ মাসীমার সঙ্গে দেখা। তিনি আমায় দেখে প্রথমে ভ্যাঁক করে কেঁদে একসা। বললেন, হ্যাঁরে দিদি যে আমায় তার তিন ভরির বিছেহারটা দিয়ে যাবে বলেছিল. সেটা রেখে দিয়েছিস তো? যত বলি না না, মাসীমা তত বলেন, ওরে দিদি আমায় বড় ভালবাসতো রে, বিছেহারটা আমায় দেবে তখুনি বলেছিল। কেন যে পোড়া কপাল তখন নিলাম না, ওরে তোর মা আমায় দেবে বলেছিল রে, ও দাশু······

ফিল্মের অনাদি বাড়ুয্যেকে চেনেন?

পেশায় ফার্স্টক্লাস প্রোডাকশন ম্যানেজার; এই রকম হাড় জ্বালানো তিকড়মবাজ মানুষ আমি ফিল্ম লাইনে দ্বিতীয়টি দেখিনি। অথচ মুখো-মুখি সাক্ষাৎ হলে দেখুন, আহা কত অমায়িক, ধীর-স্থির, শান্তশিষ্ট লোক, যেন সাত চড়েও রা নেই। মুখে একফালি মধুর হাসি সর্বদাই ঝিলিক হানছে। কোন বিরক্তি নেই, ব্যাজার নেই।

অনাদি বাঁড়ুয্যেকে তাই বলে ভাববেন না—তেলেভাজা; ওর মত রসিক মানুষ আজকাল পাওয়াই দুষ্কর। প্রবল সেন্স অফ হিউমার। আর ওটাই ওর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। একদিন হঠাৎ-ই আমায় বলল, আমি এককালে বিরাট একজন মস্তান ছিলাম—

আমি অবাক।—নাকি?

—আবার নাকি কি? আলবৎ ছিলাম। যৌবনে এক মস্তানি ছাড়া আর যে কিছুই করতাম না। শোভাবাজারে এককালে আমার যে বিরাট নামডাক ছিল—সে খবর রাখো?

বলে আমার মন্তব্যের অপেক্ষা না করেই বলল—হুঁ, সাংবাদিকতা কর অথচ এই আসল খবরটাই রাখো না। বলব গল্পটা? শুনবে?

আমি হাঁ। অনাদি মস্তান? এটা ভাবতেই আমার তখন ইয়ে মানে—। কিন্তু ততক্ষণে অনাদি ধরে ফেলেছে, নাছোড়বান্দা। অনাদি বলবেই। আমার ক্ষমতা নেই তাকে থামাবার…।

—বুঝলে, ঝোঁকটা গোড়াগুড়ি ওই দিকেই ছিল। মস্তান হিসাবে পাড়ায় আমার তখন বেশ নাম-ডাক হয়ে গেছে। লোকে বেশ সমীহ করে কথা বলে। মুখের বাক্যটি খসালেই বেশ চা সিগ্রেট পানটা মাগনায় পাওয়া যায়। বেশ একটা ঘোরের মধ্যে দিনগুলো কাটছে আমার। আসল কাজের মধ্যে রোজ সন্ধ্যের ঝোঁকে পাড়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে এট্টু-আট্টু 'রেলা' করি, ব্যাস, তাতেই ভাস কাজ হয়, কম্মো হয়। অথচ এই আমি বাড়ি ঢুকলে আমার ভিন্ন চেহারা। চাকরি-বাকরি বা পড়াশুনো কিছুই করি না। থালা থালা ভাত ওড়াই আর নিঃশব্দে গালমন্দ হজম করি।—ছি ছি ছি, ভদ্রঘরের, বাউনের ঘরের ছেলে, তুই শেষ পর্যন্ত

গুণ্ডো-মস্তান হলি ? দূর হয়ে যা। একটা পয়সা রোজগারের ক্ষমতা নেই,‐ দু বেলা পিণ্ডি গিলতে তোর লজ্জা করে না ?

বাস্তবিক লজ্জা করে। কিন্তু কি করি। চাকরী চাইলে পাওয়া যায় না। একদিন এক বন্ধুকে বললাম—হ্যাঁরে, একটা চাকরীবাকরী জোগাড় করে দে তো ভাই। বাড়িতে যে আর টেঁকা যাচ্ছে না, উঠতে-বসতে যাচ্ছেতাই গালমন্দ—

বন্ধু হঠাৎ বললে—করবি ?

—আলবাৎ করব।

—তাহলে জমিদারের বড় তরফের চাকরীটা কর। আমি কথাবার্তা বলে দিচ্ছি—

—ওখানে আবার কিসের চাকরী ?

বন্ধু বললে—নামে বাজার সরকারের, আসলে চাকরীটা একটু অন্য ধরনের। জমিদারের দু ভাইয়ের মধ্যে মামলা চলছে। হাইকোর্টে সম্পত্তির পার্টিশানের মোকদ্দমা। ফলে বুঝতেই পারছিস—শত্রুতাটা শুধু কোর্টের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, বাইরেও চলছে। ছোট ভাইয়ের ভাড়াটে গুণ্ডারা সেদিন বড় তরফের ম্যানেজারকে ধরে ঠেঙিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বড় তরফও অন্যভাবে শোধ তুলেছে। এই-ই চলেছে গত চার-পাঁচ মাস ধরে। বড় তরফ এখনই তাই একজন বিশ্বস্ত লোক খুঁজছে, চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে। বড়-র সঙ্গে কোর্টে যাবে-আসবে, সোজাসুজি বডিগার্ডের চাকরী। মাইনে এখন নগদ একশো টাকা। থাকা-খাওয়া ফ্রী। পরে টাকা বাড়বে।

অনাদি বাঁড়ুয্যে ভেবে দেখল, আপাতত এই যথেষ্ট।

বললে—ঠিক আছে, আমি রাজী। তুই বরং কথা বল—।

চাকরী এক কথায় হয়ে গেল।

বড় এবার এক নজর অনাদি বাঁড়ুয্যেকে দেখে নিয়ে বললেন—বুঝেছো আশা করি ব্যাপারটা ? সওয়ালটা ইজ্জতের।

অনাদি বাঁড়ুয্যে ঘাড় কাৎ করে যথাসম্ভব বিনয়ের সঙ্গে বলল—বুঝেছি স্যার।

বিরাট জমিদার বাড়ি। ভাগ হয়েছে মাঝখানে একটা পাঁচিল দিয়ে। বড় তরফে পড়েছে ঠাকুরদালান। নাটমন্দির। অনাদি সেই নাটমন্দিরেই থাকে। ব্যায়াম-কসরৎ করে। গুনে গুনে ডন-বৈঠক মারে। সকালে পো-টেক ভেজানো ছোলা খায়। আধ সেরটাক কাঁচা দুগ্ধ সাঁটে। দুপুরে বিড়াল ডিঙ্গোতে পারে না এমন দু-থালা ঝোলভাত ওড়ায় আর ঠাকুর দালানের শীতল পাথরের মেঝেয় বডি ফেলে ভোঁস ভোঁস শব্দে দিবানিদ্রা যায়। তারপর বিকালে উঠে একটু ঠাণ্ডা শরবৎ হয়—আহারে, এবং তারপর একটু ডিউটী।—সেটি কি ব্যাপার? কিছুই না ছোট তরফের দিকে মুখ করে বারকয়েক হুঙ্কার ছাড়তে হয়—সাবধান, সা-ব-ধা-ন, বেশী ইয়ে করলে স্রেফ ফেড়ে ফেলব। কিচক বধ করব রে পাষণ্ডের দল। এই সব ডায়লাগ আর কি।

বড় তরফ বেশ খুশি।—হ্যাঃ, অ্যাদ্দিনে একটা কাজের মত মানুষ পাওয়া গেছে বটে!

অনাদি বাঁড়ুয্যে একদিন বড়র সঙ্গে কোর্টে বেরোচ্ছে, পথে হঠাৎ বিনয়ের অবতার হয়ে বলল— স্যার এট্টা কথা বলব?

—বল।

—আমায় ছেড়ে দিন স্যার।

কেন? বড় অবাক। তোমার কি এখানে কোন অসুবিধা হচ্ছে?

—আজ্ঞে না, বাস্তবিক কোন অসুবিধা হচ্ছে না, তবে জানেন তো স্যার, মাঝে-মধ্যে একটু র‍্যালা-ফ্যালা না দিতে পারলে মন স্থির থাকে না। অভ্যেসটা বড় খারাপ করে ফেলেছি। তা আপনাদের যা দেখছি, গণ্ডগোলের কোন লক্ষণই নেই। আমায় বরং ছেড়ে দিন। জলের মাছ জলে ফিরে যাই—

শুনে গোঁফের ফাঁকে মুচকি মুচকি হাসলেন বড়। অ, এই ব্যাপার? এক হাত লড়তে পারছ না বলে দুঃখু? ঠিক আছে। সে ব্যবস্থা হচ্ছে।

অনাদি বাঁড়ুয্যে উৎসাহের সঙ্গে বলল—হ্যাঁ, যাহোক এট্টা ব্যবস্থা

করুন তো। শরীরের মর্চেটা একবার ছাড়িয়ে নিই। খেয়ে আর ঘুমিয়ে পারছি না স্যার—

বড় তরফ মৃদু মন্দ হাসতে লাগলেন।

তারপর চব্বিশ ঘণ্টাও কাটেনি, অনাদি বাঁড়ুয্যে যেমন নিত্যকর্ম করে, ডন-বৈঠক সেরে, ছোট-তরফের উদ্দেশ্যে হু-হুঙ্কার ছেড়ে সবে স্থির হয়ে ঠাকুর দালানে বসেছে। একটা সিগারেট ধরাব ধরাব ভাবখানা, অথবা হাতে দুধের গ্লাসটি নেব নেব অবস্থা, হেনকালে কোথায় ছিল তারা— হঠাৎ রে-রে শব্দে তেড়ে এসে পড়ল উঠোনে।

অনাদি বাঁড়ুয্যে তো অবাক—কিঃ রে বাবা, এঁয়াবা আবার কোত্থেকে এলেন গোছেব ভাবখানা তার। ওমা, লোকগুলো তাকে এসেই প্রশ্ন করল—তুম্ অনাদি হ্যায় ?

—হ্যাঁ, হ্যায় তো, কিন্তু কেন ?

আব কেন—বুঝলে ভাইসকল, কথা নেই বার্তা নেই, ওই ছয়জন মিলে আমায় পটাপট ঠ্যাঙ্গাতে শুরু কবে দিল। উঃ, সে কি ধোলাই। কল্পনা করতে এখন আমার গা শির শিব করে। উল্টে পাল্টে বসিয়ে শুইয়ে— বাপস, এত কিসিমের যে ধোলাই হয়, আমার ধারণাই ছিল না। ব্যাটারা বাক্য বোঝে না। যত বোঝাই আরে এটা রং নাম্বার, শোনেই না। ক্ষ্যামা চাইলাম, তাও দেয় না।

তারপর ঠ্যাঙ্গাতে ঠ্যাঙ্গাতে যখন আমার মুখে গ্যাঁজলা ওঠার দাখিল, তখন আমায় ছেড়ে দিয়ে ওই শুকর-শাবকের দল পোঁ পোঁ করে হাওয়া হয়ে গেল। উহঃ।

আমার তখন এখন তখন অবস্থা। দিন দুয়েক তো জ্বরের ঘোরেই পড়ে রইলাম। ডাক্তার এসে ঘন ঘন ইঞ্জেকশন করে তবে এট্টু চাঙ্গা করে তুললেন। শুনলাম, বড় তরফ দৈনিক এসে আমায় দেখে গেছেন এবং মুচকি মুচকি হেসেছেন।

তারপর পায়ে একটু জোর পেতে, একদিন ম্যানেজারবাবুকে বললাম —দাদা, একটু ছুটি দেবেন ?

—ছুটি? কেন?

—না মায়ের জন্যে মনটা কেমন কেমন করছে, একটু দেখা করে আসতাম—

—তা যাও।

ব্যাস, এরপর আর কেউ থাকে ও-পাড়ায়? চান্স পেতেই টেনে দে হাওয়া। কুমোরটুলী থেকে শটকে এখন এই বালীগঞ্জেই আমি পার্মানেন্ট।

আমি বললাম—তা এই গল্প নিয়ে আমি কি করব?

অনাদি বাঁড়ুয্যে অবাক হয়ে বললে—কেন? কাহিনী লিখবে। ছাপতে দেবে।

আমি তার হাতের বাইসেপের দিকে চেয়ে ভয়ে ভয়ে বললাম, তথাস্তু।

আমাদের কলকাতার ফিল্ম লাইনের মানুষজন বলতে সবই তো গোনাগুনতি; দিনে একবার টালীগঞ্জ পাড়ায় পা দিলেই সকলের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা-সাক্ষাৎ হয়ে যায়, কে কি করছে আর না-করছে—সব খবরই টাটকা পাওয়া যায়। আগে আগে একটা রেওয়াজ চালু ছিল, পরস্পরের দেখা-সাক্ষাৎ হলে পদমর্যাদা অনুসারে নমস্কার বা স্যালুট ঠোকা হত, ইদানীং তা আর বড় চোখে পড়ে না। ব্যাপারটা মধ্যযুগীয় বলে পরিত্যক্ত হয়েছে অনুমান করি।

একদিন, আমার বেশ মনে আছে, টালীগঞ্জ ট্রাম ডিপোয় দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল উল্টো দিকের ফুটপাতে আমাদের বলাইদা মানে তপন সিংহ মশায়ের প্রধান সহকর্মী—পরিচালক বলাই সেন একটা ট্যাকসি ধরে রাসবিহারীর দিকে যাবার উদ্যোগ করছেন। আমি এক ছুটে গিয়ে সেই চলন্ত ট্যাকসিতেই পড়িমরি করে উঠে পড়লাম। বলাইদা অবাক। আমি অপ্রস্তুত ভাবটা কাটাবার জন্যে তাড়াতাড়ি বললাম—সরি বলাইদা, অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি। অথচ ট্রাম বাস কিছুই নেই, তাই আর কি—

বলাইদা শুধু হাসলেন। কিছু বললেন না। তারপর পাশের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন, নীরবে।

এখন ব্যাপারটা এমন বিচ্ছিরিভাবে আমিই ঘটিয়ে বসেছি যে নিজেরই খুব লজ্জা করছিল। ছুট করে দৌড়ে এসে এইভাবে প্রায় চলন্ত ট্যাকসিতে ওঠা—রীতিমত ছেলেমানুষী। তার ওপর বলাইদার নীরবতায় আরও অস্বস্তি হচ্ছিল। তাই আর না ঘাঁটিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যে রাসবিহারীর মোড় এসে গেল।

আমি ট্যাকসি ড্রাইভারকে বললাম, ভাই, বাঁ-দিক করে একটুখানি দাঁড়ান তো, আমি নামব—

গাড়ী দাঁড়াতে আমি দ্রুত নেমে বললাম—হেঁ হেঁ, আপনাকে ট্রাবল দিলাম বলাইদা, কিছু মনে করবেন না—

আশ্চর্য, এবারও বলাইদা নীরব মুচকি হেসে মুখটি ঘুরিয়ে নিলেন। ট্যাকসি বেরিয়ে গেল। এঃ, তখন নিজের এত খারাপ লাগছিল যে কি বলব।

তারপর সন্ধ্যের ঝোঁকে ঝোঁকে আমি রাসবিহারীর আড্ডায় মজুদ। এটা অ্যাবসিলিউট আমাদের ফিল্মের লোকেদের আড্ডা। সেদিন হঠাৎ বলাইদা এসে হাজির। ওঁকে দেখে সবাই খুব হৈ-চৈ করে কিছুক্ষণের মধ্যে ওঁর পকেট খালি করে দিল। ক্যামেরাম্যান মণীশ দাশগুপ্ত অন্যকে টুপি পরাতে বিশেষ পারদর্শী। ও যে ছবিতেই কাজ করে—চেষ্টা করে সে-ছবির নায়িকার সঙ্গে প্রেমে পড়তে। পড়েও ছিল নাকি কয়েকবার। এখন সে-সব ব্যাপার রেফার করলে শুধু হাসে। বলাইদা সেদিন কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করে বললেন—মণীশ, মানুষকে চোট দেওয়াটা তোর স্বভাবে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এটা বদলা—

তা মণীশের বক্তব্য, যে-সব হিরোইন ওঁর বুকে চোট দিয়ে গেছে, বলাই যেন এই জ্ঞানটা তাদেরও একটু দেয়—

এইসব নিয়ে বেশ মস্করা হচ্ছে, বলাইদা তোফা মেজাজে সেদিন। অথচ বিকেলে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করলেন না—কি ব্যাপার ভাই?

মণীশকে সব খুলে বলতে সে একচোট হেসে নিয়ে বললে—হয়েছে। তুই আজ ভিকটিম হয়েছিস—

—কিসের ভিকটিম?

—টুইন। আরে ট্যাকসির ও ব-াই না, কানাই। ওরা যমজ ভাই। তুই জানতিস না বুঝি?

আমার তো সেই আকাশ থেকে পড়ার অবস্থা। তখন বলাইদা সহাস্যে বললেন—কানাই তাই ইচ্ছে করেই কথা বলে নি। বললে তুমি পাছে আরও লজ্জা পাও, সেটা বিবেচনা করেই আর কি—

এছাড়া আরও দু'জোড়া যমজ আছে আমাদের ফিল্মে। ক্যামেরাম্যান রেজা আর তার ভাই। সে ভদ্রলোকের নাম আমার এক্ষুনি স্মরণ হচ্ছে না। ও দুজনকে নিয়ে আমাদের এই সেদিন পর্যন্তও গণ্ডগোল হয়েছে। এখন দেখছি ওরা বেশ কেয়ারফুল, রেজার ভাই একটি পুরুষ্ট গোঁফ রেখে সম্প্রতি আমাদের যেন বাঁচিয়েছে। আর এক জোড়া হচ্ছে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীর কর্মী বীরেন গুহ বিশ্বাস ও তার ভাই। বীরেনদের কেসটা আরও জটিল, কারণ ওরা থাকে টালীগঞ্জের খোদ স্টুডিও পাড়াতেই। ফলে ওদের নিয়ে প্রায়ই আমাদের 'কমেডি অফ এরার'-এ ভুগতে হয়।

একদিন ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে 'মা' নামের একটি ছবির শুটিং চলছে। পরিচালক চিত্ত বসু। হাসপাতালের সেট। তা সেটের রিকুইজিশান মিলিয়ে নিতে গিয়ে সহকারী পরিচালক হঠাৎ আবিষ্কার করল, আসল জিনিসটাই নেই। অর্থাৎ কম্বল। রোগী কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকবে, ডাক্তার এসে তাকে পরীক্ষা-টরীক্ষা করবেন—দৃশ্যটা ছিল মোটামুটি এই রকম।

সহকারী পরিচালক সন্ত্রস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি প্রোডাকশন ম্যানেজার কালুকে গিয়ে ধরল—কি ব্যাপার কালু, কম্বল আনো নি? ওটা না পেলে যে শট-ই আটকে যাবে—

কালু সর্বদাই নিস্পৃহ। একটা উদাসীন ভঙ্গী করে বলল—আনা হয় নি তো কি হয়েছে? এক্ষুনি এনে দিচ্ছি।

—তাই দাও। এর পরের শট হচ্ছে কম্বলের। কম্বল না পেলে চিত্তদা কিন্তু চটে ফায়ার হয়ে যাবেন—

কালু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী করে একটা সাইকেল চেপে গেল পরিচিত এক ভদ্রলোকের বাড়ী। কম্বল আছে? তাঁরা বললেন, না নেই। কালু বলল, বেশ ভাল কথা। তারপর গেল বীরেন গুহ বিশ্বাসদের বাড়ী। দেখে, বীরেন স্বয়ং বারান্দায় বিছানা করে একটা কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে আছে। তার পরিষ্কার ম্যালেরিয়া হয়েছে। কম্বলটি কালুর খুব পছন্দ হলো।

সাইকেল থেকে নেমে কালু আর কোন কথা নয়, ধাঁ করে কম্বলটি টেনে নিয়ে দে-চম্পট। রোগী হতভম্ভ। এভাবে কেউ কারো গায়ের কম্বল নিয়ে পালায়, কল্পনাতেও আসে না।

মুহূর্তে খবরটা রটে গেল। কালু রোগীর গায়ের কম্বল উপড়ে নিয়ে সটকেছে, দেখো শালা কোন স্টুডিওতে কম্মো করছে।

কালু ততক্ষণে কম্বল সহ স্টুডিওতে পৌঁছেছে। আর কম্বলও তৎক্ষণাৎ আর্টিষ্টের গায়ে চড়ে গেছে, পর পর শট-ও তোলা হয়ে গেছে কয়েকটা। এই রকম একটা সময় বীরেন নিজে একটা সাইকেলে চেপে স্টুডিওতে এসে হাজির। রাগে অগ্নিশর্মা চেহারা। কালুর এহেন বেয়াদপীর শিক্ষা আজ এট্টা দিতেই হবে।

বীরেনকে সাইকেল চেপে স্টুডিওয় ঢুকতে দেখে কালু, যার তৎক্ষণাৎ সটকে পড়ারই কথা, সে বরং থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বীরেন সাইকেল থেকে নেমে কালুকে বাক্য দেবে বলে যেই তৈরী হয়েছে, কালু তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—তুমি জ্বরে কোঁ কোঁ করছিলে না?

বীরেন বলল—সেটা আমি না—

কালুর বক্তব্য—কেন চেপে যাচ্ছ গুরু, তুমি কম্বল চাপা দিয়ে কাঁপছ দেখেই তো কম্বল নিয়ে হাওয়া দিলাম, জানি ইচ্ছে থাকলেও তুমি আমায় ধরতে পারবে না, কিন্তু সেই তুমি কি করে উঠে এলে? তাজ্জব ব্যাপার ভাই—

বীরেন বললে, ওরে শালা, সে আমি নই। সে-সব পরে হবে, এখন কম্বলটা দাও দিকি—

কালু তত উৎসাহ পায়—নাহ্ বীরেন, কম্বল এখন আর্টিস্টের কন্টিনিউটী হয়ে গেছে, কাল পাবে। সঙ্গে কম্বলের ন্যায্য ভাড়াও পাবে। সে সব অলরাইট, কিন্তু এটা তুমি কি করলে, সামান্য ভাড়ার লোভে রোগশয্যা ছেড়ে তুমি সাইকেল চেপে চলে এলে? তুমি দেখছি আচ্ছা পাষণ্ড—

কথা শুনে বীরেনের সে কি ক্রোধ—শালা এখন তুমি আমায় জ্ঞান দিচ্ছ? আমি পাষণ্ড? লজ্জা করে না একটা রোগীর গা থেকে কম্বল কেড়ে আনতে?

—আহা, বাস্তবিক তো তুমি রোগী নও।

—আমি না হতে পারি—, ওটা আমার ভাই—

কালু ট্যাবা। তবুও সন্দিগ্ধ কণ্ঠে—যাঃ, আবারো গুল ঝাড়ছ।

বীরেনের মাথায় তখন যেন খুনীর রক্ত উঠে গেছে—কালু, মুখ সামলে, ও আমার যমজ ভাই—

কালু গতিক খারাপ দেখে সে-যাত্রা রণে ভঙ্গ দিয়ে বাঁচে আর কি। পরে জেনেছে, বীরেনরা বাস্তবিকই যমজ, কম্বলটা সে বীরেনের ভাইয়ের গা থেকেই টেনেছিল। আরে ছিঃ!

এই হচ্ছে প্রোডাকশন কন্ট্রোলার কালু বোস। এই রকম উপস্থিত খচরামো বুদ্ধি, ফিচলেমো কাণ্ড-কারখানা এক কালুর ক্ষেত্রে যা দেখেছি, তা আজীবন কাল আমি ভুলতে পারব না।

একটা মজার ঘটনা উল্লেখ করি এই প্রসঙ্গে।

এ রকম হয় না, দুজনেই প্রাণের বন্ধু অথচ কথায় কথায় আঁচকা-আঁচকি লেগে আছে। এ সুযোগ পেলে ওকে তৎক্ষণাৎ এঁটে দিচ্ছে আবার ও সুযোগ পেলে একে এঁটে দিচ্ছে। রেষারেষি আর ফ্রেণ্ডশিপ ওদের যুগপৎ লেগেই আছে। একজন হচ্ছে কালু আর একজন বরেন। দুজনেই ফিল্মের কর্মী, কালু প্রোডাকশনের, বরেন সম্পাদনার। একদিন কি একটা সামান্য কথা নিয়ে দুজনের মধ্যে তুমুল একচোট হয়ে গেল। কালু বললে—বরেন, তোকে একদিন এমন জব্দ করব যে আর আমার সঙ্গে লাগবি না।

—যা যাঃ, কত হাতি গেল তল···বরেনের পাল্টা ডায়লাগ।

তারপর দিন যায়, হঠাৎ পরিচালক একদিন কালুকে ডেকে বললেন, ওহে কালু, চ্যাটার্জীবাবুকে খবর দাও, ছবির রিলিজ কনফার্মড হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি এডিটিং করে ছবিটা রেডি করে ফেলতে হবে—

কালু ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে গেল। তারপর শুরু হল পুরোদমে কাজ। বরেন আবার সে-ছবির সহকারী সম্পাদক। নেগেটিভ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রধানতঃ তার। কালু জ্ঞান দেয়, মন দিয়ে কাজকম্মো করিস বরেন, তুই তো আবার তালকানা—

বরেন তখন ওকে বৃহৎ বৃহৎ বাক্য দেয়, কালু খিক খিক হেসে কেটে পড়ে। আসলে বরেনকে রাগিয়ে যেটুকু সুখ!

এদিকে ছবির মুক্তির দিন দ্রুত ঘনিয়ে আসছে। অথচ হাতে তখনও প্রচুর কাজ, ছবি রেডি করতে হলে আরও দ্রুতগতিতে কাজ করতে হবে। নইলে নির্ধারিত দিনে ছবি রিলিজ করা যাবে না। ফলে উদ্বিগ্ন প্রযোজক সবাইকে ডেকে বললেন—না মশাই, আরও স্পীডের দরকার। আপনারা ডে-নাইট কাজ করুন। বাড়তি খরচ যা লাগে আমি দেব, বরং—

পরিচালক বললেন, অগত্যা—

এবার শুরু হল ডে-নাইট শিফট। একটা ছবি রেডি করা—সে তো সোজা ব্যাপার নয়। পরিচালক বরেনকে ডেকে বললেন, কদিন তোমার আর বাড়ি যাওয়া হবে না। কালু খবরটা তোমার বাড়িতে বরং দিয়ে আসুক।

কালু বললে—তাই যাবো না হয়। রাত্রে এখানে বরেনের থাকার কোন অসুবিধে নেই, ও তো আর বিয়ে-থা করে নি—

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় কালু ঠিকানা খুঁজে খুঁজে বরেনের বাড়ি গিয়ে হাজির। কড়া নাড়তেই এক বিধবা মহিলা বেরিয়ে এলেন। কালু দেখেই বুঝল, বরেনের মা।

দরজা-খুলে সামনে একজন অপরিচিত মানুষকে দেখে বরেনের মা অবাক।—কাকে চাই?

মতলব এঁটেই গিয়েছিল কালু। একগাল হেসে বলল—আমার নাম কালু, আমি বরেনের সঙ্গে কাজ করি মাসীমা। বরেন বাড়িতে আছে?

—না তো। বরেন সেই কোন সকালে উঠে স্টুডিওতে গেছে, এখনও ফেরে নি—

কালু যেন কত অবাক।—সে কি? বরেন তো আজ স্টুডিওতে যায় নি। সেই জন্যেই তো আমি ওর খোঁজে এলাম। ওর জন্যে সবাই আমরা বসে আছি।

মা উদ্বিগ্ন হলেন।—কি জানি বাবা, আমায় তো বলে গেল স্টুডিওতে যাচ্ছি—

কালু বলল—দেখুন ওর আক্কেল। ছবি রিলিজ হবে, এখন এইভাবে কেউ ডুব মারে? ওর কাছে আলমারীর চাবি রয়েছে, মালপত্র সবই আলমারীর মধ্যে, ও না গেলে তো কাজকর্ম সব বন্ধ···

মা যেন দায়ে পড়লেন।—বটেই তো। তা ও না ফেরা পর্যন্ত তো কিছুই বুঝতে পারছি নে বাবা—

কালু বিরক্ত মুখে বলল, মাসীমা, ফেরা মাত্র বরেনকে স্টুডিওতে পাঠিয়ে দেবেন। ও যেন এক মুহূর্ত দেরী না করে। বলবেন সবাই আমরা হাত গুটিয়ে বসে আছি।···দেখুন তো কি রকম বে-আক্কেল মানুষ···। এখন চলি মাসীমা, আপনি কিন্তু ওকে ধুলো পায়েই······

রাত ন'টা।

বরেনদের বাড়ির সদরের কড়া নড়ে উঠল।

মা দরজা খুলে দেখেন কালু নামক সেই লোকটি আবার এসেছে।

হতাশ ভঙ্গী করে মা বললেন, না বাবা, খোকা এখনও ফেরেনি—

রাজ্যের দুশ্চিন্তা মুখে কালু বলল, কি কাণ্ড, ছি ছি ছি, আমরা সবাই নিষ্কর্মা বসে আর বরেন এই রকম দ'য়ে ডুবিয়ে দিয়ে······

মা বললেন—আমি এলেই ওকে পাঠিয়ে দেব বাবা—

—তা না হয় দেবেন, কিন্তু কোম্পানীর যে মালিক—তিনি ভীষণ ক্ষেপে গেছেন। চাবি নিয়ে এভাবে গা-ঢাকা দেবার কোন মানে হয়। আজ-বাদে-কাল ছবির রিলিজ, ভদ্রলোকের লাখ লাখ টাকার কারবার, এ তো সেই ইচ্ছে করে লাটে তোলার ব্যবস্থা···কি করি বলুন তো মাসীমা? এবার না সবশুদ্ধ আমাদেরও চাকরী যায়।

মায়ের তো অথৈ জলে পড়া। তিনি আমতা আমতা করে বলেন, কি জানি বাবা, কিছুই তো বুঝতে পারছি নে, তবে বরেন তো আমার এ রকম ছেলে নয়, কখনো তো এ রকম শুনি নি—

—সেই তো হয়েছে বিপদ—কালু তৎক্ষণাৎ পাদপূরণ করে—ভীষণ দায়িত্বজ্ঞান ওর, অ্যাদ্দিন ধরে তো দেখছি ওকে কিন্তু আজ যে হঠাৎ কি হল। আচ্ছা, কোন বন্ধুর বাড়ি-টাড়ী যায় নি তো? গিয়ে হয়ত আড্ডা দিচ্ছে। তাস-ফাস খেলছে।

মা অজ্ঞানতার ভঙ্গি করলেন।

কালু বলল—শনিবার হলেও না হয় একটা কথা ছিল, বুঝতাম যে মাঠে গেছে, কিন্তু আজ তো শুক্করবার—আজ তো কোন রেস-টেস নেই।

শুনে মা'র চক্ষুস্থির। কি সব্বোনাশ, ছেলে রেস খেলতে যায়?

কালু ব্যাপারটা হাল্কা করে দেবার চেষ্টা করে—মানে মাঝে মধ্যে যায়-টায় আরকি। সে আর আপনি কি করে ঠেকাবেন, ছেলে বড় হয়েছে, বুদ্ধি-শুদ্ধি হয়েছে। তা সে যাই হোক, সে-সব পরের ব্যাপার, এখন আমরা কি করি বলুন তো? আচ্ছা, চাবিটা বাড়ি ফেলে যায়নি তো? দেখবেন একটু—

চাবি পাবার কথা নয়, পাওয়াও গেল না।

তখন কালু যেন কত মরিয়া, বলল, মাসীমা, আমি যাচ্ছি। ও এলেই ওকে আপনি ইয়ে করে মানে পত্রপাঠ পাঠিয়ে দেবেন—

মা'র তখন ভয় ধরে গেছে, বললেন তাই দেব—

কালু এলো ল্যাবরেটরীতে। বরেনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে চোখ নাচাল—কিরে?

বরেন বলল—এখন সিরিয়াস কাজ হচ্ছে কালু, অতএব ইয়ার্কি না মেরে কেটে পড়।

কালু বলল—তোরা রাত জাগবি তা রাতের খাবারের মেনুটা কি করব। চাইনীজ আনাবো?

বরেন বলল—সে তো খুব ভাল কথা। দেখ না প্রোডিউস্যারকে একবার বলে—

কালু বলল—বলতে হবে না। আমি চাইনীজের ব্যবস্থা আগেই করে দিয়েছি। সঙ্গে একভাঁড় ঠাণ্ডা দৈ আনতে বলেছি—

বরেন মুখ ভেংচে বলল, কালু তুই বাস্তবিক একটা পাঁঠা, নইলে চাইনীজের সঙ্গে একপাতে কেউ দৈ দেয়? ছোঃ!

তারপর কালুর সেই বিখ্যাত খিক খিক শুনে বীতশ্রদ্ধ বরেন তৎক্ষণাৎ সরে পড়ল নিজের কাজে। বরেনের বক্তব্য, হাসিটা শুধু বিচ্ছিরি নয়। হাসিটা রীতিমত অশালীন। ওটা একমাত্র কালুকেই নাকি শোভা পায়।

রাত সাড়ে বারোটা।

বরেনদের সদরে কড়া নড়তেই দোতলা থেকে এবার বরেনের দাদার গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল—কে?

—আজ্ঞে আমি কালু।

—কালু! তা কি চাই এত রাত্রে?

—আজ্ঞে বরেনকে। আমি স্টুডিও থেকে আসছি।

এবার সদর দরজা খুলে বরেনের দাদা বেরিয়ে এলেন চাক্ষুষ।

—অ। আপনিই তাহলে এর আগে দুবার এসেছিলেন বরেনের খোঁজে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মানে আমাকে স্টুডিও থেকে পাঠানো হয়েছে—যথাসম্ভব বিনয়ের সঙ্গে কালু নিবেদন করল। দাদাটিকে ভয়ঙ্কর রাগী মনে হল তার।

—কিন্তু সে এখনও বাড়ি ফেরেনি—

কালু যেন আর্তনাদ করে উঠলো—সেকি এখনও ফেরেনি? তাহলে আমাদের কি হবে? আমাদের চাকরী শেষ পর্যন্ত বরেনের জন্যই কি নষ্ট হবে?

কঠিনকণ্ঠে দাদা জানতে চাইলেন—আপনি আমার মা'কে বলে গেছেন—বরেন রেস খেলে?

—এ্যাঁ, না মানে ইয়ে ব্যাপারটা হচ্ছে—কালু আমতা আমতা করে

বোঝাতে চাইল, যে সেজন্য অত কঠিন আপনারা হবেন না, সখ করে খেলা তো, মুখ ফসকে কথাটা আমার নেহাৎ বেরিয়ে গেছে, নইলে ছেলে হিসেবে বরেন খুবই খাঁটি।

—আর কিছু করে কিনা জানেন?

—আজ্ঞে, তা তো ঠিক বলতে পারব না। তবে—আড্ডা-ফাড্ডা দিতে গিয়ে যদি কখনও-সখনও—সে যাই হোক, এখন আলমারীর চাবি না পেলে আমাদের অবস্থাটা মানে বুঝতেই তো পারছেন দাদা—

দাদা কটমট করে কালুর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কালু বলল—দেখি এবার খুঁজে। আচ্ছা ছেলে যাহোক। মনে হয় কোথাও নেশা ভাঙ্গ-টাঙ্গ করেই পড়ে আছে। এত রাত্তির হল অথচ বাড়ি ফিরছে না, স্টুডিওয় গেল না—নির্ঘাৎ ফেঁসেছে কোথাও। খাবার জিনিস খাবি না কেন? নিশ্চয় খাবি। তা'বলে খেয়ে বেহেড হয়ে কোথাও পড়ে থাকবি এটাও তো ভাল কথা নয়—

দাদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছেন, কালু যেন স্বগোতক্তি ছাড়ছে এমন কায়দায় কথাগুলো বলেই সাইকেলে উঠে দে-পিট্টান। দাদা কিছুক্ষণ গুম মেরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর একটা চাপা ক্রুদ্ধ গর্জন করে সশব্দে দরজা বন্ধ করলেন।

রাত ভোর হচ্ছে।

কালু বলল—ঈস বরেন স্টুডিওতে মাত্তর একটা রাত জেগেই তোর অবস্থা কাহিল। যাঃ, বাড়ি যা, বাড়ি গিয়ে দাড়িটাড়ি কেটে জামাকাপড় বদলে আয়।

বরেনের চোখ লাল, চুল উস্কোখুস্কো।

সম্পাদক সহাস্যে বললেন—তাই যাও বরেন, আমিও বরং এই ফাঁকে বাড়িটা ঘুরে আসি। আজও আবার রাত জাগার কাজ রয়েছে—

সম্পাদক চলে গেলেন। অতএব বরেনও গেল।

বাড়ির কড়া নড়তেই দাদা স্বয়ং নেমে এলেন। দরজা খুলতেই বরেন পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল, দাদা খপ করে কাঁধটা ধরলেন—বলি যাচ্ছ কোথায়?

বরেন যৎপরনাস্তি অবাক।—কেন, ভেতরে!

—ভেতরে—দাদা যেন বোমার মত ফেটে পড়লেন—হারামজাদা ছেলে তলে তলে তোমার এত গুণ হয়েছে, অ্যাঁ?

ভয়ে ভয়ে বরেন জানতে চাইল—কেন ব্যাপারটা কি?

কিন্তু তার আগেই তার মুখে হঠাৎ আছড়ে পড়ল দাদার হাতের এক বিরাট থাপ্পড়।—রেস খেলা হচ্ছে, মাল টেনে বেহুঁশ হয়ে থাকা হচ্ছে, আর রাজ্যের লোক তোমার খোঁজে ছোটাছুটি করছে—বলি ভেবেছো কি? অ্যাঁ?

হতভম্ভ বরেনের তখন কাতর প্রতিবাদ—একি তুমি আমায় মারছ কেন? মাল টানা রেস খেলা কি যা-তা সব বলছ, আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে—

দাদার গর্জন—বদমাশ আবার ঢং করা হচ্ছে, আমি সব খবর পেয়েছি। কাল রাত্রে তুমি কোথায় ছিলে?

—স্টুডিওতে। সারা রাত ওখানে কাজ হয়েছে আমাদের—

—মিথ্যে কথা। কাল তুমি স্টুডিওতেই যাওনি। কালুবাবু অনেকবার তোমার খোঁজে বাড়ি এসেছে আর গিয়েছে। লায়ার, পাষণ্ড কোথাকার। গেট আউট। গেট আউট। তোমার আর মুখদর্শনও করতে চাইনে আমরা……

—কালু? বলেই বরেনের হঠাৎ একটা চিৎকার—ব্যাটা কাল এখানে এসেছিল আমার খোঁজ করতে?

দাদা বললেন—নিশ্চয়ই এসেছিল। তার মুখেই তো তোমার সব গুণের পরিচয় পেলাম—

আর কি বরেনের সে কি প্রচণ্ড চিৎকার—আমি ওটাকে আজ ফেঁড়ে ফেলব, টুকরো টুকরো করে ফেলব, ওকে খুন করে আমি আজ ফাঁসী যাব—একটা লোহার রড সংগ্রহ করে বরেন পাঁই পাঁই ছুটল।—ট্যাকসি ট্যাকসি……

ট্যাকসি। ল্যাবরেটরী। দ্বারোয়ান দেখে বিরাট এক ডাণ্ডা হাতে বরেনবাবু ট্যাকসি থেকে নামছে। দেখেই সে সোজা হাওয়া। বরেনবাবুর

এহেন চেহারা ইতিপূর্বে সে কখনও দেখেনি। গোটা ল্যাবরেটরীতে হুলুস্থুল তোলপাড় কাণ্ড। কিন্তু কালুকে ধারে-কাছে কোথাও পাওয়া গেল না। একজন শুধু বিস্ফারিত চোখে সব দেখে আমতা আমতা করে বলল—ইয়ে কালুবাবু আমায় যাবার আগে বলে গেছেন ওঁর শরীরটা ইদানিং ভাল যাচ্ছে না বলে উনি দিনকতকের জন্যে পুরী যাচ্ছেন, বলে গেলেন, বরেনবাবু এলেই যেন কথাটা তাঁকে বলে দেওয়া হয়……

আপাত নিরীহ-দর্শন এই মধ্যবয়স্ক মানুষটিকে চিনুন! বায়োস্কোপের জগতের সঙ্গে এই মানুষটির সম্পর্ক দীর্ঘদিনের. এর বিচিত্র কার্যকলাপের সঙ্গে অল্প-বিস্তর সকলেরই পরিচয় আছে, অতএব একে আপনাদেরও চেনা প্রয়োজন।

ফিল্মে যখন প্রথম ঢুকি তখন প্রায়ই একে ওকে বলতে শুনতাম, এর জন্যে চিন্তা কিসের, কল্যাণ পাণ্ডেকে ডেকে অর্ডারটা দিয়ে দাও, সময় মত পেয়ে যাবে। লোকটা প্রায়ই আসত। অফিসের এক কোণায় বা ফ্লোরের সদর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত, যাতায়াতের পথে সবাইকে অকাতরে সেলাম করত, আবার কাজ ফুরোলেই নিঃশব্দে সরে পড়ত। ওর সেই অনুগত ভঙ্গীটা আমার খুব খারাপ লাগতো না। তারপব আমি হেন এক নবাগত, ফিল্মেব শিক্ষানবীশ, ও যখন সেই আমাকেই সেলাম ঠুকতে লাগল, আমি তো অবাক.।

আমার মুরুব্বীকে এই কথাটা একদিন বলতে তিনি সহাস্যে বললেন, কল্যাণ পাণ্ডে তো? ওরা ওরকমই। অসম্ভব চালু লোক—

আমি আরও অবাক।

—ওরা কেন? কল্যাণ পাণ্ডে তো একজন মানুষ!

মুরুব্বী আমার এহেন অজ্ঞানতায় হেসে অস্থির হয়ে বললেন, কে তোমায় বলল যে কল্যাণ পাণ্ডে একজন লোকের নাম? ওরা দুজন। একজনের নাম কল্যাণ, বাঙ্গালী মুসলমান, আর একজনের নাম পাণ্ডে,

গুজরাটি হিন্দু। ওরা দুজনে মিলেমিশে এই সাপ্লায়ের বিজনেস করে। হাঃ।

সেই থেকে ওরা যে দুটি স্বতন্ত্র সত্বা, কল্যাণ আর পাণ্ডে, এটা জানলাম মাত্র, কিন্তু মন থেকে কখনো মেনে নিতে পারিনি।

একটা ফিল্ম তৈরি করতে কি কি জিনিস প্রয়োজন পড়তে পারে, তা আপনারা ধারণায় আনতে পারবেন না। ইট, কাঠ, চুণ, সুরকি জীবজন্তু জানোয়ার মেশিনপত্র—সব কিছুরই যোগান দরকার হয়। আসলে সবটাই হয়ত কেন, নিশ্চিতই মেক-বিলিভ, কিন্তু তা বলে যদি কখনও একটা মেলার দৃশ্য স্টুডিও ফ্লোরে তৈরি করতে হয়, নকল কি ভাবে করবেন? আপনাকে একটা মেলা তৈরি করে দেখাতেই হবে। মেলার মানুষজন, দোকান-পশরা, জীবজন্তু—সবই ভাড়া করে আনতে হবে। ফ্লোরের ভেতর সেগুলো সাজিয়ে সাজিয়ে এমনই একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যে পর্দায় দর্শকরা তা যখন দেখবেন তখন তাদের চোখে সেটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। মেলাটাকে যেন একটা বাস্তব মেলা বলেই মনে হয়। এর জন্য চাই টেকনিক্যালি এক্সপার্ট মানুষ, যারা এটাকে অর্গানাইজ করবে, মেলা বসাবার রসদ জোগান দেবে, হুজ্জোত এবং হাঙ্গাম পোয়াবে।

কল্যাণ আর পাণ্ডে হচ্ছে সেই ধরণের এক্সপার্ট সাপ্লায়ার। এদের কো-অপারেশন ছাড়া ছবিতে বিয়ের দৃশ্য, শ্রাদ্ধের দৃশ্য, রাজসভার দৃশ্য, কোর্টরুমের দৃশ্য, হোটেলের ক্যাবারে নৃত্য-দৃশ্য, ভিড়-ভাট্টার দৃশ্য—কোনটাই বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা যাবে না।

কল্যাণ পরপারে চলে গেছে, স্মৃতিভারে ভারাক্রান্ত পাণ্ডে রয়ে গেছে। একদিন কল্যাণ সম্পর্কে পাণ্ডেকে একটা প্রশ্ন করে আমার কি ফ্যাসাদ, বন্ধুর অকাল বিয়োগে এই বুড়ো বয়েসেও আবেগে পাণ্ডের চোখ প্রায় ছলছল—স্যার, ও-যে এভাবে টেঁশে যাবে বুঝতে পারিনি। কত আশা ছিল দুজনে মিলে একটা ছবি করব, চাট্টে পয়সার মুখ দেখব, কিন্তু কল্যাণ ফট করে চলে গেল…

পাণ্ডের এখন একটি মাত্রই প্রার্থনা—রেটটা একটু বিবেচনা করে

দেবেন স্যার। হালে জিনিসপত্রের দাম বড় আক্রা হয়েছে। শুধু একসট্রা সাপ্লাই করে আর পেট ভরছে না...

পাণ্ডের খাতায় দু ধরনের একসট্রার নাম-ঠিকানা লেখা থাকে। টকিং আর সাইলেণ্ট। শটের মধ্যে ওর দেওয়া যে-সব মানুষ কথা কইবে—তাদের একরকম রেট, আর যারা নির্বাক—তাদের আর এক রেট। একবার একটা ছবিতে পাণ্ডের যোগানের মধ্যে ছিল একটি ভিজে বিড়াল। সে ব্যাটা শটের মধ্যে বার কতক মিঁউ মিঁউ করেছিল, কেউ তা গ্রাহ্যও করেনি। হঠাৎ একদিন সে ছবির প্রোডাকশন ম্যানেজার মহা উত্তেজিত। পাণ্ডেকে দারুণ ধমকাচ্ছে।—তোমার তো বড় নোলা হে। সামান্য একটা বিড়ালের জন্যে তুমি পনের টাকার বিল দিয়েছ? তোমার লজ্জা করে না?

পাণ্ডে তাকে 'আহা' বলে বোঝায়—ফালতু চটছেন কেন স্যার, টকিং আর্টিস্টের রেট তো বরাবরই পনের টাকা। আমি সেই টাকা বিল করেছি—

ম্যানেজার অবাক। —তার মানে? টকিং আর্টিস্ট?

—বাঃ, শটের মধ্যে বিড়ালটা ডাকেনি? আপনিই বলুন যে ধর্মত বিড়ালটা ম্যাঁও ম্যাঁও করেনি—

শুনে ম্যানেজারের চক্ষুস্থির। —সেকি হে, বেড়াল ডেকেছে বলেই ওটা টকিং আর্টিস্ট হয়ে গেল?

—আলবৎ। মানুষ কথা বললে সে টকিং আর্টিস্ট হয় আর বিড়াল বাতচিত করলে সে কেন টকিং আর্টিস্ট হবে না?

অকাট্য যুক্তি। অবশ্য প্রোডাকশন ম্যানেজারও তেমনি পাষণ্ড। বিড়ালের বিল কেটে মাত্র দু টাকায় রফা করিয়ে ছেড়েছিল—হ্যাঃ নেকে নাও না নেবে কেটে পড়। দু টাকাই তোমার লাভ। এ-থেকে বেড়ালকে তো আর ভাগ দিতে হচ্ছে না—

এহেন পাণ্ডেকে একদিন পরিচালক মঙ্গল চক্রবর্তী ডেকে বললেন—ওহে পাণ্ডে, আমার ছবিতে একটা মিশকালো বিড়াল লাগবে। দিতে পারবে?

একটা কথা, পাণ্ডের মত এতবড় গুলবাজ লোক আমি আমার জীবনে আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। যত বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি গুলমারা ওর একটা অভ্যাস। একদিন যদি এসে বলে, হাওড়া ব্রীজটা দু ফাঁক হয়ে গেছে দেখে এলাম, একটা ট্রাম সেই ফাঁক দিয়ে গলে গঙ্গায় ঢুকেছে স্যার—তো বিন্দুমাত্র অবাক হব না আমরা।

গুলগল্প ধরা পড়লেও পাণ্ডে বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ বোধ করে না—রাগ করবেন না স্যার, চোখে আজকাল সব ভাল দেখতে পাই না, কি করব বলুন!

সেদিন মঙ্গল চক্রবর্তীর অর্ডার শুনে পাণ্ডে যেন কতই চিন্তা করছে এরকম একটা ভঙ্গী করে অবশেষে নিবেদন করল—মিশকালো চাইছেন স্যার? আছে একটা। তবে খর্চাটা বেশী পড়বে—

—কত?

—দেড়শোর মত?

—ভ্যাট্—মঙ্গল চক্রবর্তী চটে গিয়ে বললেন, দেড়শো টাকায় কালো বেড়ালের গুষ্ঠীসমেত কেনা যায় সে খবর রাখো?

—উহুঁ, তামাম ভারতে ওই একটাই নিগ্রো বিড়াল আছে স্যার, আসানসোলের এক সাহেববাড়িতে। যদি বলেন তো চেষ্টা করে দেখতে পারি!

—একদম কালো বিড়াল?

—কুচকুচে কালো স্যার। পাছে কয়লা ভেবে কেউ উনুনে গুঁজে দেয়, এই ভয়ে তো স্যার মেমসাহেব ওটাকে একদম কাছ ছাড়া করে না।

—বটে! মঙ্গল চক্রবর্তী ব্যাপারটা উপভোগ করতে করতে বললেন, বেশ নিয়ে এসো। এক ফোঁটা অন্য রং হলে কিন্তু তোমার জরিমানা হবে—

পাণ্ডে চলে গেল সেলাম বাজিয়ে।

তারপর নির্ধারিত দিনে ফ্লোরে এসে বলল, মাল এনেছি স্যার।

—কই দেখাও।

একটা বাক্সর ডালা খুলে পাণ্ডে দেখাল, বাস্তবিক মিশকালো একটা

মাঝারি সাইজের বিড়াল, আতঙ্কে জুল জুল চোখে তাকিয়ে ল্যাজ গুটিয়ে সেঁটে বসে আছে। ম্যাঁও করার ক্ষমতাও যেন তার লোপ পেয়েছে।

পাণ্ডে বলল—বড় হুজ্জোৎ করে তবে আনতে হয়েছে স্যার। মেমসাহেব কিছুতেই ছাড়ছিল না, নগদ কিছু ছাড়তে তবে দিয়েছে। সাহেববাড়ির মাল, আরামে থাকে, গরমে কেমন যেন ঘেবড়ে গেছে।

পরিচালকের নির্দেশিত জায়গায় বিড়ালটিকে বসিয়ে দিয়ে পাণ্ডে সবাইকে অনুরোধ করল, এটার গায়ে কেউ হাত দেবেন না। আমায় বলবেন, যা করবার আমিই করব—

বলে পাণ্ডে কিছুদূরে একটা বেঞ্চিতে উঁচু হয়ে বসে রইল। বিড়ালের ধারে-কাছে কাউকে ঘেঁষতে দেয় না।

এখন হয়েছে কি, সব স্টুডিওতেই কিছু কিছু বেওয়ারিশ নেড়ি কুত্তা থাকে, তাদেরই একটা গন্ধে গন্ধে ফ্লোরে এসে হাজির। পাণ্ডে তখন সম্ভবতঃ অন্যমনস্ক ছিল, কুকুরটি বিনা নোটিশে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে এসেই বিড়ালটিকে বিরাট এক ঘ্যাঁক—আর যায় কোথা, বিড়ালটি আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে দে এক লাফ—সটান এক ভদ্রলোকের কোলে। সে ভদ্রলোক গিলে করা পাঞ্জাবি ধুতি পরে এসেছিলেন শুটিং দেখবেন বলে, হঠাৎ বিড়ালটি তার কোলে অমন হুমড়ি খেয়ে ল্যাণ্ড করবে এটা তিনিও বুঝতে পারেননি; ফলে তিনিও তড়াক করে লাফিয়ে উঠেই—এঃ হে, গোটা পাঞ্জাবি-ধুতি ভূষো কালিতে মাখামাখি যে—কি ব্যাপার দাদা?

মাল ততক্ষণে পুরোদস্তুর ক্যাচ। আসলে বিটকেল রং-এর এক বিড়ালকে ভূষো কালিতে চুবিয়ে ব্ল্যাক ক্যাট করা হয়েছে, পাণ্ডেরই কীর্তি, ভাগ্যিস শটের আগে ধরা পড়ে গেছে, মঙ্গল চক্রবর্তী রেগে আগুন হয়ে বললেন, ডাকো তো পাণ্ডেকে—

কিন্তু পাণ্ডে কি আর তখন রঙ্গভূমিতে থাকে? বিপদ বুঝে সে বহু আগেই সটকে গেছে, বিড়ালের দরুন প্রাপ্য টাকার মায়া ত্যাগ করেই।

এই গেল, আর একবার ভোলানাথ শিবঠাকুরকে নিয়ে একটা ছবি

উঠছে, পরিচালক পাণ্ডেকে ডেকে বললেন, পাণ্ডে একটা আসল ময়াল সাপ দিতে পারবে? শিবঠাকুরের গলায় বেড় দিয়ে ঝুলবে—

পাণ্ডের কখনও না বলে কোন কথা নেই, তৎক্ষণাৎ বলল, নিশ্চয় পাবেন। এতো খুব সামান্য রিকুইজিশান, তবে একটু বেশী খর্চা পড়বে—

পরিচালক বললেন—পাবে।

পাণ্ডে সেলাম করে গেল গড়িয়ার দিকে। ওদিকে নাকি বেদেপাড়া আছে।

দুপুর নাগাদ বিরাট আওয়াজ করতে করতে একটা টেম্পো ঢুকলো স্টুডিওতে। সঙ্গে পাণ্ডে। খবর পেয়ে সবাই ভীড় করল।

প্রথমে টেম্পো থেকে নামল বিরাট একটা বাকস। সেটা খুলতেই একটা ময়ালের দর্শন পাওয়া গেল, জিলিপির মত প্যাঁচ এঁটে পড়ে আছে।

পাণ্ডে হেসে বললে—এক নম্বর জিনিস স্যার, পাহাড়ী ময়াল—

শিব ঠাকুরের ভূমিকাভিনেতা স্বয়ং এসেছিলেন ব্যাপারটা দেখতে। ময়াল দেখে ওঃ তার কি উৎসাহ—হ্যাঁ, এই রকম একটা যন্তর গলায় না ঝুললে কি আর অ্যাকটিং করে মজা পাওয়া যায়! বাঃ, খাশা হয়েছে—

বলে শিবঠাকুর মেকআপ রুমের দিকে গেলেন মেকআপ রিটাচ করতে। ব্যাস, তিনি বেপাত্তা। শটের সময় তাঁর খোঁজ পড়তে জানা গেল তিনি পোষাক বদলে স্টুডিওর পেছনের দেয়াল টপকে কেটে পড়েছেন, রেখে গেছেন একটা ছোট্ট চিঠি—মহাশয়,

অতঃপর এই ছবিতে আমি পার্ট করিতে অক্ষম। একটি জ্যান্ত ময়াল সর্প গলায় ঝুলাইয়া আমি কিছুতেই অভিনয় করিতে পারিব না। কারণ তাহাতে আমার পত্নির নিষেধ আছে…।

পরিচালক যেন দয়ে পড়লেন—যাঃ, এখন তাহলে কি উপায়?

পাণ্ডে সিচুয়েশন বুঝে বলল—ভাল কমিশন যদি দেন তো আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।

—আমি শিববাবুকে ফেরৎ নিয়ে আসতে পারি।

—বটে! বেশ, সত্যিই যদি পারো তো একশো টাকা নগদ পাবে—

পাণ্ডে তৎক্ষণাৎ শিবঠাকুরের ঠিকানা লিখে নিয়ে ছুটল। ঘণ্টা দুই বাদে বাস্তবিকই শিবঠাকুরকে নিয়ে সে ট্যাকসি থেকে নামল স্টুডিওতে। হাসি হাসি মুখ।

এদিকে ট্যাকসি থেকে নেমে শিবঠাকুরের সেকি চনচনে ভাব। উৎফুল্ল কণ্ঠে তাকে বলতে শোনা গেল কই, আসুন দেখি কোথায় আপনাদের সেই ময়াল না গোখরো সাপ, ব্যাটার ওজনটা কত একবার দেখি—

তারপর কি অবাক কাণ্ড, শিবঠাকুর গভীর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সেই অর্ধমৃত ময়ালটিকে গলায় ঝুলিয়ে অতঃপর পরের পর শট দিলেন। কোথাও কোন গণ্ডগোল হল না। সিন শেষ করে তবে তিনি বাড়ি গেলেন।

শুটিং প্যাক আপ হবার পর সবাই পাণ্ডেকে তারিফ করে বলল—নাঃ, তুমি আজ বাস্তবিক মিরাকল কাণ্ড করলে। বলি শিবঠাকুরকে কি করে রাজী করালে।

পাণ্ডে প্রথমত বলতেই চায় না। শেষে সকলের বিশেষ পীড়াপীড়িতে সলজ্জ ভঙ্গীতে বলল—রাজী আমি করাইনি স্যার, মিথ্যে কেন বলব রাজী করিয়েছে বেঙ্গল। এক পাঁট বেঙ্গল পেটে পড়তেই উনি দুম করে রাজী হয়ে গেলেন। এবার দিন স্যার আমার ন্যায্য কমিশনটা…

একটা ছবিতে ক্যাবারে ড্যান্সের সেট লেগেছে। কিছু নিগ্রো সেলার চাই। পাণ্ডেকে অর্ডার দিতে সেদিন বিকালেই সে খিদিরপুরের জাহাজ-ঘাটা থেকে হাফ ডজন আফ্রিকান এনে হাজির স্টুডিওতে।

—নিন স্যার বেছে নিন যে কটা চাই আপনাদের।

পরিচালকের সহকারী বলল—আপাতত ওদের ফ্লোরে বসাও। ডিরেকটার এখন শুটিং করতে ব্যস্ত। প্যাক আপের পর ওঁকে একবার দেখিয়ে নেব। পাণ্ডে ছয়জন অসুর নিয়ে ফ্লোরে ঢুকল তারপর আকারে ইঙ্গিতে ওদের বোঝাল—এখানে মুখে ছিপি এঁটে একটু বসো, আমি এক্ষুনি আসছি।

পাণ্ডে বাইরে এসে চায়ের কাপটা সবে হাতে নিয়েছে হঠাৎ একটা আর্তনাদ, কি ব্যাপার না ফ্লোরের মধ্যে হিরোইন হঠাৎ ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। আর সবাই পাণ্ডেকে খুঁজছে।

পাণ্ডে তড়িৎগতিতে ফ্লোরে ঢুকতে তাকে সবাই মিলে বিরাট তম্বি,—তুমি কেমন ধারা লোক হে, ফ্লোরের মধ্যে ছ'ছটা যমদূত ঢুকিয়ে দিয়ে মজা দেখছিলে নাকি?

পাণ্ডে অবাক। —আমার তো কোন কসুর নেই স্যার—

—শাট আপ ইউ রাস্কেল। হিরোইন অজ্ঞান হচ্ছে আর তোমার কোন কসুর নেই?

শেষে জানা গেল—দোষটা নিগ্রোদের। ব্যাটারা গুটিগুটি উঠে গিয়েছিল নায়িকার ক্লোজার ভিউ দেখবার জন্যে। হিরোইন হঠাৎ দেখলেন তাঁর দিকে ছটি মিশকালো অসুর এগিয়ে আসছে, ব্যাস চিৎকার পতন ও মূর্চ্ছা যুগপৎ।

শুনে ক্রুদ্ধ পাণ্ডে গেল নিগ্রোদের ফ্লোর থেকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে। কিন্তু ওরা তখন কিছুতেই যেতে রাজী নয়। ওরা আরও শুটিং-এর মজা দেখতে চায়। পাণ্ডে চোখ পাকাতেই ছজন নিগ্রো একযোগে গিলিগিলি সহকারে এট্টু হেড হান্টিং ড্যান্স দেখিয়ে দিল। তাতে পাণ্ডেরও অবস্থা কাহিল। শেষে পুলিশকে ফোন করতে তারা এসে অবস্থা আয়ত্তে আনল। উঃ। সে ছবির ক্যাবারে নেতা শেষ অবধি নিগ্রো সেলারদের বাদ দিয়েই পিকচারাইজ করা হয়েছিল! আর কোন নিগ্রো-রিকস নেওয়া হয়নি।

পাণ্ডের ম্যাকসিমাম যে কীর্তি সেটা এবার বলি:

একবার রাত্রে একটি বাংলা ছবির শুটিং চলছে, ট্রাম ডিপোর লাগোয়া ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে। পাণ্ডে দুনিয়ার সব কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে একবার ফ্লোরে এসেছিল এটা জানতে যে এই ছবিতে কোন একসট্রার দরকার আছে কিনা। সহকারী পরিচালক পাণ্ডেকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, যাক বাঁচালে, আমি এতক্ষণ তোমারই খোঁজ করছিলাম—

—বলুন স্যার।

সহকারী পরিচালক তার রিকুইজিশান দিল। —দুজন বেশ ষণ্ডাগণ্ডা চেহারার পুলিশ চাই যে পাণ্ডে। দিতে পারবে এক্ষুনি?

—খুউব পারব। তবে রাত-বিরেতের জন্য ডবল চার্জ।

—তাই পাবে।

—তা ক্যালকাটা না বেঙ্গল?

—ক্যালকাটা।

অর্ডার পেয়ে পাণ্ডে তৎক্ষণাৎ ছুটলো ট্রাম ডিপোয়। দুজন কণ্ডাকটর তখন ডিউটি শেষ করে বাড়ি ফেরার উদ্যোগ করছিল। পাণ্ডে ছুটে গিয়ে তাদের হাতের পাঁচটা আঙুল দেখাতেই তারা নিতান্ত সম্মোহিতের মত পাণ্ডের পেছন পেছন এসে পড়ল স্টুডিওতে। কস্টুমম্যান কার্তিককে পাণ্ডে বলল—এদের দাদা এট্টু সাজিয়ে দাও, ক্যালকাটা পুলিশ।

কার্তিক ঝপাঝপ সাজিয়ে দিল।

মেকআপম্যান বিনা বাক্যব্যয়ে ওদের মুখে বসিয়ে দিল একটা করে পুরুষ্ট গোঁফ। দেখে পাণ্ডের কি তারিফ। বাঃ, খাশা মানিয়েছে ভেইয়া। একেবারে আসল পুলিশ মালুম বলে দিচ্ছি—

দুজনের অমনি মোচে তা পড়ল। জানা কথা পড়বে।

ফ্লোরে যেতে সহকারী বলল—এখন নয়, বাইরে বেঞ্চিতে বসতে বল, আমি সময় মত ভেতরে ডেকে নেব। এখনও আমাদের মার্ডার সিন শেষ হয়নি—

পাণ্ডে তখন ওদের বলল—তোমরা ভেইয়া এই এখানে একটু বসো। আমি চট করে এট্টু ফাঁড়ির মোড় থেকে ঘুরে আসছি।

ওরা বশম্বদের মত ঘাড় নাড়ল।

পাণ্ডে সাবধান করল—কোথাও সটকে যেও না ভাই। তাহলে কিন্তু কেলেঙ্কারী। রাত ফুরোলেই নগদ পাঁচ টাকা মনে থাকে যেন।

বলে পাণ্ডে নিশ্চিন্ত মনে বেঙ্গল টানতে গেল—রাত তখন সবে এগারোটা। আর ফিরল যখন তখন পাণ্ডে রীতিমত তৈরি। এট্টু

আদি রসাত্মক গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে রাত দুপুরে ফিরতে ফিরতে হঠাৎ তার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত। একি? ব্যাটাদের পৈ-পৈ করে বলে এলাম স্টুডিওয় বসে থাকতে আর কিনা এখানে এই ট্রাম ডিপোর চাতালে এসে ঠেঁশে ঘুম মারা হচ্ছে?

নির্জন ফাঁকা রাস্তা।

পাণ্ডে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ছুটে গিয়ে কনেস্টবল দুটির শার্টের কলার ধরে এক হ্যাঁচকায় টেনে তুলে ফেলল—তু লোকর শরম নৈ খে? এঁহি নিন্দে বাঁটে? চল্—

আচমকা ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় ওদিকে কনেস্টবল দুটিরও খুব খারাপ অবস্থা। ওরা বিরাট-বিরাট সব আপত্তি করতে লাগল। কিন্তু তখন তাদের কথা গ্রাহ্য করার সময় কোথায় পাণ্ডের? মুখ দিয়ে তখন খিস্তির যেন তুবড়ি ফাটছে—চল্ চল্, পৈসা মুফৎ সে মিলি? অ্যাঁ? ফিরছিলি বাড়ি, ধরে নিয়ে এসে পাঁচ টাকার কাজ ধরিয়ে দিলাম, একটা কোন পরিশ্রম নয় কিছু নয় অথচ দেখ কি রকম টেঁটিয়া লোক এরা, চল্, স্টুডিওতে কাজ ফাঁকী দিয়ে ঘুম দেওয়া তোদের আজ বের করছি—

ওরা দুটিতে যত আপত্তি করে পাণ্ডে ততই চটে। এই করতে করতে পাণ্ডে ওদের সজোরে কলার ধরে টানতে টানতে একদম স্টুডিওতে এসে হাজির। আর ঢুকেই তার চক্ষু ছানাবড়া। দেখে, নকল পুলিশ দুটো যথাপূর্ব সেই বেঞ্চিতে বসেই ঢুলছে। পাণ্ডে বুঝল কেলেঙ্কারী ঘটতে আজ আর বাকী নেই কিছু। ভুল করে সে আসল দুজন পুলিশ কনেস্টবল ধরে এনে ফেলেছে। এবার যে ওর ছাল-চামড়া উঠবে। কি করা? আসল কনেস্টবল দুটি তখনও সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারেনি। ব্যস, পাণ্ডে আর কোন কথা নয়, 'হুপ' শব্দে বিরাট এক লম্ফ মেরে সে টেনে হাওয়া। পুলিশ দুটি চোখ ফেরাবার আগেই পগার পার।

নকল কনেস্টবল দুটিও অবাক। একি আরও দুজন লোক ছবিতে নামবে নাকি? আসল কনেস্টবল দুটির রাগের ঝাল তখন যে ওদের দুজনের ওপরই বর্তেছে, তা বুঝতে পারেনি। পারল যখন কেসটা আরম্ভ হল।

পাণ্ডে এরপর আর দীর্ঘদিন টালিগঞ্জ মুখো হয়নি।

নিরামিষ্য 'প্রভু' পদে উন্নীত হবার পর বিরাট আশা করা গিয়েছিল কমেডিয়ান নৃপতি চ্যাটুজ্যে এবার ত্যাগ এবং বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে মাত্র লোটা-কম্বল সম্বল করে নিশ্চিতই হিমালয়ের গভীরে গমন করবেন—মথুরা বৃন্দাবন তো ঘরের কাছে। কিন্তু বাস্তবে তা তো হলোই না উল্টে তাঁর ইয়ে অর্থাৎ ভোগাসক্তি ফুলে-ফেঁপে প্রায় দ্বিগুণ আকারে দেখা দেবার উপক্রম হ'লো।

আর এহেন সংবাদে স্বয়ং ছবি বিশ্বাস বড়ই বিচলিত বোধ করলেন। খুবই স্বাভাবিক। কারণ তিনিই 'প্রভু মেকার'। একদিন মুডের মাথায় তিনি নৃপতি চ্যাটুজ্যের সমস্ত আপত্তি রুল আউট করে দিয়ে আচমকা 'প্রভু' টাইটেলটা দিয়ে বসেছিলেন। আর এই ব্যাপটাইজ উপলক্ষে ওখানে বেশ বড় সাইজের একটা সেলিব্রেশান-ও হয়েছিল সেদিন।

কিন্তু অল্পদিন পর ছবি বিশ্বাসের কানে প্রভু সম্পর্কে কিছু উল্টোপাল্টা খবর পৌঁছুতে উনি তো মহাবিচলিত। সঙ্গে সঙ্গে প্রভুকে এত্তেলা দিলেন।

প্রভু এলেন। ভঙ্গীটা কিঞ্চিৎ ডেসপারেট।

ছবি বিশ্বাস তাকে এক নজর দেখে নিয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডায়লাগ দিলেন —ওহে নেপতি, আমি এত আশা করে তোমায় প্রভু করলাম, ভেক নিলে না কেন হে? তুমি তো দেখছি আচ্ছা পাষণ্ড!

নৃপতি চ্যাটুজ্যে তখন ঘাড় চুলকে যেন কতই অপরাধী, পাল্টা ডায়লাগ দিলেন—ছবিদা, তখনই আপনাকে বলেছিলাম টাইটেলটা আমায় দেবেন না। কারণ আমি অক্ষম, আমি অপাত্র। তা গরীবের কথা বাসি না হলে তো মিঠে হয় না, এখন ঠ্যালা সামলান। আপনি তো জানেন আমি এট্টু-আট্টু খেতে ভালবাসি, মুরগীর ঠেংরি ফেলে ও মালসা ভোগ আমি কিছুতেই চালাতে পারব না। সে আপনি যতই ক্রুদ্ধ হ'ন। ওটা আজ পর্যন্ত কোন বাঙাল পারে নি, কোন বাঙাল পারবেও না।

বটে ?

নৃপতি দৃঢ়কণ্ঠে ডায়লাগ রাখলেন—নিশ্চয়। আপনি এখন দয়া করে টাইটেলটা ফেরৎ নিন, নিয়ে আমায় মুক্তি দিন, সখীদের অত্যাচার থেকে আমায় রেসকিউ করুন ছবিদা, অন্যথায় আমি হয়ত খেস্টান হয়ে যাব—

আর টাইটেল ফেরৎ নেবার অনুরোধে ছবি বিশ্বাসের সেকি ক্রোধ।

—ভালবেসে একটা দিলুম আর তুমি আমায় তা ফেরৎ দিতে এসেছো অকালকুস্মাণ্ড ? গেট আউট, গেট আউট ইউ আনগ্রেটফুল—

সেদিন ছবি বিশ্বাসের ক্রোধে মন্টিকার্লো হোটেলের অর্ধেকের বেশী খরিদ্দার হাওয়া। ফলে হোটেল মালিকের তো মাথায় হাত। সবে বিক্রী-বাটা শুরু হয়েছে আর তখনই যত হুজ্জুত। তবে ছবি বিশ্বাসের ডায়লগের কাউন্টার কে দেয় ? আর কে-ই বা ওঁর রোষানলে রোস্ট হ'তে চায় ? সে এক পরিস্থিতি ! শেষে বেগতিক দেখে নৃপতি চ্যাটুজ্যেই নতি স্বীকার করলেন।—ঠিক আছে ঠিক আছে দাদা, হগ্‌গোলরে কইয়া দিতাআছি আইজ থিকা আমি প্রভু। তবে দাদা—খাদ্যখাদকের ব্যাপারটা আপনিও একটু অ্যামেণ্ড করে দিন, নিরামিষ্যি পারুম না, প্রোটিনের ব্যবস্থাপত্র দিতে হবে।

ছবি বিশ্বাস তখন ক্রোধ সম্বরণ করে নিয়ে প্রসন্ন কণ্ঠে বললেন—বেশ তাই হবে। তুমি প্রভু, প্রভুর ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে, সব হবে। যেটা তুমি ভাল মনে করবে সেটা করার অবাধ স্বাধীনতা রইল তোমার। হুররা……

প্রভু শেষ পর্যন্ত 'প্রভু' রয়ে গেলেন, এখন তো বায়োস্কোপের লাইনে উনি লিজেণ্ডারি ফিগার।

প্রভু সর্বত্রই। ওঁকে সবাই চেনে, সবাই মান্য করে। ওঁর অনুচরের সংখ্যাও যথেষ্ট ; উনি তাদের সস্নেহে 'সেনাপতি' নামে ডাকেন। প্রভু যখন সত্যিকারের মুডে থাকেন তখন ওঁর নানা বিভূতি দেখা যায়। অবশ্য নাস্তিকেরা তা বিশ্বাস করে না। কিন্তু ওঁর ভক্তমণ্ডলীর দৃঢ় বিশ্বাস—প্রভু ইচ্ছা করলেই নাকি অলৌকিক কাণ্ড যখন তখন ঘটাতে পারেন……

প্রভু এখন থাকেন টালীগঞ্জে। এ-রকম কনফার্মড ব্যাচেলার পৃথিবীতে দীর্ঘদিন দেখা যায়নি। কলকাতা থেকে উনি যেদিন ওঁর টালীগঞ্জের বাড়িতে ফিরতে মনস্থ করেন, সেদিন গভীর রাত্রে, একেবারে লাস্ট ট্রাম ধরেই ফেরেন। টালীগঞ্জ সেকশানের প্রতিটি ট্রামকর্মী ওঁকে ভাল রকম চেনে। উনি লাস্ট ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসে উঠে প্রথমেই কণ্ডাকটরকে কাছে ডেকে একে একে সাতখানা টিকিট কিনে ফেলেন এবং বিমূঢ় দু-একজন প্যাসেঞ্জারের চোখের সামনে একটি বেঞ্চিতে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ে সটান নিদ্রা যান। আর অলিখিত শর্তে কণ্ডাক্টর তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ করে গাড়িটি গ্যারেজ করবার ঠিক আগের মুহূর্তে।

প্রভু-ই একমাত্র প্যাসেঞ্জার কলকাতায়, যিনি এখনও ধারে বা বাকীতে ট্রামে যাতায়াত করে থাকেন। কোন কারণে যদি ওঁর পকেটে পয়সা না-ই থাকে, প্রভু কারও তোয়াক্কা না করেই ট্রামে উঠে বসেন। কণ্ডাক্টরকে ইঙ্গিতে যা বোঝাবার বুঝিয়ে দেন। এবং পরদিন অতি প্রত্যূষে ওঁকে আবার ট্রাম ডিপোতে দেখা যায়। উনি আসেন আগের রাত্রের দেনা-মুক্ত হতে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক টিকিট কিনে উনি সেগুলি তৎক্ষণাৎ ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার বাড়িতে চলে যান।

টালীগঞ্জের ফাঁড়ি থেকে ওঁকে মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে রিক্সাযোগে বাড়ি ফিরতে হয়। এই সময়টা প্রভুর পক্ষে খুবই ক্রসিয়াল। ফাঁড়ির প্রত্যেকটি রিক্সাচালক ওঁকে ভাল চেনে। প্রভু যে-কোন একটিতে উঠে বসে পড়লে তখন সেই রিক্সাচালকেরই দায়িত্ব বর্তায়—ওঁকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছাবার।

একবার এখানেও হুজ্জুত হয়েছিল।

শীতের রাত্রি। প্রভু রিক্সা স্ট্যাণ্ডে এসে দেখেন, সব ভোঁ-ভোঁ, একটি মাত্র রিক্সা দাঁড়িয়ে, চালক বেচারি কম্বল মুড়ি-সুড়ি দিয়ে রিক্সার ওপর শুয়ে নিদ্রা যাচ্ছে। দেখে প্রভুর বড় মায়া হলো, আহা, এখন ওকে দিয়ে রিক্সা টানানো-টা অপরাধ।

প্রভু সিদ্ধান্ত নিলেন, এদিন উনি নিজেই রিক্সা চালিয়ে নিয়ে যাবেন।

আর যেমন ভাবা তেমন কর্ম। প্রভু রিক্সা টানতে শুরু করে দিলেন। প্রথম ধাক্কাতেই রিক্সাওয়ালা ধড়মড় করে জেগে উঠে দেখে, আরে যাঃ প্রভুজী নিজেই চালাচ্ছেন। সে দ্রুত নামবার চেষ্টা করতে প্রভু কঠিন ভঙ্গীতে তাঁকে বললেন—ব্যাটা, নামবার কোন রকম চেষ্টা করলে আজ তোমার ঠ্যাং খোঁড়া করব—

—আঁ? রিক্সাচালকের আর্তনাদ।

—হ্যাঁ, রোজ তুমি আমায় টেনে টেনে নিয়ে যাও, আজ আমি টানব। বেশরম কঁহিকা—

—লেকিন প্রভুজী, মেরা কসুর?

প্রভুর হুঙ্কার।—শাট্ আপ ইউ রাস্কাল, চুপ করে বসে থাকো। এখন খেয়াল করতে থাকো, আমি কত মাখনের মত চালাচ্ছি।

সেদিন গভীর রাত্রে, টালীগঞ্জের নির্জন রাস্তায় রিক্সাওয়ালার প্রাণ যায় আর কি। রামভক্ত হনুমানের মত জোড় হাতে সে বসে, তার যেন প্রাণদণ্ড হয়েছে, এই রকম ভঙ্গীতেই।…

ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওর দ্বারোয়ান বিন্ধেশ্বরী তখন খাওয়া-দাওয়া সেরে সবে শুয়েছে, হঠাৎ স্টুডিওর গেটে হট্টগোল শুনে গিয়ে দেখে স্বয়ং প্রভু, অদূরে রিক্সাচালক দাঁড়িয়ে।

প্রভু বিন্ধেশ্বরীকে হুকুম দিলেন—এই যে, তোমাকেই আমি খুঁজছিলাম, এই বেয়াদপ্ রিক্সাওয়ালাকে ওর প্রাপ্য ভাড়াটা মিটিয়ে দাও তো, আমার পকেট গড়ের মাঠ—

বিন্ধেশ্বরী তৎক্ষণাৎ হুকুম তামিল করল। এমন হুকুম তাকে প্রায়ই নিতে হয়। রিক্সাওয়ালা ভাড়া নিয়ে প্রভুকে দীর্ঘ এক সেলাম ঝেড়ে সরে পড়ল। তখন প্রভু গেলেন নিজের গৃহে।

এরপর একদিন প্রভুর সঙ্গে স্টুডিওর ক্যান্টিনে দেখা।

প্রভু সহাস্যে আহ্বান জানালেন—মধুময়।

এই 'মধুময়' শব্দটি প্রভুর ঠোঁটে যেন অনুক্ষণ লেগে আছে। ভাল-মন্দ যে কোন প্রসঙ্গের শুরু এবং শেষে প্রভুকে এটা বলতে শোনা যায়।

ওঁর সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা হতে হতে এক সময় প্রশ্ন করেছিলাম—আচ্ছা প্রভু, একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন ?

—মধুময়, নিশ্চয়।

—রাগ করবেন না তো ?

—সন উনিশশো চল্লিশের ষোলই জানুয়ারী রাত সাড়ে নটার পর ওটা আর করি না। অতএব যা বলার আপনি এখন স্বচ্ছন্দেই বলতে পারেন—

—অ।···আচ্ছা প্রভু, আপনি কখনও প্রেম করেছেন ?

প্রভু এবার আমার দিকে লম্বা করে তাকালেন। আহা, কি মৃদুমন্দ হাসি। তারপর চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বললেন, সরি, আমি ওটা একবার ইন-ডিরেক্ট করেছিলাম—, মধুময়···

—ব্যাপারটা আমরা শুনতে পাই ?

—মধুময়! তখন আমার এক পেটোয়া সেনাপতি ছিল, দুর্ধর্ষ, তাকে প্রায়ই দেখতাম মাখো মাখো সব ডায়লাগ ঝাড়ছে। একদিন ব্যাটাকে কিঞ্চিৎ রগড়াতে সে স্বীকার পেলো যে প্রেমে পড়েই এইসব ডায়লগ নাকি তার মুখস্থ হয়েছে। আমি তাজ্জব। বটে ? ব্যাপারটা মন্দ নয় তো! একদিন সেনাপতিকে বললাম, অয়, আমি প্রেম করব স্থির করছি। তুই কি কস্ ?

শুনে সে আহ্লাদে একখণ্ড নৃত্য করে আমায় বলল—বালোই করছেন প্রভু, তা কবে থিকা করবেন সেইটা কিছু স্থির করছেন নাকি ?

—যদি কই আইজ থিকা—তুই কি কস্ ?

—খুব ভালো। তো চলেন, অখনই লাইগা পড়ি। পাত্রী ঠিক কইরা ফালাইছেন তো ?

শুনে প্রভু যেন অথৈ জলে।—অয়, পাত্রী তো ঠিক করি নাই।

সেনাপতি এক লহমা চিন্তা করে জানাল, চিন্তার কিছু নেই প্রভু, সামনের ওই পুস্করণীর লগে যে বাড়ি, ওই বাড়িতে পরমা সুন্দরী এক পাত্রী আছে। তবে রঙ্গীন সাবুন লাগবো কিছু—

রঙ্গীন সাবান ? সাবান দিয়ে কি হবে ?

প্রেম পর্বে রঙীন সাবানের কোন ভূমিকা আছে, এটা প্রভু জানতেন না। তিনি তো অবাক। সেনাপতি তখন এক্সপ্লেন করল, রঙীন সাবান দিয়ে সে জলে ইয়ে খেলবে অর্থাৎ ব্যাঙাচি, এপার থেকে ছুঁড়ে মারলে সাবান ফর্-ফর্ করে ওপারের ঘাটলায় গিয়ে হাজির হবে। পাত্রী যখন ঘাটলায় এসে দাঁড়াবে তখনই শুরু হবে খেলা আর এই খেলা দেখে সে যখন খুশী হয়ে হাসবে তখনই—

—তখনই কী?

সেনাপতি তখন কান এঁটো করে এক গাল হেসে বলল—প্রেম। হুঃ!

প্রভু সহাস্যে বললেন—তখন ওই রঙীন সাবান এক পয়সায় দু খানি করে পাওয়া যেত। সেনাপতির ব্যবস্থাপত্র মত বেশ কয়েকখানি রঙীন সাবান কেনা হল। তারপর পঞ্জিকা দেখে একটা শুভ দিন স্থির করা হল। এবং নির্ধারিত দিনে, দ্বিপ্রহরে পাত্রী যখন আঁচাতে ঘাটলায় এসে দাঁড়াল, প্রভু বললেন—শুরু হল রঙীন সাবানের খেলা। আমি বহুদূরে একটা বাড়ির রকে উদগ্রীব হয়ে বসে, আমার সেনাপতি দাঁড়িয়ে এপারের আঘাটায় পাত্রী পুকুরের জলে রঙীন সাবানের ফরফরানি দেখে প্রথমে অবাক, পরে সেনাপতির সঙ্গে তার শুভদৃষ্টি হল—আমি ওখান থেকে সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি সেনাপতির মুখে হাসি, বলতে কি কিছুক্ষণের মধ্যে পাত্রীর সন্ধিগ্ধ মুখে হাসি ঝিলিক দিতে শুরু করল তখন আমি ভাবলাম কেল্লা ফতে, পাত্রীর সঙ্গে আমার প্রেম তবে আর ঠেকায় কে?

—তারপর?

—তারপর গাঢ় প্রেম, ইণ্টারভ্যাল, বিবাহ।

—অ।...ইয়ে, আপনি বিয়ে করেন নি বলেই তো শুনেছিলাম—

—ঠিকই শুনেছেন। বিয়ে আমি করি নি করেছে আমার সেনাপতি। আমি শুধু রঙীন সাবান যোগান-ই দিয়ে গেছি, তা প্রায় বছরখানেক—

একবার আমাদের কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার গৌরাঙ্গ প্রসাদ বসুর

সঙ্গে প্রভুর একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। একদিন গৌরাঙ্গবাবুর সঙ্গে পথে নৃপতি চ্যাটুজ্যের দেখা। গৌরাঙ্গবাবু বললেন—যাক্, দেখা পেয়ে ভাল হ'ল, আমি আপনাকে খুঁজছিলাম, সামনের রবিবার সকালে আপনি ফ্রী আছেন?

প্রভু অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা না করেই জবাব দিলেন—আছি।

—তাহলে ওইদিন সকালে আমি আপনার ওখানে যাচ্ছি। বিশেষ আলোচনা আছে।

প্রভু বললেন—ঠিক আছে, আমি আপনার জন্যে আমার বাসায় তাহলে অপেক্ষা করব।

এই বলে ওঁরা যে যাঁর পথে চলে গেলেন।

অথচ রবিবার দিন গৌরাঙ্গবাবু প্রভুর ওখানে গেলেন-ই না। অন্য কি একটা ব্যাপারে ফেঁসে যেতে আর যাওয়া হ'ল না। এখন গৌরাঙ্গবাবু এটা নিশ্চিত জানতেন যে গেলেও প্রভুকে বাসায় পাওয়া যেত না। শনিবার রাত্রে যে উনি বাড়ি ফিরেছেন, তেমন কথাও নিশ্চিতভাবে ওঁর সম্পর্কে বলা শক্ত।

যাইহোক, এই ঘটনার কয়েকদিন পর ওঁর সঙ্গে সেই রাস্তাতেই আবার দেখা। আর দেখা হতে গৌরাঙ্গবাবু কিছু বলবার আগেই নৃপতি চ্যাটুজ্যে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—হ্যাঁ মশয়, সেদিন এলেন না কেন?

গৌরাঙ্গবাবু আমতা-আমতা করে জিগ্যেস করলেন—সেদিন আপনি বাসায় ছিলেন? সকালে?

প্রভু যেন সাক্ষাৎ আকাশ থেকে পড়লেন।—কন্ কি মশয়, আপনাকে বাক্য দিয়ে থাকব না এ কখনও হতে পারে! বিলক্ষণ ছিলাম। আর আপনার জন্যে অপেক্ষা করে করে শেষ পর্যন্ত—

গৌরাঙ্গবাবুর তখন আর বুঝতে বাকি নেই যে প্রভু গুল মারছেন, তাই একটু জোরের সঙ্গে ঘোষণা করলেন—তাহলে আপনাকে পেলাম না কেন?

নৃপতি ঘাবড়ে গিয়ে—কোথায়?

—বাসায়?

—আপনি গিয়েছিলেন ?

—বিলক্ষণ। আমি না গিয়ে বলছি ভাবছেন ? প্রভু অপ্রস্তুত ভঙ্গীতে তখন বললেন—না, না, তা বলছি না, তবে···, কি জানি, হয়ত ভেতরের ঘরে ছিলাম, আপনার ডাক শুনতে পাইনি।

স্রেফ গুল। কারণ ঘর বলতে প্রভুর একখানাই। তার বার-ভেতর বলতে কিছু নেই। গৌরাঙ্গবাবু আরও কনফার্মড হলেন। তাই বেশ দাপটের সঙ্গে বললেন—তাহলেই বুঝুন, আমিও গিয়েছিলাম আর আপনিও ভেতরের ঘরে ছিলেন, ব্যস্, মিটে গেল গণ্ডগোল। এখন বলুন কেমন আছেন, কি খবর ?

প্রভু অতএব চুপ করে গেলেন।

এবার অন্য প্রসঙ্গে আলাপ শুরু হ'ল।

একসময় প্রভু হঠাৎ বললেন—আচ্ছা, সেদিন আপনি আমায় ডেকেছিলেন ?

আবার সেই প্রসঙ্গ। মনে মনে প্রমাদ গুনলেন গৌরাঙ্গবাবু। তারপর বললেন—নিশ্চয়। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বেশ কয়েকবার আপনাকে ডেকেও-ছিলাম—

শুনে প্রভু এবার খিক্ খিক্ করে বেশ খানিকটা হেসে নিলেন।—এটা গুল, দয়া করে আর গুল মারবেন না।

—এটা গুল হ'ল ?

—নিশ্চিত গুল।

—অ। তা কি করে বুঝলেন এটা গুল ?

—তখন বুঝিনি, কিন্তু এখন বুঝছি কারণ ওদিন আমার কুকুরটি অজ্ঞান হয়নি—

—কুকুর অজ্ঞান ? কি যা-তা বলছেন আপনি ?

—ঠিকই বলছি—প্রভু সহাস্যে বললেন, আমার একটা পোষা কুকুর আছে। কেউ চেঁচিয়ে কথা বললে সে ব্যাটা অজ্ঞান হয়ে যায়। আর সেদিন বাড়ি ফিরে দেখি ব্যাটা বহাল তবিয়তে আছে, ল্যাজ নাড়াচ্ছে।

আর আপনি বলছেন বাইরে থেকে আমায় চেঁচিয়ে ডেকেছিলেন। তা ডাকলে তো ওর চব্বিশ ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকার কথা……

শুনে গৌরাঙ্গবাবুরই অজ্ঞান হওয়ার উপক্রম।

এই মানুষটিকে চিনে রাখুন। নানা রঙ্গীন তথ্যের তবকে মোড়া এই মানুষটি বড়ই নিঃসঙ্গ, একাকী। জীবনের সুতীব্র বেদনাবোধ থেকেই তো প্রকৃত শিল্পীর জন্ম ; নৃপতি চ্যাটার্জি সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হবেন কিভাবে? চলচ্চিত্রে আসার আগে আমার আর একটা প্রশ্নের জবাবে প্রভু বললেন —মশায়, আমি কিছু করতাম না। থিয়েটার যাত্রা বা চাকরী-বাকরী— কিছুই না। অবশ্য তার কোন প্রয়োজনও ছিল না। ওঁর ছিল শুধু দেশ ভ্রমণের নেশা। সবাইকে হতভম্ব করে উনি হঠাৎ হঠাৎ বেরিয়ে পড়তেন, আর ফিরতেন দীর্ঘদিনের ব্যবধানে নানা দেশ-দেশান্তর ঘুরে।

প্রায় অসম্ভবের মধ্যে পড়ে না ব্যাপারটা যে বিগত ছত্রিশ বছর ধরে ক্রমাগত উনি মানুষ হাসাচ্ছেন? আমাদের বোঝা উচিত, এ-যুগের এক জীবন সংগ্রামেই জেরবার মানুষের শীতল নিরুত্তাপ গোমড়া মুখে হাসি ফোটানো কি দারুণ শক্ত কাজ! আর সেই কর্মটি-ই ওঁকে সুচারু রূপে সম্পন্ন করতে হয়—যখনই ডাক আসে—তখনই! কি মুস্কিল, ওঁর সুবিধা-অসুবিধার কথা কেউ বোঝে না বোঝার চেষ্টাও করে না, এমন কি নিজের পেটও নয়। কমেডিয়ানের জীবনে এই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ট্রাজেডী!

তিরিশের দশকে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের হাতের এক থাপ্পড় খেয়ে যখন প্রবল প্রতাপ বৃটিশ সিংহ খাবি খাচ্ছে, ওদের অস্ত্রাগার বেহাত এই সময় নৃপতি ছিলেন চট্টগ্রামে। অবস্থা সামান্য থিতিয়ে আসতেই চারদিকে পুলিশী সন্ত্রাস শুরু হয়েছিল, নৃপতি চ্যাটার্জির গ্রেপ্তার প্রায় অনিবার্য উনি টুক করে সরে পড়লেন। তারপর পুলিশের নজর এড়িয়ে সটান মহানগরী কলকাতায় চলে এলেন।

প্রভু থাকেন এক হোটেলে। নানা চিন্তা-ভাবনায় তাঁর দিন যায়, হঠাৎ একদিন এক অন্তরঙ্গ বন্ধু বলল বায়োস্কোপ করবি?

কিছু না ভেবেই নৃপতি বলেছিলেন—পেলে করি। কিন্তু দিচ্ছে কে?

বন্ধু ওকে তৎক্ষণাৎ নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন খ্যাতনামা পরিচালক সুশীল মজুমদারের কাছে। আর সেখানে অভিনয় নয়, গীতিবাদ্য নয়, শিল্পের কোন ভাল-মন্দ আলাপ-আলোচনাও নয়, স্রেফ কিছু কেরিকেচার দেখিয়ে আর আস্ত একখানা লেকচার ঝেড়ে মুগ্ধ করলেন মজুমদার মশায়কে। বিব্রত সুশীলবাবু বললেন ঠিক আছে আর বলতে হবে না, আমি সব বুঝতে পেরেছি।

—অ। তাহলে এখন আমি কি করবো?

সুশীলবাবু সহাস্যে বললেন—তাহলে আর কি, আপনি লেগে পড়ুন আমার সঙ্গে—

নৃপতির মুখ দিয়ে তখন আর যেন কথা সরে না।—পড়বো?

—বিলক্ষণ!

উনিশ শো সাইত্রিশ সালের কথা, সেই যে উনি বায়োস্কোপে লাগলেন, আজ সন চুয়াত্তর এখনও সগৌরবে লেগে আছেন। বয়স তো ইতিমধ্যে ছেষট্টি অতিক্রম করেই গেছে। উনি বললেন, এ পর্যন্ত আমি আমার যদ্দূর স্মরণে আছে, সাড়ে চারশোখানা বায়োস্কোপে অভিনয় করেছি। ধরুন—এর মধ্যে টুকুসখানি থেকে ইয়াব্বড় রোল আছে। খল নায়ক, চল নায়ক থেকে আরম্ভ করে ভাঁড়ামি অব্দি সব ধরনের চরিত্রেই উনি ইয়ে করেছেন অর্থাৎ অ্যাকটো করেছেন।

নাঃ, জীবনে অভিনয়ের স্বীকৃতি যেটা এখন সরকারী-বেসরকারীভাবে সবাই সবাইকে দিয়ে কৃতার্থ হচ্ছে, তেমন কোন পুরস্কার পান নি। তবে সবচেয়ে বড় পুরস্কার যেটা পেয়েছেন তা হচ্ছে দর্শকের হাসিভরা মুখ। বললেন, সবাই কষ্টের মধ্যে থাকে, যেটা আমিও থাকি, লোকে এই পরিস্থিতিতে হাসবে কি করে? আমি সেই বিষণ্ণ মুখে হাসি ফোটাই, একজন শিল্পীর জীবনে এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কি হতে পারে?

চলচ্চিত্রে এখন পরিষ্কার একটা জেনারেশন গ্যাপ চলছে। টালিগঞ্জের স্টুডিও পাড়ার সাবেক আমলের শিল্পী এবং কলাকুশলীদের সঙ্গে এসব

প্রসঙ্গে আলোচনা করলে বোঝা যায় এই গ্যাপটা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। পৌরাণিক ঐতিহাসিক ও ভক্তিমূলক ছবির যুগ এখন অস্তমিত? এসব ছবির প্রয়োজনীয়তা কি বাস্তবিক ফুরিয়ে গেছে? এটা একটা বিতর্কিত প্রশ্ন। তবে ইদানিং মাইথোলজিক্যাল ছবি যে হচ্ছে না এতো দেখতেই পাচ্ছি।

অথচ এদেশে এমন দিন গেছে—চিত্রনির্মাতারা পৌরাণিক ছবি তৈরীর ওপর বেশী গুরুত্ব দিতেন। আর দর্শকরাও সেসব ছবি বেশ ভক্তিসহকারে দেখতেন। তখন অবশ্য ছায়াছবির টেকনিক্যাল দিকটি এখনকার মত এত শক্তিশালী হয়ে ওঠেনি। ছবিতে তাই অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেত। এমনও হয়েছে টালিগঞ্জের খালের শট্ তুলে তাকে মহাসমুদ্র বলে পর্দায় চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর দর্শকরা তা বিনা প্রতিবাদে মেনেও নিয়েছেন। ধরুন বাসুদেব কংসের কারাগার থেকে সদ্যোজাত শ্রীকৃষ্ণকে কোলে করে নিয়ে চলেছেন গোকুলের পথে। পথে পড়েছে এক অকূল নদী। ঝড় প্লাবনের ঘন অন্ধকার রাত্রি। বিদ্যুৎ চমকের আলোর এই তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ নদী কিভাবে পার হবেন বাসুদেব? এ আর এমন কি একটা কথা, নদী দু-ভাগ হয়ে ওঁকে পথ দেখায়। শেয়ালরূপী নারায়ণ চলেছেন আগে আগে। মাথায় ছাতার মত বিশাল ফণা তুলেছেন স্বয়ং বাসুকী। এই তো ব্যাপার, এখন লক্ষ্য করুন বায়োস্কোপে সেটা কিভাবে করা হয়েছে—ঠা-ঠা রোদ্দুরে খেঁকুড়ে মার্কা বাসুদেব কোলে একটা পুতুল নিয়ে ডিং মেরে মেরে টালি খাল পার হচ্ছে। বাসুকী-ফাসুকীর চিহ্ন নেই কোথাও। শেয়াল ধরা অত সোজা কম্মো নয়। অতএব একটি শান্তশিষ্ট নেড়িকুত্তা ধরে তাকে পেন্ট করে শেয়াল বলে চালানো হচ্ছে পরে ভুল ধরা পড়তে ক্ষিপ্ত পরিচালক সেই শট আবার রি-টেক করেছেন তাঁর কটু মন্তব্যে জানা যায়, তোমাদের কি আক্কেল হে, হিন্দুর ছেলে হয়ে এতবড় এট্টা অধম্মো না হয় করেইছো তা বলে শ্যালের লেজ কখনও উব্দো হয় দেখেছো? না অমন জিলিপির প্যাঁচ হয়?

শুনে সব্বার মুখ শুকনো, আরে তাই তো এখন উপায়?

পরিচালকই বাতলে দিয়েছিলেন উপায় লেজে দাও ঝুলিয়ে পাঁচসেরি এক বাটখারা দেখি কেমন উদ্ধো হয়। ও স্যালুট করে নেবে পড়তে আর পথ পাবে না।

অথচ লেজে পাঁচসেরি এক বাটখারা ঝুলিয়ে পৃথিবীতে হেন নেড়িকুত্তা কি আছে যে নড়াচড়া করতে রাজী হবে? অতএব ক্যামেরার বাইরে থেকে আধলা ঝেড়ে ঝেড়ে তাকে টালি খালে নামাতেই সবাই গলদ-ঘর্ম, তারও পর বাসুদেব রয়েছেন পেছন পেছন, কোমর জল পেতেই তিনি কাছা সামলাতে গিয়ে কেষ্টকে জলে ফেলে দিয়ে আর এক কেলেঙ্কারী বাধিয়ে বসলেন। তখন টোটাল ব্যাপারটা দাঁড়াল এই রকম—খালের ওপারে শেয়াল উঠে গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়াতেই সে কুত্তা হয়ে গেল কারণ তার গায়ে অত যত্ন করে যে রঙ করা হয়েছিল তা গেছে ধুয়ে। আর কোথায় বাটখারা? ভেসে বেরিয়ে গেছে নিশ্চিত। তাই অবনত লেজ ফের উদ্ধো হয়ে বনবন চক্কর দিচ্ছে শূন্যে। পরিচালক ভদ্রলোক তখন দুঃখে ক্ষোভে নিজের কপাল চাপড়ে অস্থির। তারও পর বাসুদেব যখন ঠেলে উঠলেন—নাঃ সে আর বলা যাবে না। এত কাণ্ড করে তোলা সে-সব ছবি কিন্তু ভাল চলেছে সে যুগে। সুপার হিট হয়েছে। আর প্রত্যেক শো শেষ হবার পর মঞ্চে রাশীকৃত পয়সা পাওয়া গেছে। ভক্ত দর্শকরা পালা ছুঁড়ে পেন্নাম জানিয়ে গাত্রোত্থান করেছেন যে! খোদ কলকাতায় এ ঘটনা আকছার ঘটেছে মফঃস্বলে তো বিলক্ষণ।

এখন ফিল্মের টেকনিক্যাল মাউন্টিং দারুণ শক্তিশালী। এমন একটা ক্যামেরা বেরিয়েছে যার নাম অপটিক্যাল ক্যামেরা—অবাস্তব ঘটনাকে ছবিতে এই অপটিক্যাল লেন্সের সাহায্যে এমন নিখুঁত বাস্তবসম্মত করে প্রেজেন্ট করা যায় যে স্তম্ভিত হতে হয়।

এখন এই ব্যাপারটা যত বাস্তব হচ্ছে তত ফন্দি-ফিকির বের করতে হচ্ছে মাথা খাটিয়ে খাটিয়ে। মোদ্দা শট-টা না তুলতে পারলে আবার অপটিক্যাল ট্রিটমেন্ট করা যায় না। চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়া, আগুনের মধ্যে ছোটাছুটি করা, প্লেন থেকে ভিলেনের হাতের ঘুঁষি খেয়ে

নায়কের মহাশূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়া—এই সব দুঃসাহসিক দৃশ্যগুলি তোলা আজকাল অপটিক্যাল লেন্সের দৌলতে খুব সোজা হয়ে গেছে। কিন্তু মূল শটগুলো নিতে গিয়েও নানা ধরনের অ্যাকসিডেণ্ট ঘটছে।

ফিল্মে এটা হচ্ছে সবচেয়ে ডেঞ্জারাস লিভিং। একদল পেশাদার মানুষ অহরহ এই কাজে নিযুক্ত। বোম্বেতেই অবশ্য এদের বাড়-বাড়ন্ত। স্টাণ্টম্যান আর ডাবলম্যান হিসাবে এরা পরিচিত।

বোম্বের ছবিতে মারপিঠের দৃশ্য একটা মাস্ট। এটা না থাকলে ছবি বিক্রী হবে না। ধর্মেন্দ্রকে প্রায় ছবিতে যেসব ভয়ঙ্কর মারপিটের দৃশ্যে দেখা যায় এটা কি সত্যি সত্যিই ধর্মেন্দ্রজী করেন? একদম নয়। এর জন্যে স্টাণ্টম্যানকে নিয়োগ করা হয়। মোটামুটি ধর্মেন্দ্রজীর মত দেখতে—এরকম কয়েকজন লোক বোম্বেতে আছে। মারপিটের দৃশ্যে আসলে তাদের কেউ একজন ধর্মেন্দ্রজীর কন্টিনিউটি পোষাক পরে লড়ে যায়। সে-ছবিতে ভিলেন যদি হন শত্রুঘ্ন, তাহলে শত্রুঘ্নর ডাবলম্যান মারপিট করবে।

তখন বোম্বেতে আছি। একদিন বিশ্বজিতের সঙ্গে দেখা করবার দরকার পড়ল। ফোন করতে ওঁর সেক্রেটারী জানালেন—বিশ্বজিৎ এখন দাদারের রনজিৎ স্টুডিওতে শুটিং করছেন—ওখানে চলে যান।

তাই গেলাম।

গিয়ে দেখি ফ্লোরে এলাহি কাণ্ড-কারখানা চলছে। ডাবলম্যান আর স্টাণ্টম্যানদের ভিড়ে ফ্লোর গিশ-গিশ করছে। বিশ্বজিৎ আর শত্রুঘ্ন ঘর্মাক্ত দেহে এয়ার সার্কুলেটারের সামনে দাঁড়িয়ে দম নিচ্ছেন। স্টাণ্টম্যানদের যে নেতা তার নাম শঙ্কর, আমার বন্ধুস্থানীয়। আমায় দেখে একগাল হেসে বললে—আ যা বাঙালী, দেখ্ আজ কিৎনা তাকত্ উড়তা হ্যায়···

লড়াই হচ্ছে বিশ্বজিৎ আর শত্রুঘ্নর মধ্যে। অর্থাৎ ভিলেন আর হিরো। মাঝখানে একটা মেয়ের প্রবলেম রয়েছে নিশ্চয়। ফটাফট্ রদ্দা উড়ছে। ফ্লোরে মূল ডিরেকটার মনমোহন দেশাই কপালের রগ

টিপে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এইসব সিকোয়েন্সে ছবির মূল পরিচালকদের কিচ্ছু করার থাকে না—যা করবার স্টান্টম্যানদের নেতা যে—সে করে। ক্যামেরা কখন কোথায় বসবে, আর্টিস্টরা কি রকম অ্যাকশান করবে—সব বলবে সে। এমনকি শট শুরু এবং শেষ হবে তার-ই নির্দেশে।

বিশ্বজিৎ বললেন—এসো। দেখ কি হাল হচ্ছে আমাদের! এর নাম ফিল্মের পয়সা। রোজগার করতে রক্ত দিতে হয়।

একটা ক্লোজ শট হল। এখানে ডাবলম্যান দেওয়া যায় না। মিড লঙ বা লঙ শটে ডাবলম্যান স্বচ্ছন্দে দেয়া যায়।

শঙ্কর ক্লোজ শট-টা কম্পোজ করে শত্রুঘ্নকে বলল—আপনি এই শটে প্রোফাইল পাবেন, বিশ্বজিৎজী ফুল প্রেফারেন্স—আপনি ওঁর নাক বরাবর টেনে ঘুঁষি ঝাড়লে বিশ্বজিৎজী আপনাকে তলপেটে লাথি কসিয়ে দেবেন। আপনি 'ওক্' করে উঠলেই আমি শট কাট করে দেব।

বিশ্বজিৎ বললেন—শত্রু তুমি যথাসম্ভব বাঁচিয়ে ঘুঁসি চালাবে। বিকেলের শিফটে আমার আবার অন্য ছবির শুটিং আছে মেহ্‌বুব স্টুডিওতে। মনে থাকে যেন—

শত্রুঘ্ন হেসে বললেন—কোই ফিকর নেহি বিশুদা, ম্যায় সব কর্‌লুঙ্গা বাঁচাকে—

কিন্তু শট শেষ হবার পর পরই বিশ্বজিৎকে নাকে বরফ্ ঘষতে হল। শত্রুঘ্ন অপ্রস্তুত হেসে বোঝাল—একটু হেলে গেছে ঘুঁসিটা। আই এ্যম সরি বিশুদা।

বিশ্বজিতের হয়ে বদ্‌লা নিল তাঁর ডাবলম্যান। পরের শটে সে শত্রুঘ্নর ডাবলম্যানকে স্রেফ তুলোধোনা করে ছেড়ে দিল। শঙ্কর চটে ফায়ার—এসব কি হচ্ছে? বিশ্বজিতের ডাবলম্যান দাঁত বের করে যেন সে কতই অপ্রস্তুত—হেসে এমন একটা ভঙ্গি করল। এটা একটা অদ্ভুত সাইকোলজি। যে যার ডাবলম্যান তার আচার-ব্যবহার কিছুটা সেই অনুযায়ী গড়ে ওঠে। কোন শটে তার মাস্টার একটু বেশী ধোলাই খেলে—ডাবলম্যান হয়ত পরের শটেই সেই ঝাল মিটিয়ে দিতে চেষ্টা করে।

সেজন্য সব আর্টিস্ট-ই নিজের নিজের ডাবলম্যানকে প্রাণপণে সামলাবার চেষ্টা করে থাকেন।

সেদিনই তো বিশ্বজিৎ নিজের ডাবল ম্যানকে ডেকে খুব কড়কে দিলেন —কেন অকারণ ওকে পিটলে—ও গরীব মানুষ—বিছানায় পড়ে গেলে ওকে কে খাওয়াবে ?

—শত্রুঘ্নজী।

—বটে! আর তুমি পড়লে ?

—কে আর—আপনিই খাওয়াবেন।

কথাটা মিথ্যে নয়, ডাবলম্যানদের বিপদে এঁরাও মুক্তহস্ত। কারণ বোম্বের ফিল্মে যাঁর যত মারপিটের ইমেজ ভাল, তার তত বক্স অফিস ভাল। সেই ইমেজ এই ডাবলম্যানদের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল।

তারপর একটা ক্যাণ্টেঙ্কারাস শট দেখলাম।

হিরো ভিলেনকে পিটতে পিটতে প্রথমে ঘর থেকে বারান্দায় বের করে নিয়ে আসবে। ফাইট এখানে আরও জোরদার হবে। হতে হতে একসময় হিরোর হাতের একটা প্রচণ্ড ঘুঁসি খেয়ে ভিলেন দোতলার রেলিং ভেঙে দড়াম করে সটান নীচে এসে পড়বে। বাপ্!

শঙ্করকে বলতে সে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল—এ এমন কিছু নয়, শত্রুজীর ডাবলম্যান একবার গায়ে পেট্রল ঢেলে তাতে আগুন জ্বালিয়ে চলন্ত একসপ্রেস ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে একটা শট দিয়েছিল। ব্যস, ও এখন অল প্রুফ প্রায় অমর হয়ে গেছে।

শেষ মুহূর্তে পরিচালক শট-টা একটু অলটার করতে চাইলেন। একটা কাঁচ ভেঙে যদি ও পড়ে তো বেটার হয়। শঙ্কর সামান্য মাথা চুলকে ও-কে করে দিল। গাড়ি ছুটল। ঢাউস একটা কাঁচ এলো। স্টুডিওর কার্পেণ্টাররা সেটা তৎক্ষণাৎ লাগিয়ে দিল।

ফ্লোরে একটা নয় তখন দুটো মুভী ক্যামেরা বসানো হলো। এই ধরনের শট কখনও রিটেক হয় না, হওয়া সম্ভবও না।

ডাবলম্যান একটা সামারসণ্ট দিয়ে কাঁচ ভেঙে নীচে এসে পড়বে

এবং তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে শট আউট হয়ে যাবে। কি ভাই, সব ঠিক হ্যায়? বাতাইয়ে?

কিছুক্ষণের মধ্যে সেই প্রাণঘাতী শটটা দেখলাম মশাই চোখের সামনে। ঘুঁসিটি নিল, সামারসল্ট দিল, কাঁচ ভেঙে প্রিসাইসলী ক্যামেরার সামনে এসে দড়াম করে পড়ল, উঠল, তারপর অক্লেশে শট আউট হয়ে গেল। কাট!

এবার দেখুন ওর কি হাল।

বেচারির হাতের কনুই কাঁচে কেটে ফালা হয়েছে, কেটে গেছে, রক্ত ঝরছে। ফ্লোরে ডাক্তার মজুদ থাকেন। তিনিও নির্বিকার। উঠলেন। স্টিচিং হলো ফটাফট। ব্যাণ্ডেজ হলো। ডাবলম্যান ওষুধ এবং ব্র্যাণ্ডি খেয়ে আবার ফুরফুর করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এবার আর ও নয়, শত্রুঘ্নর তুনম্বর ডাবলম্যান অ্যাকটিভ হবে, পরের শটগুলো তাকে দিয়ে নিতে হবে। যেন কিছুই না, আমি অবাক! শঙ্করকে একবার বলেছিলাম—ভাই এত থাকতে এই ডেঞ্জারাস প্রোফেশান নিলে কেন? যখন-তখন জীবন চলে যেতে পারে—

শঙ্কর হেসেছে। —ইয়ে জিন্দেগী, অ্যাসাই গুজারনা হ্যায়। আসলে দারুণ একসাইটমেণ্ট আছে এতে, যেটা আর কোথাও নেই। হয়ত সেই জন্যেই আমরা করি।...মরতে একদিন না একদিন তো হবে।...ও ভেবে আর কি লাভ?

সেদিন কাগজ পড়তে গিয়ে হঠাৎ দেখলাম, একজন স্টাণ্টম্যানের শোচনীয় মৃত্যু ঘটেছে আউটডোর লোকেশানে শট দিতে গিয়ে। এটুকুই খবর। পড়ে মনটা ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। এদের অনেককে আমি যে চিনি। পেটের জন্মে মানুষ কত কি করে, এমনকি স্টাণ্টম্যানের ডেঞ্জারাস লিভিং নিতেও বাধ্য হয়। অথচ মানুষের জীবন মৃত্যুতে তো কোন স্টাণ্ট নেই। সেটা নিরেট এবং এক অপ্রতিরোধ্য বাস্তব।

ছবিতে কাজ বাগাবার আশায় কিছু লোক দমাদ্দম মিথ্যে কথা বলে যায়। যেমন প্রশ্ন করা হল—আপনি ঘোড়ায় চড়া জানেন?

উত্তর এল।—নিশ্চয়। আমি কলকাতা পুলিশের সার্জেন্ট, আমাদের ঘোড়ায় চড়ার ট্রেনিং নিতে হয়েছে।

—আর আপনি?

দ্বিতীয়জন বললেন—আমি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে টানা এক বছর ঘোড়ায় চড়ার ট্রেনিং নিয়েছি।

তখন আর একজনকে প্রশ্ন করা হলো—আপনি স্টেনগান চালাতে জানেন?

—বিলক্ষণ। এন, সি, সি-তে আমি স্টেনগানারই ছিলাম।

—ঠিক তো?

—বিশ্বাস করুন—

এবার আসুন আমার সঙ্গে অভিশপ্ত চম্বলে। ছবির শুটিং হচ্ছে। এর মধ্যে একদিন গোয়ালিয়র থেকে এক ডজন মিলিটারী ঘোড়া লোকেশানে আনা হল। সেদিন আমাদের শিডিউল—শুধু, ঘোড়া সংক্রান্ত ছবিতে যত শট লাগবে, সেগুলোই পরের পর তুলে ফেলা।

একটা দৃশ্য ছিল—ডাকাতরা ঘোড়ায় করে এসে একটা গাছের ডালে তাদের বেঁধে রেখে গ্রামে ডাকাতি করতে ঢুকবে। এবং লুটের মালপত্র সব ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে চম্পট দেবে। খুব সরল ব্যাপার।

এখন এই তেজী তেজী মিলিটারী ঘোড়া দেখে চড়িয়েদের কোথায় উৎসাহিত হবার কথা, তা নয়, কয়েকজন দেখলাম বেশ মনমরা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যিনি পুলিশে ট্রেনিং পেয়েছেন, তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ। আমরা তাঁকেই অ্যাটেম্পট করলাম। ট্রেনারকে বলা হল—মশাই একটা অর্ডিনারী রিহার্সাল দিয়ে ব্যাপারটা একবার দেখান তো আমাদের।

মিলিটারী ট্রেনার তখন তার মোচে তা দিয়ে বলল—ঠিক হ্যায়, আব্ দেখাইয়ে সওয়ারী কৌন?

আমরা তখন সেই পুলিশ সার্জেন্টকে দেখিয়ে দিতে তিনি মৃদু আর্তনাদ করলেন। তাড়াতাড়ি আমাকে একপাশে ডেকে বললেন—রিহার্স্যালটা

অন্য কাউকে দিয়ে করুন, আমি একেবারে ফাইন্যাল টেকের সময় মাউন্ট করব, প্লীজ—

মাল ক্যাচ্।

তখন ভিকটোরিয়া ফ্রন্টের আর্টিস্টকে ধরা হলো। তার তো মুখ শুকিয়ে আমসি। সে শুধু বিড়বিড় করে বলল—আমি তো বেঁটে ঘোড়ায় ট্রেনিং নিয়েছি, এ-যে টাউস ঘোড়া। পারব তো?

আমি অভয় দিলাম।—নিশ্চয় পারবেন। উঠে পড়ুন—

এমনিতে উঠতে পারল না। একটা টুল দিতে হলো।

টুলের ওপর দাঁড়িয়ে অনেক পাঁয়তাড়া করে যাহোক উঠলো শেষ পর্যন্ত।

ট্রেনার তার ঘোড়াকে হেঁকে বললেন—ট্রট!

ঘোড়া ট্রট করতে করতে এগিয়ে চলল। সওয়ারী লাগাম ধরে সিঁটিয়ে বসে আছে দেখলাম, কোনগতিকে। হঠাৎ ট্রেনার চেঁচিয়ে বলেন—ক্যাণ্টার।

আর যায় কোথা, ঘোড়া তৎক্ষণাৎ যেন লম্বা হয়ে গেল, সেকি দৌড়, বাপস, চোখের নিমেষে সেই ঘোড়া পাহাড়ের আড়ালে চলে গেল। আর অদৃশ্য হবার আগে দেখলাম সওয়ারী লাগাম ছেড়ে ঘোড়ার গলা দু'হাতে বেড় দিয়ে টান টান শুয়ে পড়েছে।

মিনিট দশেক পরে ঘোড়া যথাস্থানে ফিরে এল। কিন্তু পিঠে তার সওয়ারী নেই। কি ব্যাপার? সে মক্কেল কোথায় গেল? আরও কিছুক্ষণ পর তাকে দেখা গেল। অনেক দূরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে করুণ মুখে এদিকে আসছে। তার অভিযোগ, অসভ্য এই ঘোড়াটি পাহাড়ের আড়ালে গিয়ে হঠাৎ গা-মোড়া দিয়ে তাকে ফেলে দিয়ে পালিয়েছে। এ মশায় আমি চড়তে পারব না।

তারপর ঘোড়ার শট সেদিন যে কিভাবে হয়েছিল তা একমাত্র ঈশ্বর জানেন।

স্টেনগানার হচ্ছে পঙ্কজ। শুটিং করতে করতে তাকে আমি প্রায়ই ঠুকতাম—অ মশায়, শেষ পর্যন্ত পারবেন তো?

পঙ্কজ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে প্রতিবারই জবাব দিয়েছে—পারব পারব, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। হেঃ, স্টেনগানতো সামান্য জিনিস, এন, সি, সি-তে আমি কতবার বলে কামান দেগেছি—

লোকেশান প্যাকআপ হবার দু'দিন আগে স্থির হলো পরদিন গুলি-গোলার শট নিতে হবে। সেইমত সিকিউরিটি ফোর্সের সঙ্গে আমাদের ব্যবস্থা হল। ডিরেকট লাইফ শট, সত্যিকারের গুলি-গোলা চলবে।

বেহড়ের এক নির্জন উপত্যকায় লোকেশান নির্বাচন করা হল। প্রথমেই স্টেনগানের শট। পঙ্কজের ভাবগতিক আমার কেমন যেন সুবিধে মনে হল না। ততক্ষণে তার হাতে স্টেনগান দিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্টেনগানের ম্যাগাজিন বোঝাই করে বুলেট ভরে দেওয়া, পঙ্কজ যন্ত্রটি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতেই দেখলাম যেন স্রেফ ফাঁসির আসামী হয়ে গেল। দরদর করে ঘামতেও আরম্ভ করল।

ক্যামেরা ফিকসড্। রামানন্দ সেনগুপ্ত ওকে ওর পজিশনে দাঁড় করিয়ে ক্যামেরায় অ্যাপারচার দিতে বললেন ওর সহকারী পিণ্টুকে।

পিণ্টুকে বললাম—তুমি অ্যাপারচার দিয়ে সোজা কেটে এসো, ধারেকাছে থেকো না, পঙ্কজের গতিক কিন্তু খারাপ—

পরিচালিকা মঞ্জু দে স্টার্ট সাউণ্ড হাঁকবার সঙ্গে সঙ্গে আমি ক্ষিপ্রগতিতে ক্ল্যাপস্টিক বাজিয়ে দিয়ে দে-দৌড়। ক্যামেরা চলতে লাগল।

—অ্যাকশান!

কামান-দাগা পঙ্কজ এবার ট্রিগারে চাপ দিল। আরেব্বাস সঙ্গে সঙ্গে বিকট আওয়াজ করে 'মাল' বেরুতে লাগল। তাই দেখে পঙ্কজের চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে দেখলাম। হুড়-হুড়-হুড়-হুড় করে জ্বলন্ত বুলেট বেরিয়ে আসছে, সাঁই সাঁই শব্দ হচ্ছে, পঙ্কজ হঠাৎ ঘাবড়ে গিয়ে আমাদের দিকে ফিরতে আরম্ভ করল, ওর খেয়াল নেই যে সেই সঙ্গে অগ্নিস্রাবী ব্যারেল-ও আমাদের দিকে ঘুরছে, ক্যামেরাম্যান রামানন্দ সেনগুপ্ত হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন—সব মাটিতে টান টান হয়ে শুয়ে পড়।

সে আর বলতে, আমরা ঝপাঝপ মাটিতে সেটে গেছি ততক্ষণে, মাথার ওপর দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট বেরিয়ে যাচ্ছে। চারিদিকে প্রবল কনফিউশান হৈচৈ, চিৎকার—ওরে শালা বন্ধ কর, বন্ধ কর—

পঙ্কজের সাধ্য কি তখন বন্ধ করে। আসলে তার অনভ্যস্ত আঙুল তখন ট্রিগারে সেঁটে বসে গেছে, এত নার্ভাস যে আঙুল সরিয়ে আনতেও পারছে না। শেষ বুলেট বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত এই-ই চলল, তারপর সব চুপ, অখণ্ড নীরবতা, সব ঠাণ্ডা।

আমরা মাটি থেকে উঠে দেখি পঙ্কজ ঠিক স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে, চোখের পলক পড়ছে না, ব্যতিক্রম শুধু স্টেনগান ধরা হাতটিতে, সেটি তখনও কেঁপে চলেছে। যাঃ।

স্টুডিওতে সেদিন আমাদের লাঞ্চ ব্রেক হয়েছে। আমরা ক্যান্টিনে গিয়ে সবাই খেতে বসেছি। হঠাৎ দেখি, কলকাতা হাইকোর্টের একজন বিচারপতি ঢুকছেন। না না, আসল নয়, ডাঁহা নকল। স্টুডিওর দুনম্বর ফ্লোরে সেদিন যে ছবির শুটিং চলছিল, আদালতের একটা জবরদস্ত দৃশ্য, বিচারপতি সেখানকার-ই। একটা শ'টের শেষ এবং আর একটির সুরুর মধ্যে ফ্লোরে লাইট তৈরী করতে যে অবসর, তারই ফাঁকে ভদ্রলোক ধড়াচুড়ো পরে বেরিয়ে পড়েছেন খাদ্যের সন্ধানে। বেঁটে খাটো গোলগাল ভারিক্কী চেহারা, বছর চল্লিশের মধ্যে বয়েস ভদ্রলোকের, আমাদের পাতের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে প্রশ্ন করলেন—টোস্ট পাওয়া যাবে?

ক্যান্টিনের ছেলেটি অবাক চোখে ভদ্রলোককে দেখছিল, ঘাড় নেড়ে বলল—যাবে।

—তাহলে কড়া করে দুখানা দাও তো আমায় গোলমরিচ দিয়ে। আর এক কাপ চা। আর এক গেলাস জল। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে—

বলে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ভদ্রলোক বসলেন। তারপর কি মনে হতে মাথার পরচুল মানে বিচারপতিরা যেমন ধারা পরেন, সেটা খুলে

রাখলেন টেবিলে। অমনি একটা টাক দেখা গেল। ঘামে চকচক করছে। তারপর ভদ্রলোক পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করে বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলেন। নিশ্চিত ডায়লাগ।

ভাবুন, আদালতের একজন বিচক্ষণ জজ-সাহেব বসে বসে ডায়লাগ মুখস্থ করছেন আর আমরা সশব্দে লাঞ্চ ওড়াচ্ছি। ভদ্রলোক একবার ভ্রুকুটি হেনে আমাদের দিকে তাকালেন।

এ-সব দৃশ্য এখন চোখে সয়ে গেছে। এখানে কেউ রাজা, কেউ উজির, কেউ ফকির সাজছে। তারপর ক্যামেরার সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, শট দিচ্ছে, শুটিং প্যাক আপ হয়ে গেলে মুখের রং মুছে ভাউচার সই করে টাকা গুনে নিয়ে বাড়ি ফিরছে। এখানে কেউ কারো ধার ধারে না।

এক কালের নায়ক প্রীতি মজুমদারের কথা মনে আছে? ওঁর ডাকনাম টুকলু। সেই টুকলুদাকে একবার ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে এই রকমই এক লাঞ্চ ব্রেকের সময় দেখেছিলাম, রামভক্ত হনুমানের রূপসজ্জা নিয়েছেন। এঃ। একটুও বাড়িয়ে বলছি না, তরণীসেন বধ ছবিটির নাম, আমার পরিষ্কার মনে আছে, হনুমান সেজেছেন বলে তাঁর পেছনে ঢাউস একটা ল্যাজ জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। ভদ্রলোক সেটাকে সামলাতেই যেন অস্থির। লাঞ্চ খেতে যাবার সময়, মানুষ যেমন গড়গড়ার নল পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে গোল করে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখে ঠিক তেমনিভাবে ল্যাজটাকে গুটিয়ে হাতে ঝুলিয়ে ভদ্রলোক খেতে চলেছেন। দেখুন কী নিষ্ঠুর এই লাইন—হিরো থেকে হনুমান!

সেদিন জয়ন্ত এসে ক্যান্টিনে ঢুকে সেই বিচারক ভদ্রলোককে উদ্দেশ্য করে বলল—পালিতদা, কেমন লাগছে?

বিচারকবেশী পালিত বিরস কণ্ঠে বললেন—আরে ধুর মশায়, আগে জানলে কী আর জজসাহেব সাজতে রাজী হতাম? এই পার্টে বিস্তর ঝাপা। দেখুন না তখন চেয়ারে বসে বসে এট্টুখানি ইয়ে করছিলাম, অমনি ডিরেকটারসাহেব আমায় মানা করলেন—

—কিয়ে করছিলেন?

—ওই যে কান চুলকাচ্ছিলাম। তা জজ বলে কী মানুষ কানও চুলকাবে না, এ্যাঁ? এ তো আচ্ছা ফ্যাসাদ। তারপর ধরুন দিয়েচে এই এক ভয়ঙ্কর ডায়লাগ, কিছুতেই শালা মুখস্থ হচ্ছে না। বড় খটোমটো ইংরিজী—

জয়ন্ত যেন অভয় দিল।—হবে হবে, কিচ্ছু আটকাবে না। আরে আপনি হচ্ছেন গিয়ে……, তা আজকে আপনার আসামীকে ডকে?

—কিসে?

—ডকে?

পালিতবাবু রহস্যটা বুঝলেন না সম্ভবত।

বললেন—ডকে-ফকে বুঝি না ভাই, তবে আসামী তো দেখলাম উত্তমকুমার নিজে। ভয়ঙ্কর এট্টা মামলা চলছে বলে মনে হলো—

জয়ন্ত চোখ টিপে হেসে বলল—সেকি মশাই, আপনি বিচারপতি অথচ আপনিই জানেন না কী মামলা? আপনাকে পার্ট পড়ায় নি?

পালিতবাবু বললেন—সে পড়িয়েছে। কি সব যেন ধারা-টারাও বলল, কিন্তু ও আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমি মশাই কখনও কোর্ট-কাছারীতে যাই না। আমার বড্ড ভয় করে—

—সে বললে তো হবে না, আপনি পার্ট করবেন জজসাহেবের অথচ জজিয়তির কিছুই বুঝবেন না এটা হতে পারে না। অন্তত বোঝার চেষ্টা করা উচিত ছিল—

আর যায় কোথা, পালিতবাবু এবার যেন খেঁকিয়ে উঠলেন—থামুন তো।…বুঝতে গিয়েই না ডিরেকটারের ধমক খেলাম। উনি বললেন থাক, আইন বুঝে আর আপনার পার্ট করতে হবে না। আপনাকে যা যা বলব তাই তাই চোখ বুঁজে করে যাবেন, বেশী কেদানি ফলাতে যাবেন না, হুঁঃ। বুঝেছেন জয়ন্তবাবু আমায় আর জ্ঞান দেবেন না, সব গুবলেট হয়ে যাবে—

জয়ন্ত অগত্যা চেপে গেল। তারপর নিজের খাবারে মনোনিবেশ করল।

লাঞ্চের পর জয়ন্ত বলল—আরে পালিতবাবুকে তুমি চেনো না? যাচ্ছলে! আমাদের সব ছবিতেই ওঁকে একটু-আধটু পার্ট দিতে হয়। সখের অভিনেতা—

—আসলে করেন কী ভদ্রলোক?

জয়ন্ত মুচকি হেসে বলল—ভদ্রলোক পাচক ঠাকুর!

—যাঃ।

—আরে যা বলছি শোন, ভদ্রলোক বাস্তবিকই একজন হালুইকার। কলকাতার একটা নামজাদা ফাইভ স্টার হোটেলের নাম উল্লেখ করে জয়ন্ত বলল—অবশ্য পাচক বলতে যা বুঝি উনি অবশ্য তা নন, অতবড় হোটেলের হেডকুক। দেশ-বিদেশের ভাল-মন্দ সবরকম সুখাদ্য রন্ধন করে ওঁকে খদ্দেরের পাতে পরিবেশন করতে হয়। লা গুর্মে অর্থাৎ খাদ্যতালিকার সমস্ত ব্যাপারটা ওঁর নখদর্পণে। কয়েক ডজন অধঃস্তন পাচক নিয়ে ওঁকে রোজ এই কর্মটি বেশ সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে হয়। পৃথিবীতে কত রকম যে রান্না আছে—

আমি তো অবাক।

সে কি হে! ভদ্রলোককে সামনা-সামনি দেখে তো অমন তালেবরটি মনে হয় না! তুমি চেখে-টেখে দেখেছো কখনও?

—বিলক্ষণ—জয়ন্ত বলল—একবার পালিতবাবু আমায় সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন ওখানে। এলাহি ব্যাপার। খেয়েওছিলাম যথেষ্ট—

আজ সেই ভদ্রলোক বিচারপতি, আইনের বিন্দু-বিসর্গ যাঁর জানা নেই, তিনি পর্দায় একজন হোমরা-চোমরা জজসাহেবের চেহারায় আবির্ভূত হবেন—ভাবতেই কি রকম যেন অদ্ভুত লাগে।

ওই ছবিতে উত্তমকুমার দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন। একজন গুড উত্তমকুমার আর একজন ব্যাড উত্তমকুমার। উত্তমকুমার তাঁর অভিনয় জীবনে এই রকম অজস্র দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এতে বেশ একটা মজা আছে। শুনলাম, ব্যাড উত্তমকুমার ফেঁসে গেছেন, আজ তাঁর ফাঁসির আদেশের দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ করা হবে।

পালিতবাবু তাই শুনে তো ভয়েই অস্থির। তাঁকেই সেই প্রাণদণ্ডের আদেশ পাঠ করতে হবে ক্যামেরার সামনে। উত্তমকুমার তাঁর সব চাইতে ফেভারিট আর্টিস্ট, শেষ পর্যন্ত এই অপকর্মটি তাঁকেই করতে হচ্ছে বলে পালিতবাবুর কী দুঃখু—বুঝলেন জয়ন্তবাবু, এই পার্টটা আমাকে না দিলেই বোধহয় ভাল ছিল। আমি মশায় এ-সব পছন্দ করি না—

—কি-সব পছন্দ করেন না ?

—এই যে প্রাণদণ্ড-টণ্ড। লোকে বড্ড চটে যায়। দেখবেন ছবি বেরুলে আমায় কত হেনস্থা করে। আফটার অল উত্তমকুমার, দড়াম করে প্রাণদণ্ডটা দিয়েই দিলে ? আমার স্ত্রী-ই হয়ত আমার ওপর খাপ্পা হবেন। ওরা সবাই উত্তমকুমারকে খুব ভালবাসে কিনা!

জয়ন্ত ওঁকে বোঝায়—আহা, এতো আর সত্যিকারের ব্যাপার নয়, এ তো অভিনয়। অভিনয়ে কত কিছু হয় পালিতবাবু—

কিন্তু পালিতবাবুর সেই এক কথা—সে কথা মশাই আমাদের পাবলিক আজকাল আর বুঝতে চায় না। বিশেষ করে চ্যাংড়ারা। বলবে—কী, তুমি গুরুকে লটকে দিয়েছো ? তোমার এতবড় আস্পদ্দা ? দাঁড়াও তোমাকেও লটকাচ্ছি। উত্তমকুমার গুডম্যান, ও চিরদিনই গুডম্যান থাকবেন মশাই, আপনারা বায়োস্কোপে ওটা আর বদলাতে পারবেন না। তারপর ধরুন আমার কথা, ইহজন্মে আমি তো কত কাণ্ড করেছি কিন্তু প্রাণদণ্ড-টণ্ড কখনো কাউকে দিইনি, আজ ঘাবড়ে গিয়ে একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে না বসি—

দেখুন তারপরের ঘটনা :

অস্বাভাবিক উত্তেজনায় চারদিক থমথম করছে। গুরু-গম্ভীর সেশন আদালত। চারিদিকে উকিল ব্যারিস্টার আমলা পুলিশ আর একদল নিষ্কর্মা দর্শকে ঠাসা বিচারগৃহ।

এখানে জলজ্যান্ত এক খুনের আসামীর ট্রায়াল চলছে।

মাত্র কিছুক্ষণ আগে জুরীদের প্যানেল কোর্ট রুমে ফিরে এসে, তাঁদের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত বিচারপতিকে জানিয়ে দিয়ে তাঁদের নির্ধারিত জায়গায়

বসে পড়েছেন। জানিয়ে দিয়েছেন যে তাঁরা তাঁদের জ্ঞানবুদ্ধি বিবেক বিবেচনা অনুযায়ী এক সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন—গিল্টী। অতএব মী লর্ড, আপনি এবার দয়া করে আপনার নিরপেক্ষ রায় যদি জানিয়ে দেন তাহলে আমরা কৃতার্থ হই…

কোর্ট ঘরে উৎকণ্ঠা, আতঙ্ক এবং উত্তেজনা।

পালিতবাবুর অবস্থা কাহিল। গরমে তিনি কুলকুল করে ঘামতে আরম্ভ করেছেন। সবাই যেন রুদ্ধশ্বাসে তাঁর দিকে তাকিয়ে।

দশ টাকার একজন একসট্রা, সে সেজেছে একজন উকিল, শামলা পরে বড়ই অস্থির, তার কেবল ভয়—শুটিং আজ আবার না একসটেনশান হয়ে যায়, তাহলে সর্বনাশ, কালকে একটা বড় ছবির আউটডোরে যাবার কথা আছে আমার, সেটা ফস্কে যেতে পারে। সে বিড়বিড় করে বলল—হুজুর মেহেরবান, রায়টা তাড়াতাড়ি দিয়ে দিন। শুটিং প্যাকআপ হয়ে যাক, আমরা কেটে পড়ি—

পালিতবাবুর কানে কথাটা যেতে তিনি ক্ষিপ্ত।—ইঃ, রায়টা যেন আমার আস্তিনের মধ্যে গোটানো আছে, বের করলাম আর পড়ে দিলাম! যত্তসব। আজ রাত নটার আগে কেউ ছাড়া পাবে না। ইয়ার্কি না?

দেখুন কেমন সব গুলিয়ে যাচ্ছে—এখানে আসামীও আসামী নয়; আসামী উত্তমকুমার হতে যাবেন কোন্ দুঃখে মশাই? কিন্তু আর্ট ডিরেক-টারের কেরামতিতে রূপসজ্জাকরের এলেমে এবং চিত্র-পরিচালকের সূক্ষ্ম বাস্তব বুদ্ধির জন্যে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর এক নম্বর ফ্লোরটা আশ্চর্য এক ধর্মাধিকরণের চেহারা নিয়েছে। শামলা আর উর্দি গায়ে দ্রুত ব্যস্তসমস্ত পেয়াদা পুলিশের চলাফেরা দেখে কে বলে এটা কোর্টরুম নয়? বেড়ে ভাই বেড়ে। এই রকম রিয়ালিষ্টিক টাচ্ দিতে পারলেই তো দর্শকদের কেল্লা ফতে!

ছবির সেই রিয়ালিষ্টিক কোর্টরুমের সেটে একটা লোহার খাঁচায় বিবর্ণ নিস্প্রভ মুখে আসামী সেজে দাঁড়িয়ে ছিলেন স্বয়ং উত্তমকুমার। খুনের দায়ে ধৃত আসামী, বিচারের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায় যেমন—যথার্থ তেমনি ভাবেই।

মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। রাতজাগা ঈষৎ রক্তিম চোখ। দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁট। দাঁড়াবার ভঙ্গিটা ঈষৎ শ্লথ—পায়ের নিচে থেকে হঠাৎ কখনও মাটি সরে গেলে মানুষ যেমন দাঁড়ায়, অবিকল তাই।

ফ্লোরের অন্ধকার একটি কোণে দাঁড়িয়ে ছিলাম। পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন আরও কয়েকজন কৌতূহলী দর্শক। হঠাৎ তাঁদের মধ্যে থেকে কে যেন ইস্ ইস্ করে উঠলেন।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, বেদনার্ত চোখে এক ভদ্রমহিলা উত্তমকুমারের সেই বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। বুঝলাম, ওষুধ ধরেছে। একে মহিলা তায় সুন্দরী—তাঁর স্বপ্নের নায়ক উত্তমকুমার খুনী আসামী সেজে চোখের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, এ তাঁর কিছুতেই সহ্য হচ্ছে না। একি সহ্য হয়? ছবির পরিচালককেই এজন্যে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার ইচ্ছে যায়!

ক্রেনে ছিল ক্যামেরা।

ক্যামেরাম্যান দিলীপরঞ্জন পরিচালক পীযুষ বসুর ইঙ্গিতের জন্যে অপেক্ষা করছিল। সারাটা ফ্লোর নিস্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করছিল পরবর্তী অ্যাকশানের জন্যে।

অথচ, এই মাত্র কিছুক্ষণ আগে, উত্তমকুমারকে দেখেছি স্টুডিওর অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে প্রসন্ন হাসিমুখে একজন পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্পগাছা করছিলেন। এবং তারপর দেখছি—সটান লোহার খাঁচাটির মধ্যে।

নির্বাক ভাবলেশহীন মুখে দাঁড়িয়ে।

ভয়ঙ্কর একটা কিছুর প্রতীক্ষায়-ই হয়ত বা।

আদালতের মধ্যে দারুণ অস্বস্তিকর একটা চাপা ভ্যাপসা গুমোট গরম আবহাওয়া।

উকিল মোক্তাররা চুপচাপ।

পালিতবাবু মাথা নিচু করে কাগজে কি যেন সব লিখে চলেছেন, দ্রুত হাতে, পরিচালকের কড়া আদেশ। দেয়ালঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ শোনা যাচ্ছে।

আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, আচ্ছা, এটা তো বাস্তব দৃশ্য নয়, সিনেমার জন্যে নির্ভুল অঙ্কে সাজানো একটা নকল পটভূমি, তা হোক না জবরদস্ত এন্যাক্টমেণ্ট—অবাস্তব তো বটেই, ওই যে বিচারপতি, পেয়াদা-পুলিশ, উকিল মহুরী পেস্কার, দর্শক আর খুনী আসামী, সবাই তো নকল, তবে কেন এই গা ছমছম ভাব? ব্যাপারটা কী?

—পালিতবাবু, এদিকে ফিরে তাকান—পীযুষ বসুর গম্ভীর কণ্ঠস্বরে এ-কোন পালিতবাবু ক্যামেরার দিকে তাকালেন? জয়ন্ত তখুনি কনুই দিয়ে আমায় একটা গোত্তা মারল।

গম্ভীর, থমথমে মুখ, বিচক্ষণ এক বিচারপতি তখন সকলের ওপর নজর বুলিয়ে নিয়ে তার রায় পড়বার উদ্যোগ করছেন।

সঙ্গে সঙ্গে লোহার খাঁচায় পোরা বাঘটা হঠাৎ যেন সচকিত হয়ে উঠল। উত্তমকুমারের মুখে নানা প্রতিক্রিয়া অদৃশ্য ইলেকট্রনের মত খেলা করে বেড়াতে লাগল।

জজসাহেবের কণ্ঠস্বরে চুম্বক ছিল বুঝি-বা, আর সবাই যেন লোহা—আমাদের সর্ব-ইন্দ্রিয় সেদিকে আকৃষ্ট হল। উনি পড়তে আরম্ভ করলেন…

—দি মেজরিটি ভার্ডিক্ট অব দি জুরী ইজ গিল্টী উইথ রিগার্ড টু দি চার্জ অফ মার্ডার। আই অ্যাকসেপ্ট ইট অ্যাজ দি ক্রাইম কমিটেড বাই রুদ্রকান্ত রায় ইজ ডায়াবলিক্যাল অ্যাণ্ড ডাজ নট অ্যাট অল ডিজার্ভস লিলিয়েন্সি। আই সেনটেন্স ইউ টু ডেথ বাই হ্যাঙ্গিং বাই দি নেক আনটিল ইউ শ্যাল বী ডেড।

মৃত্যুদণ্ড! পরিষ্কার মৃত্যুদণ্ড! দেখতে দেখতে আসামীর মুখ ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। পালিতবাবুরও।

জীবনের চাইতে সুন্দর নেই, মৃত্যুর চাইতে ভয়ঙ্কর নেই, যদি সে জীবন বাঞ্ছিত এবং মৃত্যু অবাঞ্ছিত হয়। এমন কি স্টুডিওর নকল পটভূমিতেও সেই জীবন নকল নয়, মৃত্যুও নয়।

এই উপসংহার?

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত কথাটা আমার স্মরণ হলো, আমরা তখন 'বনপলাশির পদাবলী' ছবির সম্পাদনায় ব্যস্ত, একদিন সকালের শিফটে আমাদের কাজ শুরু হতে না হতেই হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল, লোডশেডিং, উত্তমকুমারের প্রসন্ন মুখে বিরক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট, কাঁধ ঝাঁকিয়ে হতাশ ভঙ্গী করে বললেন —নাঃ—আজ দিনটাই মাটি…

আমরা সম্পাদনাগারের বাইরে দোতলার একফালি যে বারান্দা, সেখানে দাঁড়িয়ে। একটা নিমগাছের ডাল বারান্দা ছুঁয়ে কোন গতিকে দাঁড়িয়ে, বাতাসে দুলছে। তখন হঠাৎ সেই সব প্রসঙ্গ উঠল, সময় দ্রুত কাটাবার সব সরস প্রসঙ্গ, মাদ্রাজে কে এক ভদ্রলোক আছেন, তাঁর কাছে ভৃগুর একটা প্রাচীন পুঁথি আছে, কেউ তাঁর সমুখে দাঁড়িয়ে সঠিক জন্ম-মুহূর্ত বলতে পারলে ভদ্রলোক সেই মানুষটির অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ তো বটেই, সেই সঙ্গে আগের আগের আগেরও জন্মবৃত্তান্ত হুবহু নাকি বলতে পারেন। সেই প্রাচীন পুঁথিতেই নাকি সর্বস্ব লেখা আছে। পৃথিবীতে এ-পর্যন্ত যত মানুষ জন্মেছে, যত জন্মাবে—প্রত্যেকের অদৃষ্টলিপি নাকি নিখুঁতভাবে লেখা আছে সেই পুঁথিতে। তার একচুল নড়চড় হবার উপায় নেই।

উত্তমকুমার হাসছিলেন।

ওখানে তখন সুপ্রিয়া দেবী দাঁড়িয়ে, পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় এসেছেন, খোশ গল্পে অংশ নিয়েছেন, হঠাৎ উত্তমকুমার বোমা ফাটালেন—

—আমি দু' জন্ম আগে মেয়েচোর ছিলাম—

—যাঃ! সুপ্রিয়া দেবীর সশব্দ প্রতিবাদ।

উত্তমকুমারের সেকি হাসি।

—হ্যাঁ, বিশ্বাস করো, ভৃগু তাই লিখে রেখে গেছেন। মেয়েচুরিই নাকি আমার পেশা ছিল…

অন্ততঃ এটুকু আমার বিশ্বাস করতে বেশ ভালই লাগে। উত্তমকুমারের মত গ্রেগরী পেক, রিচার্ড বার্টন—এইসব বিশ্বখ্যাত 'শো-ম্যান'রা যদি সরল স্বীকারোক্তি করেন তো দেখা যাবে এঁরা জন্ম জন্ম শুধু সুন্দরী

মেয়েদের চুরিই করেছেন এবং আজও অগুন্তি করছেন। অনেকে আবার তা স্বীকার করে আত্মশ্লাঘাও প্রকাশ করেছেন। সুন্দরী মহিলাদের অপহরণ করা—পৃথিবীর সবচাইতে বড় আর্টের অন্তর্গত। এই বিদ্যায় পারদর্শী মানুষের সঙ্গে আমার চেনা পরিচয় ছিল না, হঠাৎ সেদিন উত্তমকুমার কথাটা বলায় শরীরে আমি যেন বিদ্যুতের শিহরণ অনুভব করেছিলাম।

নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর ফ্লোরে একটা ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ চলছিল। আমি বেকুফের মত তখন স্টুডিওর গোলঘরে বসে মক্ষি তাড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি স্বয়ং সন্ন্যাসী রাজা হাঁটতে হাঁটতে মেকআপ রুমের দিকে চলেছেন। আমি উত্তমকুমারকে বিভিন্ন বেশে অভিনয় করতে দেখেছি এতাবৎকাল। হয়েছে কি, সর্বত্রই উত্তমকুমারকে ভাল রকম চেনা যায়, অর্থাৎ অভিনীত চরিত্রকে ছাপিয়ে ব্যক্তি উত্তমকুমার সেক্ষেত্রে জেগে থাকেন। দর্শকেরা হাউস থেকে বেরিয়ে, অভিনীত চরিত্রের নাম ধরা যাক—'রজত'—কখনও বলে না, যেটা বলে তা হচ্ছে, রজতের পার্টটা উত্তমকুমার খুব ভাল করেছেন। অথবা গুরু গুরু—কে রজত আর কে জয়ন্ত—কেউ খোঁজ রাখে না, মেয়েরা তো নয়-ই।

এতবড় 'শো-ম্যান' আমি জীবনে আর কখনও দেখতে পাব বলে মনে হয় না। সুন্দরী মেয়েমহলে এক উত্তমকুমার যে ওয়াকওভার পেয়েছেন, অতীতে তেমন কেউ পায়নি আর ভবিষ্যতে? কনসার্ণ্ট ভৃগু ওনলি⋯।

একবার বন্যাত্রাণে ভদ্রলোক পাঞ্জাবি-পাজামা পরে দক্ষিণ কলকাতায় ফাণ্ড কালেকশানে বেরিয়েছিলেন। প্রথমে ছিলেন গাড়িতে। পপুলার ডিমাণ্ডে তাঁকে শেষ পর্যন্ত যেতে হল পায়দল। তারপর ওঁকে আর কিছুক্ষণ ক্যামেরার শক্তিশালী লেন্সেও খুঁজে পাওয়া গেল না। চারিদিকে রঙীন প্রজাপতি তার পাখনা মেলা, রংয়ের তবকে মোড়া শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত রমণী হৃদয়ের আবডালে আবডালে, ভদ্রলোকের যেন প্রাণান্তকর অবস্থা, চাঁদার কৌটো ঝাঁকাবার আগেই নিশ্চিত মেয়েরা তাঁকে ইয়ে করেছিল, ভদ্রলোক অতঃপর পালাতে আর পথ পাননি। এ তো আমার নিজের চোখেই দেখা।

আর মেয়েমহলে এই অসম্ভব জনপ্রিয়তা, যেটা উত্তমকুমার নিজেও জানেন, তার প্রতিষ্ঠার মূলে রয়েছে। মনে হয় উনি কাউকেও বিমুখ করেন না। অর্থাৎ অটোগ্রাফ চাইতে গিয়ে কাউকে বড় নামঞ্জুর হয়ে ফিরতে হয় না।

আমাকে প্রায়শঃ এই অনুরোধের মুখোমুখি হতে হয়—আমাদের একটা ভাল শুটিং দেখাবার ব্যবস্থা করতে হবে, ধরুন যেদিন ফ্লোরে উত্তমকুমার থাকবেন।

তাই, যদি উত্তমকুমার অভিনীত কোন ছবির ফ্লোরে দেখতে পান একদল সুন্দরী মেয়ে বসে শুটিং যত-না দেখছে, বেশী দেখছে উত্তমকুমারকে, তাহলেও বিস্মিত হবেন না। উত্তমকুমারের রোমান্টিক হাসি মেয়েদের বুকে যে ঝড় তোলে, স্যাটেলাইটের ক্ষমতা নেই তার আগাম হদিশ আবহাওয়া দপ্তরকে দেয়।

এ হেন অমায়িক সুদর্শন মানুষটি কখনও কখনও বিরক্ত বোধ করেন। ফ্লোরে উনি বিশিষ্ট 'শো-ম্যান'। প্রোফেশন্যাল কারণে ওঁকে সেই শো বজায় রেখে চলতে হয়। দেখুন, মাঝে-মধ্যে কি ব্যাপার হয়—টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে একটা উত্তম-অপর্ণা স্টারার ছবির শুটিং চলছে। আমিও সে-ছবির জনৈক কুশলী। দিনটি সম্ভবতঃ ছুটির দিন ছিল। আমরা লক্ষ্য করলাম, ফ্লোরে মহিলা গেস্টের সংখ্যা বেলা যত বাড়ছে তত বাড়ছে।

উত্তমকুমার সেদিন ছবির নায়কের দারিদ্র্যের সংগ্রামের মুহূর্তগুলির রূপ দিচ্ছিলেন। ওঁর পরণের পোশাক-আশাকে দৈন্যের চেহারাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। এখন এই পোশাকে উনি ওঁর মেয়ে ফ্যানদের সম্মুখে থাকতে রাজী হচ্ছিলেন না। গোটা দুয়েক শট দেবার পর উনি হঠাৎ ফ্লোর থেকে ওয়াক-আউট করলেন।

পরিচালক প্রথমে ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেননি। পরে আমি বুঝিয়ে দিতে উনি বললেন—এইরে, এখন কি হবে?

আমি মেকআপ রুমে যেতে উত্তমকুমার জানতে চাইলেন—ফ্লোর খালি হয়েছে? আগে ফাঁকা করুন, তারপর যাব—

সেটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। উত্তমকুমার অস্বস্তি বোধ করছেন, অতএব আপনারা দয়া করে এবার গাত্রোত্থান করুন—এটা কে গিয়ে বলবে? কম-বেশী প্রায় সব গেস্টই প্রযোজকের ইনভিটিশানে ফ্লোরে এসেছেন। আমি বিপদ বুঝে সেদিন মানে মানে সরে পড়লাম। তখন প্রোডাকশন ম্যানেজারকে এই ভয়ঙ্কর খবরটা রাষ্ট্র করে তবে ফ্লোর খালি করতে হলো।

তারপর খবর গেল উত্তমকুমারের কাছে। উনি নিশ্চিন্তভাবে ফ্লোরে এলেন। পর পর শট হয়ে গেল। তারপর কস্ট্যুম চেঞ্জের ব্যাপার। উত্তম বললেন, এবার গেস্টদের ভেতরে আসতে দিতে পারেন। কারণ এরপর উত্তমকুমার অভ্যস্ত পোশাকে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবেন, এই সুপরিচিত মানুষকেও তখন তাঁর সুপরিচিত গ্ল্যামারেই দেখা যাবে।

এটাকে আপনি কি বলবেন? আমি বলি, এটা শো-ম্যানশিপেরই অঙ্গ। কোন অভিনেতা এটার গুরুত্ব অস্বীকার করতে পারেন না।

সুচিত্রা সেন তো ফ্লোরে কোন গেস্ট-ই অ্যালাউ করেন না। বাইরের মানুষজনের উপস্থিতিতে উনি বিব্রত বোধ করেন। ক্যামেরার সামনে অভিনয় করতে করতে এক একটা মুহূর্ত আসে যখন বাইরের অনভ্যস্ত দর্শকেরা বিচলিত বোধ করতে পারেন। ধরুন একটা রোমান্টিক দৃশ্যের টেকিং হচ্ছে। নায়ক-নায়িকার একটা ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের মুহূর্ত; বাইরের মানুষের উপস্থিতিতে তাঁদের পক্ষে এটা করা হয়ত সম্ভবপর নাও হতে পারে; সবটাই তো 'মেকবিলিভ' ব্যাপার। অথচ ফ্লোরের কর্মরত টেকনিশিয়ান্সদের কাছে এটা এমন কিছু ব্যাপার নয়, কারণ এটা তাদের নিয়মিত কাজেরই একটা অঙ্গ, আর্টিস্টরাও নির্দ্বিধায় করতে পারেন। তফাৎ এতটাই।

কিছুদিন আগে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে সুচিত্রা সেনের শুটিং চলছিল। দেখলাম, উনি মেকআপরুম থেকে হাঁটতে হাঁটতে ফ্লোরের দিকে চলেছেন। সেই একই অভিজাত চলন, ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট ভঙ্গিমা।

নীরবে, ঈষৎ নতমুখে উনি হাঁটেছেন। সুন্দরী মহিলা উনি নিঃসন্দেহে-ই, এ-দিন ওঁর বয়স যেন আরও কম লাগল। আগের তুলনায় আরও স্লিম হয়েছেন। যতই জেনারেশন-গ্যাপ হোক-না-কেন, উনি এই সময়েও তো বোম্বেতে গ্ল্যামার পার্সোনালিটি, আপাততঃ সঞ্জীবকুমারের বিপরীতে নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করছেন। সেটাও কি বড় সহজ কথা!

অর্পণা সেন, আপাতত যে-সব চলচ্চিত্রে অভিনয় করছেন, তাঁদের মধ্যে ব্যতিক্রম। কিছুদিন আগে আমি ওঁর সঙ্গে একটা ছবিতে একত্রে কাজ করছিলাম, সেখানে একটা ঘটনা হঠাৎ-ই ঘটলো দেখলাম।

ফ্লোরে সেদিন বেশ কিছু গেস্ট ছিলেন। অপর্ণা এ-সব কিছু মাইণ্ড করেন না। রয়েছে তো রয়েছে, তাতে কি হয়েছে? সেদিন একটা আবেগপ্রধান দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ করা হচ্ছিল। অপর্ণা সেন প্রায় প্রত্যেক শটে আবেগে চোখের জল ফেলবেন। পরিচালক তাই ঘন ঘন ফ্লোর সাইলেন্স করিয়ে দিচ্ছিলেন। তাঁর হম্বি-তম্বিতেই ফ্লোর তটস্থ। খবর্দার, কেউ আওয়াজ করবেন না। আমার আর্টিস্ট এখন দারুণ ডিফিক্যাল্ট শট দিচ্ছেন। এখন তাঁর মনোযোগের সামান্য ইতর-বিশেষ হলে শটটাই মাঠে মারা যাবে। অতএব কমপ্লীট সাইলেন্স ইন দি ফ্লোর…

পর পর গুটিকয়েক ইমোশন্যাল শট ভালয় ভালয় হয়ে গেল।

অর্পণা তারই ফাঁকে একটা সিগ্রেট টেনে নিলেন। একটু কফি খেলেন। বন্ধুদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টাও করলেন। সব ব্যাপারটাই উনি হাল্কাভাবে করছিলেন, ওঁর ব্যবহারে মনেই হচ্ছিল না যে পরিচালক যত বলছেন, আসলে ফ্লোরে তেমন গুরুতর কিছু ঘটছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে আর একটা শটের আলো তৈরী হয়ে গেল। পরিচালক তৎক্ষণাৎ অপর্ণাকে আহ্বান করলেন, অপর্ণাও রেডি ফর দি টেক, একটা সাউণ্ড মনিটার হলো, শব্দযন্ত্রী মনিটার শুনে তৎক্ষণাৎ ও-কে সিগন্যাল দিচ্ছেন, এবার টেকিং।

ক্ল্যাপস্টিক পড়ার পর পরিচালক যেই অ্যাকশান বলেছেন, হঠাৎ কে

যেন ফ্লোরের মধ্যে সশব্দে হেঁচে উঠল। কাট কাট। ব্যস, পরিচালক রেগে যেন আগুনের গোলা হয়ে গেলেন।

ওদিকে হাঁচনদারের অবস্থা কাহিল।

ক্ষিপ্ত পরিচালক তাকে বললেন—তোমার কি আক্কেল হে? আমার আর্টিস্ট চোখে জল-টল এনে যাঁহা তৈরী হয়েছে শট দেবে বলে, অমনি তুমি হেঁচে দিলে?

সে বেচারা কাঁচুমাচু।—আজ্ঞে, সামলাতে পারলাম না—

—সামলাতে যদি না পার তো এই এখানে কেন এসেছো অ্যাঁ? পরিচালক তাকে যৎ-পর-নাস্তি হেনস্থা করতে করতে বাক্য দিলেন—উজবুক কোথাকার, এই যে অপর্ণার মুড চলে গেল, এ আর নতুনভাবে হবে? গেট আউট—

অপর্ণা বললেন, শুনুন, আমি ঠিক আছি, আমার জন্যে চিন্তা করবেন না…

পরিচালক তখনও মহাক্ষিপ্ত—না অপর্ণা, এটা ভাই বলো না যে ঠিক আছো তুমি। কি করে থাকবে? আফটার অল চোখের জল বলে একটা কথা, কতটা ইমোশন্যাল হলে তবে চোখের জল আসে তা আমার ভাল জানা আছে। ফিল্মে আমারও তো কমদিন হলো না…

অপর্ণা বিব্রত।

বললেন, ঠিক আছে, যা হবার তো হয়েইছে। আসুন, শটটা আর একবার টেক করা যাক—

পরিচালক তবুও গজগজ করতে লাগলেন। সম্ভবত এই ধারণাটা তাঁর বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে অপর্ণা যেভাবে শট দিতে পারতেন এই গণ্ডগোলের ফলে সে-জিনিসটা আর হচ্ছে না বা হওয়া সম্ভব নয়। ইমোশান কি বার বার আসে? তাছাড়া তার বক্তব্য—ছবির এই রকম একটা নাটকীয় জায়গা, এখানে অ্যাকটিং ফেল করার অর্থ স্রেফ ডুবে যাওয়া।

অপর্ণা এইসব শুনতে শুনতে হঠাৎ এক সময় পরিচালককে বললেন,

দেখুন, আপনি বৃথা ভয় পাচ্ছেন। এত যে ইমোশান ইমোশান করছেন, ওটা কিন্তু আমার একদম আসে না। অন্তত: এইসব ক্ষেত্রে।

কাট টু কাট এবার দ'য়ে বসে যাওয়া পরিচালকের প্রতিক্রিয়া, তিনি কিছুটা অবিশ্বাসী সন্ধিগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর ছবির নায়িকার দিকে ফিরে তাকালেন। হা ঈশ্বর, যার জন্যে করি চুরি, সেই বলে চোর।

অপর্ণা যতটা সম্ভব হাসি মুখ রেখে বললেন—চোখের জল আমি বরাবর গ্লিসারিন দিয়েই ম্যানেজ করি। তাই সত্যিকারের চোখের জল আনা একটা অবান্তর প্রশ্ন। আর আবেগ? ওটা অভিনয় করার সময় একটা অঙ্কের হিসাব, প্রিটেণ্ড করা, এমনভাবে করা যেন সেটা রিয়াল বলে মনে হয়। অতএব যে ইমোশান আমার একেবারে আসে না, সেটা যাবারও কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। আপনি নির্ভয়ে টেক করতে পারেন, আমি প্রস্তুত......

এরপর আর কি কোন কথা ওঠে?

শট শুরু হলো।

চোখে গ্লিসারিন দিয়ে অপর্ণা সেন যথারীতি কেঁদে-কেটে অভিনয়ও করলেন। তা দেখে উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে অনেকেরই চোখে তখুনি জল এসে পড়ার উপক্রম হলো।

আসলে জেনারেশন-গ্যাপ অভিনয়ের ক্ষেত্রেও ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট ঘটে গেছে। যাঁরা তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম তাঁরা আধুনিক চলচ্চিত্র মনস্কতাকে সাগ্রহে মেনে নিচ্ছেন নতুন কিছু সৃষ্টির প্রত্যাশায়। আর যাঁরা পারছেন না তাঁরা শুধু নিজেরাই নিজেদের বিপদগ্রস্ত করছেন।

যেমন ধরুন সুলতা চৌধুরীর কথা।

সুলতা আমাদের বন্ধু পুরুষ হলে যতটা হতে পারত তার চাইতে ও কোন অংশেই কম নয়। আসলে ও খুব সপ্রতিভ বুদ্ধিমতী মেয়ে। বিয়ে একদা একটা হয়েছিল ওর কিন্তু পরে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। সুলতা এখন পৃথকভাবে বাস করে। মনের দিক থেকে অনেক বেশী আধুনিকা

সুলতা। তার কারণ অবশ্য এই নয় যে, ও ম্যাকসি পরে, মিনি পরে, লুঙ্গি পরে, বেলবট পরে, প্যাণ্ট পরে, শার্ট পরে, শাড়িও পরে এবং বোম্বে থেকে ওর একরাশ কালো চুল ডাই করেও স্রেফ সোনালী করে ফেলেছে বলে—আসলে বাঁচার কনসেপ্ট-টাই যে অধুনা বদলে গেছে, ও সেটা মোটামুটি জেনে গেছে। এবং সেই পরিবর্তিত প্যাটার্নের সঙ্গে চলতেও শুরু করেছে।

—সুলতা তুমি সিগারেট খাও?

—খাই। কখনো-সখনো।

—মদ খাও?

—নাহ্। ওটা বিচ্ছিরি। আসলে ওটা খাওয়ার কোন মানে হয় না। এই বলে সুলতা ভ্রূভঙ্গী করে বলবে—কেন? হঠাৎ এসব প্রশ্ন?

আমরা বলতেই পারি—সুলতা, 'মড' মেয়েদের সামাজিক দায়িত্বের ব্যাপারটা আমরা এইভাবে জরীপ করছি, তুমি আরও প্লাস। কারণ তুমি একজন এণ্টারটেনার ফিল্ম অ্যাকট্রেস······

সুলতা খুব আকর্ষণীয় মেয়ে। কারণ ওর চটক আছে—নানা ধরনের। আমার আরও মনে হয়, ওর মাথায় কিঞ্চিৎ ইয়ে আছে। বহু সুদর্শন ছেলে ওকে অতীতে প্রেম নিবেদন করেছে, এখনও করছে। সুলতা হাসে। এটা জীবনে সুখী হয়ে বেঁচে থাকার একটা বিশেষ খেলা বলেই তার নিশ্চিত মনে হয়েছে। তাই যে খেলার যা নিয়ম তা সে সহসা ভঙ্গ করতে চায় না। খেলা চলতেই থাকে,—ক্লান্ত পর্যুদস্ত হয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত।

আমরা হাসি।—সুলতা, তুমি কি করে ট্যাকল কর?

—কাকে?

—সেইসব প্রার্থীদের, যাদের তুমি ওবলাইজ করতে চাও?

—খুব সোজা। বলি—কম, লেটস হ্যাভ ড্যান্স······

সুলতা দিশী বিলিতি—নানা নৃত্যে পারদর্শিনী। বয় ফ্রেণ্ডদের দিয়ে দুবার ফ্লেমিঙ্গো নাচালে প্রেম তাদের একদিন আপসে কর্পূর হয়—এটা সুলতার স্টাডি। আসলে সুলতা হৈচৈ হুল্লোড় করে ব্যস্ত থাকতে

চায়। ও বলে, এসব না করলে আমি মরে যাব। আসলে, এইভাবে ও জীবনের গূঢ় সমস্যাগুলোকে পাশ কাটাতে চায়। কত প্রবলেম, কত দুঃখ, কত যন্ত্রণা—মানুষ যত নিঃসঙ্গ হয়, ওগুলো মানুষকে ততই চেপে ধরে।

কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি, সুলতা কলকাতা থেকে যেন হঠাৎ হঠাৎ উধাও হয়ে যাচ্ছে। একদিন স্টুডিওতে চেপে ধরতে ও বলল, ভয় নেই, আমি একা একাই যাই। কলকাতা যখন একেবারে বিস্বাদ লাগে, এখানকার পাগলামো যখন ভীষণ অসহ্য হয়ে ওঠে—তখন কাউকে কিছু না বলে পালাই।

—কোথায় যাও?

— দিল্লী, সিমলা, কাঠমুণ্ডু, যেদিকে যখন মন চায়—

—তুমি সুন্দরী মেয়ে, একা যাও কোন সাহসে?

সুলতা হেসেই কুটিপাটি।—আরে ভাই, হম হ্যায় এক ফিল্ম অ্যাকট্রেস, হম কিসিকো নজদিগ আনে ভি নেহি দেতা, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্লেনে যাই, এয়ারপোর্ট থেকে সোজা চলে যাই ভাল একটা হোটেলে, তারপর দুচার দিন মঁজে মে ঘুমতা-ফিরতা, তারপর আবার কলকাতা, আবার স্টেজ, আবার স্টুডিও, শুটিং। এই নিয়ে আছি, এই নিয়েই থাকবো।

বাইরের মানুষের ধারণা, ফিল্ম লাইনের ছেলেমেয়েরা বুঝি সারাক্ষণ একটা মজার-মজার রোমান্টিক পরিবেশের মধ্যে কাটায়। ভুল, ভীষণ ভুল। ফিল্ম একটা কাজের জায়গা। বরং অন্য যে কোন জিনিসের চাইতে বেশী সিরিয়াস কাজের ক্ষেত্রভূমি। এখানে রোমান্সের সময় কোথায়? ওটা বোম্বেতে খুব শোনা যায়। আমি কিন্তু ওখানে এক সময় বেশ কিছুদিন এক নাগাড়ে থেকে বুঝেছি, যত ঘটে—তার বেশী রটে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে 'গট-আপ' হয়। অল ইণ্ডিয়া মার্কেট ওদের, স্ক্যাণ্ডাল রটলে পাবলিসিটি বেশী পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে পয়সা খরচ করেও এইসব পাবলিসিটি করা হয়। যেখানে অবশ্যই—মিঞা বিবি রাজী তো কৌন পুছতা কাজী?

একবার একটা ছবিতে বোম্বের সবিতা চ্যাটার্জি এসেছিল কলকাতায়।

সে ছবির অন্যতম প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছিল আমাদের দিলীপ রায়। এখন সবিতা নামেই বাঙ্গালী, তবে পুরোপুরি বোম্বাই ফিল্মের মেয়ে। বেশীক্ষণ এক নাগাড়ে বাংলা বলতে পারে না, হিন্দী হঠাৎ হঠাৎ ঢুকে পড়ে। খুব প্রাণোচ্ছল। সারাক্ষণ হৈ-হুল্লোড় করে কাটায়। আমরা দিলীপকে টার্গেট করলাম। দিলীপ ব্যাচেলার। তবে একেবারে কনফার্মড নয়। বিয়ে-শাদির ইচ্ছে আছে, তবে ও নাকি এখনও ওর মনের মত মেয়ে খুঁজে পায় নি। হায়, আর কবে পাবে?

আমরা কজন দিলাম সবিতাকে বেশ ভাল করে উস্কে।

ব্যাপারটা বেশ মজার। অতএব সবিতাও উৎসাহের সঙ্গে লেগে পড়ল। মাধবী তখনও মুখার্জি। তাঁকেও বলা হল। মাধবী সহাস্যে আমাদের স্কীম অনুমোদন করলেন। আমরা শুভ মুহূর্ত দেখে আরম্ভ করে দিলাম।

আউটডোরে গিয়ে দিলীপ একদিন ভ্রূ-ভঙ্গী করে হঠাৎ বলল—ভাই, ব্যাপারটা কি বলতো?

—কি ব্যাপার।

দিলীপ ক্ষিপ্ত তার স-দাপট প্রশ্ন—তোরা সবিতাকে কি বুঝিয়েছিস?

—কিচ্ছু না।

—কিচ্ছু না? দিলীপের সন্দিগ্ধ চাউনি।

—হ্যাঁ। কেন, কি করছে সবিতা? আমাদের নিরীহ উত্তর।

—যেমনটি তোমরা ওকে শিখিয়েছ।

—আরে আমরা কি শেখাব!...মেয়েটি কিন্তু ভাল।

দিলীপ চটে লাল।—তাতে আমার কি?

একজন নিরীহভাবে বলল—আহা চটছ কেন? তোমার ওপর বাস্তবিক ওর যদি কোন দুর্বলতা এসে থাকে, সেটা নেগলেক্ট করা উচিত হবে না।

দিলীপ আরও ক্ষিপ্ত হয়ে আমাদের কিছু কড়া কড়া বাক্য দিল। ফলে কেসটা শুরুতেই কেঁচে গেল। আমরা তখন সবিতাকে ধরলাম—কি গো তোমার এই এলেম? এই তুমি বোম্বাইয়া?

সবিতা বলল—আরেঃ, হামে কেয়া কসুর ? দিলীপদা হ্যায় এক ব্রেমচারী, হামে ভি ব্রেমচারিণী বনানে কোশিস কি···

অথচ সে-ছবিতে সবিতা যে চরিত্রে অভিনয় করছিল সেটা ছিল একটু স্বতন্ত্র ধরনের। দিলীপ অভিনীত বোকা-সোকা সুদর্শন চরিত্রকে সবিতা তার রূপ-যৌবনে প্রলুব্ধ করে শেষ পর্যন্ত এমন কোণঠাসা করে ফেলবে যে ছেলেটি একদিন একটা মারাত্মক স্বীকারোক্তিতে বাধ্য হবে। সে তখন মেয়েটিকে অকপটে একটা গোপন তথ্যের কথা খুলে বলবে। ব্যস, তারপর ক্লাইমেকস এসে যাবে ছবিতে।

ইন রিয়ালিটী সবিতা যে দিলীপকে সেই একই পদ্ধতিতে ট্যাপ করবে, প্রথমে দিলীপ তা ভাল বুঝতে পারেনি। যখনই সন্দেহ হয়েছে, বোম্বেওয়ালী চরিত্রের দোহাই দিয়ে সটকেছে। কিন্তু বাড়াবাড়ি হতে ব্যাপারটা দিলীপ ধরে ফেলতে বাধ্য হল। মনে হয় তারপরই ওকে ব্রেমচাবিণী হবার নিশ্চিত কিছু উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কেন দেওয়া হয়েছিল, সেটা আজও আমার কাছে একটা বিস্ময়। আচ্ছা, এর চেয়েও যেটা নির্ঘাৎ বিস্ময় সেটা নিশ্চিতই অপেক্ষা করে আমাদের অনুপকুমার সম্পর্কে। এখন উনি ফিল্ম লাইনে প্রায় প্রতিটি নায়িকার দাদার ভূমিকায় নিশ্চিন্তে খানিকটা জেগে, খানিকটা ঘুমিয়ে রয়েছেন। অথচ অনুপকুমারের সান্নিধ্যের জন্য এককালে মেয়েদের কম ইণ্টারেস্ট ছিল না, কিন্তু তাতে স্বয়ং ওঁর ইণ্টারেস্টের-ই অভাব দেখে তারা হতাশ হয়ে হয়ে আর কি, শেষে বেহাত হতে বাধ্য হয়েছে। অথচ আমি জানি, ফিল্মের ছেলেমেয়েরা কেউ কারো প্রেমে পড়েছে শুনলে অনুপকুমার তাদের ফ্রী-তে নানা পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এটা নিশ্চয় করবে, ওটা খবর্দার করবে না—এহেন টেণ্ডার কেয়ার এক অনুপকুমার ছাড়া আর কে নেবেন ? এই আত্মভোলা মানুষটি সম্পর্কে আমাদের সব বিষয়েই নানা শ্রদ্ধা, কেবল এই একটি ব্যাপারে ওঁর পিছুহটা নীতিটা কেন জানি না আমার, আমাদের ঠিক পছন্দ হয় না।

আর রঞ্জিত মল্লিক ? ইনসাল্লা। সে বেচারি তো ফিল্মের নায়িকাদের

ভয়েই তটস্থ। সারাক্ষণ একটা রেজিস্ট্যান্স দিয়ে দিয়ে বেড়াচ্ছে। কবে যে খপ্পরে পড়বে, সেকথা ভেবে ভয়ে আমরাই কাঁটা। জাগো বাঙালী।

তখন শীতকাল, আমরা একটা ছবির আউটডোর শুটিং করতে বাইরে গেছি। একটা বাঁধের সংলগ্ন পাহাড়ের টিলার উপর একটা বেশ সুন্দর সাজানো গোছানো ইন্সপেকশান বাংলো, তাতে ছবির সব শিল্পীরা উঠেছেন, আর আমরা উঠেছি সরকারী কর্মচারীদের জন্যে তৈরী কয়েকটা তখনও-পর্যন্ত-খালি কোয়ার্টার্সে। এমনিতেই নির্বান্ধব পুরী, পূর্ত বিভাগের কয়েকজন অফিসার ফ্যামিলি নিয়ে সেখানে সারা বছর পড়ে থাকেন, আমাদের আগমনে তাঁরা খুব খুশী। যাক, এই বৈচিত্র্যহীন জীবনে তাঁদের অন্তত গল্প করার মানুষজন জুটে গেল কয়েকটা দিনের জন্যে। তাই ওঁরা খুব সাগ্রহে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন, বলে দিলেন—আপনারা সবরকম সহযোগিতা পাবেন, যখন যেটা আপনাদের দরকার, একটু আগেভাগে বলে পাঠাবেন, আমরা সাধ্যমত ব্যবস্থা করে দেব।

দিন ছ'য়েকের মধ্যে কলকাতা থেকে কিছু ট্রেনে আর কিছু ভ্যানগাড়ীতে প্রায় চল্লিশজন শিল্পী আর কলাকুশলী সেই লোকেশানে পৌঁছে গেলেন। দেখতে দেখতে জায়গাটা বহিরাগত সব মানুষের কলরবে সরগরম হয়ে উঠল। তাবড় সব শিল্পী সেই ছবিতে অভিনয় করছেন। মাধবী দেবী, পদ্মা দেবী, অনুপকুমার, বিকাশ রায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, জহর রায়। এর মধ্যে অনুপকুমার আর জহর রায় স্টেজের আর্টিস্ট। সপ্তাহে তিনটি দিন এঁদের কলকাতার মঞ্চে গিয়ে দাঁড়াতেই হবে। তাই ওঁরা কলকাতা থেকে দেড় দুশো মাইলের মধ্যে কোন ছবির শুটিং পড়লে এমন ব্যবস্থা করে নেন যাতে অন্তত স্টেজটা কামাই না হয়। ধরুন বুধবার সারাদিন শুটিং করে ওঁরা লোকেশানে রাত্রের খাওয়া-দাওয়া সেরে গাড়ীতে উঠে বসলেন। তারপর বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতায় পৌঁছে গেলেন। এরপর স্টেজে সন্ধ্যের শো শেষ করে সঙ্গে সঙ্গে

অপেক্ষামান গাড়ীতে চেপে বসলেন। এবং সারারাত ড্রাইভ করে পরদিন ভোরবেলায় লোকেশানে পৌঁছে গেলেন। শুক্রবার সারাদিন লোকেশানে কাজ করে ওরা আবার সেদিন রাত্রে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। তারপর শনি আর রবিবার স্টেজ শো শেষ করে আবার গাড়ী, আবার লোকেশান। ভাবুন কি ঝঞ্ঝাট। কিন্তু যাঁরা স্টেজ এবং ফিল্ম, এ দুটোই করেন, তাঁরা কিন্তু এই ব্যাপারে খুব অভ্যস্থ। এ আমি নিজের চোখে অনেকদিন ধরে দেখে আসছি।

কি বলব, এই তো সেদিনের কথা, হাজারীবাগ ন্যাশনাল পার্কে একটা বাংলা ছবির শুটিং করছিলাম। সে-ছবিতে স্টেজ আর্টিস্ট ছিলেন তিনজন, তরুণকুমার, শেখর চ্যাটার্জি আর বঙ্কিম ঘোষ। কোথায় হাজারীবাগ আর কোথায় কলকাতা! ওঁরা কিন্তু নির্বিকার। এই যাতায়াতটা ওঁদের কাছে যেন কোন ব্যাপারই নয়।

বুড়োদাকে (তরুণকুমার) একদিন প্রশ্ন করেছিলাম—আচ্ছা, এই যে রাত-বিরেতে ঠেঙ্গিয়ে যাতায়াত কর, রাতে ঘুমোও কখন ?

—কেন? গাড়ীতেই ঘুমিয়ে নিই। আরে বাবা, ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়ে নিতে পারলেই তো শরীর ফের যে-কে-সেই তাজা। আর তাছাড়া অনেকদিন ধরে করছি তো এখন আর তেমন কষ্ট হয় না, সয়ে গেছে।

শেখর চাটুজ্যে তো এসব গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না। বঙ্কিম ঘোষও তাই।

তা আমাদের এই ছবির লোকেশান কলকাতা থেকে তো মাত্র দুশো মাইলের মধ্যে। গাড়ীতে মাত্র কয়েক ঘণ্টার স্টেডি ড্রাইভ। তবে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড বরাবর রাত্রে গাড়ী চালানো কিন্তু খুব ভয়ের। কারণ রাত্রের দিকেই দুনিয়ার যত হেভি হেভি লরি কনভয় যাতায়াত করে, টেরিফিক স্পীডে। একবার হেড অন কলিশন হলে আর রক্ষা নেই, স্রেফ ছাতু! গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোডে যাঁদের রাত্রে গাড়ী চালাবার অভিজ্ঞতা আছে, একমাত্র তাঁরাই আমার এই কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন। বেশী কি, ধানবাদের কাছে আমিই একবার প্রায় লড়িয়ে দিচ্ছিলাম, ঈশ্বর

নিতান্ত সহায়, সে যাত্রা এক চুলের জন্যে বেঁচে গিয়েছিলাম। আর তারপর থেকে আমি জি টি রোডে রাত্তির বেলায় কখনও হুইল ধরি না। কসম। তারপর ইদানিং হাইওয়ে ডাকাতি হচ্ছে বলে শুনছি। রোড ব্লক করে গাড়ী আটকে লুটপাট খুন জখম শুরু হয়েছে নাকি! তাই, যাঁরা অন রোড রাত্রে ড্রাইভ করবেন, তাঁদের প্রতি আমার পরামর্শ, বড় জোর রাত এগারোটা, তার বেশী একদম নয়। সোজা কোন ওয়েসাইড খাটিয়া হোটেলে গাড়ী লাগিয়ে টান টান হয়ে যাবেন, কিন্তু বেশী রাত্রে গাড়ী চালাবার রিস্ক একেবারেই নেবেন না। বিশেষ করে সঙ্গে যদি মেয়েরা থাকেন। বায়োস্কোপের লাইনের মানুষ বলে আমার পরামর্শ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উড়িয়ে দেবেন না, তাতে নিজের বিপদ হয়ত নিজেই ডেকে আনা হবে। বোম্বেটেদের পাল্লায় পড়লে সোজা ঘুঁসড়ির ট্যাঁক বরাবর হয়ে যেতে পারেন।

কথা না শুনলে দেখুন অবস্থা কি দাঁড়ায়। আমি নাম করব না, আমাদের কলকাতার ফিল্মের একজন টপ হিরোইন একবার অন রোড বোম্বে যেতে মনস্থ করলেন। উনি তখন ওখানে দু-একখানা হিন্দী ছবিতে অভিনয় করছিলেন। আর তাঁর সেই সিদ্ধান্তের কথা শুনে প্রথমে বন্ধু-বান্ধবরা নিষেধ করলেন—আরে তোমার মাথা খারাপ নাকি? বারশো মাইল ড্রাইভ করে যাবে? কি দরকার, তার চেয়ে যেমন প্লেনে যাতায়াত করছিলে সেই প্লেনেই চলে যাও, অনর্থক কেন স্ট্রেন করবে?

নায়িকা বড়ই জিদ্দি। কোন কিছুতেই তাঁর যেন ভয়-ডর নেই। হেসে বললেন—যাই না একবার। একটা অভিজ্ঞতা তো হবে—

সবাই অবাক।

—রাস্তায় কত রকম বিপদ আপদ ঘটতে পারে, দু'এক ঘণ্টার ড্রাইভ তো নয়, পাক্কা আড়াই থেকে তিন দিনের পথ, এতে কত পাহাড়, পর্বত, ঘাট সেকশান, ব্রীজ, নদী পড়ছে। তাছাড়া সব জায়গায় ভাল হোটেলও নেই। রাত্রে যদি সেরকম কিছু না পাও, থাকবে কোথায়? খাবে কোথায়? আর আর সব সারবে কোথায়?

নায়িকা হেসে সবার কথা উড়িয়ে দিলেন, তিনি যাবেনই।

তখন নায়িকার স্বামী বললেন—ও, কে, আমি সঙ্গে যাব।

কলকাতার একজন নামজাদা পরিচালক, যাঁর সঙ্গে এই নায়িকার খুব বন্ধুত্ব, তিনি বললেন—তাহলে আমিও যাব। বোম্বেতে আমায় এমনিই যেতে হত—একটা বিশেষ কাজে, তাহলে তোমাদের সঙ্গেই বেরিয়ে পড়া যাক। হৈ হৈ করতে করতে সময় কেটে যাবে, বেশ ভালই হবে—

তখন যাত্রার একটা দিন স্থির হল।

নির্ধারিত দিনে ওঁরা তিনজন খুব উৎসাহের সঙ্গে কলকাতা ছাড়লেন। গাড়ীর ট্যাঙ্ক পেট্রোলে ফুল লোড, সঙ্গে অপর্যাপ্ত খাবার-দাবার।

প্রথম রাত্তিরটা বেশ ভালয় ভালয় কাটল। আসলে ওঁরা রাত্রের দিকে বেশী ড্রাইভ করে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় বেরিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। বিশ্রামটা নিচ্ছিলেন দিনের বেলায় যখন মাথার ওপর সূর্য গনগনে রাস্তার পীচ গলে প্রায় জল হবার দাখিল।

মধ্যপ্রদেশে ঢুকলো গাড়ী।

একটা মাঝারি হোটেলে দিনের বেলায় বিশ্রাম নিয়ে ওঁরা বিকেলে গাড়ী স্টার্ট দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়ী চম্বল এলাকায় ঢুকে পড়ল। ওঁরা রোড ম্যাপ দেখে জায়গাটা ঠাহর করেছিলেন, কিন্তু ওই যে, সব সময় একটা 'ডোণ্ট কেয়ার' ভাব, নায়িকার স্বামী তখন হুইলে, তিনি এট্টুখানি খুঁৎখুঁৎ করে চেপে গেলেন।

সন্ধ্যা নাগাদ একটা শহর দেখে ওঁরা গাড়ী থামালেন। এবার একটু চা-টা খেতে হয়।

একটা হোটেলের সামনে গাড়ী লাগিয়ে ওঁরা যখন চা খাচ্ছেন তখন হোটেলের মালিক কৌতূহলী হয়ে জিগ্যেস করল—আপনারা স্যার আসছেন কোত্থেকে ?

—কেন ?

—না, আপনাদের বিদেশী বলে মনে হচ্ছে, তাই জিগ্যেস করছি—

—আমরা কলকাতা থেকে আসছি।

—ও। তা যাচ্ছেন কোথায়?

—বোম্বে।

—এই গাড়ীতে?

—হ্যাঁ।···কেন?

হোটেল মালিক ইতস্তত করে বলল—দেখুন স্যার, আমাদের এই ভিণ্ড জেলায় রাত্রে কেউ প্রাইভেট গাড়ী চালায় না। একমাত্র লরী চলে। তাও ওরা দল বেঁধে যাতায়াত করে।

—কেন বলতো? কিসের এত ভয়?

হোটেল মালিক ফিস্‌ফিস্ করে বলল—বাগী'র ভয়।

—হোয়াট বাগী?

—বাগী মানে ডাকাত। চম্বলের ডাকাতের কথা কখনও শোনেন নি? বড় খতরনাক।

নায়িকা তাচ্ছিল্যের হাসি দিলেন লোকটিকে।

—দেখ, আমরা কলকাতার লোক তোমাদের বাগীরা আমাদের কাছে আসতেও সাহস পাবে না। তোমার চায়ের দাম কত হয়েছে তাই এখন বল—

হোটেলের মালিক তবুও বলল—আপনারা ভুল করছেন। রাত্রে গাড়ী চালাবেন না। ওরা মানুষের জান নিতেও দ্বিধা করে না। রূপার নাম শুনেছেন? ছেদ্দা মাখন? মোহর সিং? এখন ওদের তল্লাটের মধ্যে দিয়ে আপনাদের যেতে হবে—

পরিচালক ভদ্রলোক সব শুনে নার্ভাস হয়ে নায়িকাকে বললেন—এরা এত করে যখন মানা করছে তখন না যাওয়াই ভাল। আজ রাতটা এখানে কাটিয়ে কাল ভোরে বরং—

তাঁর কথা শেষ হল না, তার আগেই নায়িকার সেকি হাসি—কি হল, ভয় পেয়ে গেলে? এই তোমাদের সাহস?

পরিচালক মহা অপ্রস্তুত।

—আরে শোন শোন, ফালতু বীরত্ব দেখিয়ে লাভ কী? পথে সত্যি সত্যিই যদি একটা বিপদ হয় তো—

—হয় হবে। অ্যাডভেঞ্চার করতে বেরিয়ে শেষে হাত-পা গুটিয়ে তো বসে থাকা যায় না। কপালে তেমন বিপদ লেখা থাকলে ফেস্ করতেই হবে—

স্বামী বেচারি 'হুম' শব্দ করে উঠেই বাকি কথাটা গিলে ফেললেন।

গাড়ী আবার গর্জন করে উঠল। হেড লাইটের উজ্জ্বল আলোয় কালো অজগর আবার দৃশ্যমান হয়ে উঠল। রাস্তার দুধারের গাছপালা পিছলে পিছলে বেরিয়ে যেতে শুরু করল।

রাত বাড়ছে। গাড়ীও দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে, ভিণ্ড জেলার মধ্যে দিয়ে। এরপর কিছুক্ষণের মধ্যে পড়বে মোরেনা জেলা।

রাত দুটো।

দূরে দেখা যাচ্ছিল রাস্তায় আড়াআড়ি করে কি যেন একটা পড়ে আছে।

নায়িকার স্বামী স্পীড কমিয়ে দিলেন।

পরিচালক শুধু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—ইঞ্জিন একেবারে বন্ধ করবেন না যেন।

চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। রাস্তার দুপাশে পাহাড়ের দেয়াল। যতদূর দৃষ্টি যায় লোকালয়ের কোন চিহ্ন চোখে পড়ে না।

কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়ীটা এসে দাঁড়াল। মাল বোঝাই একটা বয়েল গাড়ী রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে। অদূরে দুটি মোষ ঘাস খাচ্ছে। গাড়োয়ানের পাত্তা নেই।

নায়িকার স্বামী জোরে জোরে হর্ন বাজালেন কয়েকবার। উঁহু কোন সাড়া শব্দ নেই। হেডলাইটের তীব্র আলোর দিকে মোষ দুটি কিছুক্ষণ অবাক চোখে তাকিয়ে থেকে আবার ঘাসে মনোযোগ দিল। তবু গাড়োয়ানের দর্শন পাওয়া গেল না।

পরিচালক বললেন—ধুত্তোরি, দাঁড়ান, দাঁড়ান, নেমে দেখি ব্যাপারটা কি। নইলে হবে না। মনে হয় আশে-পাশে কোথাও—

নায়িকা বললেন—বয়েল গাড়ীটা ঠেলে দিলেই তো রাস্তা ফাঁকা হয়ে যায়।

স্বামী ভদ্রলোক নামতে নামতে বললেন—সেটাই ভাল, চলুন মশায় ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিই—

দুজনে এগিয়ে এসে বয়েল গাড়ীতে হাত দিয়েছেন কি দেব দেব ভাবখানা, হঠাৎ গাড়ীর সামনে থেকে একটা লোককে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। মধ্যপ্রদেশের সাধারণ একজন চাষীকে যেমন দেখায়।

লোকটা প্রথমে একটা হুঙ্কার দিল। তারপর গাড়ীর ভেতর থেকে একটা রাইফেল বের করেই তার সেফটি ক্যাচ খুলে ফেলল।

গাড়ীর ইঞ্জিন তখন ধ্বক ধ্বক করে চলছে।

পরিচালক ভয়ে আড়ষ্ট।

নায়িকার স্বামীরও তথৈবচ অবস্থা।

শুধু নায়িকা অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন লোকটির দিকে।

দেখা গেল, যেন পাহাড়ের দেয়াল ভেদ করে একে একে লোক বেরিয়ে আসছে। হিংস্র ক্রূর দৃষ্টি, বলিষ্ঠ চেহারা, প্রত্যেকের গায়েই খাঁকী শার্ট পরনে ধুতি, হাতে একটা করে রাইফেল। আর কাঁধে ঝুলছে একটা করে থলে।

ওরা নিঃশব্দে এসে ঘিরে দাঁড়াল এঁদের।

—সঙ্গে যা যা আছে চটপট বের করে দাও।

একে একে সবই দিয়ে দিতে হল। টাকা, পয়সা, ঘড়ি, নায়িকার গায়ের দু-একখানা অলংকার বলতে যা ছিল সবটাই, ট্রানজিস্টার রেডিও, শাড়ী আর কাপড়চোপড়ের বড় বড় দুটো চামড়ার স্যুটকেশ এবং—

—ওটাও চাই, ওটা লুকোচ্ছো কেন বিরাট এক হুঙ্কার।

পরিচালক ভয়ে ভয়ে বললেন—দুটো বোতল আছে, অন্তত একটা আমাদের যদি দিয়ে যাও—

—কেন, একটা দেব কেন? একটা দিয়ে কি হবে?

—না মানে, আমাদের এখন যা নার্ভের অবস্থা তাতে, মানে…

লোকটি হো হো করে হেসে উঠে বলল—ওটা খাবার জন্যে তোমরা বেঁচে থাকবে ভেবেছো? আরে বাহ্, বাঙালীদের মাথা বড় সাফ—

তবে এরাই সেই বাগী? এদের আতঙ্কে পুলিশও মুক্তকচ্ছ?

নায়িকা হঠাৎ হেসে উঠলেন খিল খিল করে। আর তা শুনে লোকটির কি চমক—হাসছো কেন?

—হাসছি তোমাদের ব্যাপার দেখে। তুমি দেখছি ভাল অ্যাকটিং করতে পার। সিনেমায় নামবে? চাইলে ব্যবস্থা করে দিতে পারি—

লোকটি ভীষণ অবাক। এই আউরৎ তো আজীব ধরনের কথা বলে।

লোকটি যথাসম্ভব তার ক্রোধ বজায় রেখেই হঠাৎ বলল—হাসি বেরিয়ে যাবে, আমার নাম শুনেছো?

—তোমার নাম? কি, রূপ সিং? ছেদ্দা মাখন? মোহর সিং? এই তিনজনের একজন হবে বড়জোর। ও আর শুনে কি হবে? যারা নিরস্ত্র মানুষের যথাসর্বস্ব লুট করে নিয়ে আবার খুনের হুমকি দেয়, তাদের নাম জেনে লাভ কি? ও জানা আর না জানা—এক কথা। নায়িকার কণ্ঠে রীতিমত শ্লেষ ঝরে পড়ল।

কি হল, হঠাৎ লোকটির কেমন যেন ভাবান্তর হল—নায়িকার ওই কথায়, তার কথা বলার ঢং-এ। হঠাৎ লোকটি বিরাট একটা চিৎকার করে ঠেঁট হিন্দীতে ওর লোকজনদের কি যেন নির্দেশ দিল। আর লোকগুলোও নিজের রাইফেল পিঠে ঝুলিয়ে দৌড়ে গিয়ে বয়েল গাড়ীটাকে রাস্তার একপাশে সরিয়ে রাখল।

হেড লাইটের আলো আবার কালো অজগরের পিঠে কেমন যেন চমকে উঠল।

পরিচালক দেখলেন, গাড়ীটা সরিয়ে দিয়ে লোকগুলো আবার অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে, ঠিক যেমন তারা এসেছিল। এরপর আসল লোকটি হাতের দুটো বোতলের একটি আচমকা গাড়ীর সীটে ছুঁড়ে দিয়ে বলল—এই ফেরৎ দিলাম। আমি যাচ্ছি, এবার যত তাড়াতাড়ি পারো এ জায়গা থেকে তোমরা কেটে পড়—

নায়িকার স্বামী আর পরিচালক দৌড়ে গিয়ে গাড়ীতে ঠেলে উঠলেন।

লোকটি বলল—শুনে রাখ, আমার নাম রূপ সিং, আমি অকারণে মানুষ খতম করি, কারণ তাতে আমি বেশ আনন্দ পাই, কিন্তু কোন সান্‌দার আউরৎকে কখনও মারি না। যাও—

গাড়ী চোখের নিমেষে তিন কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েই দিয়েছে ততক্ষণে, উর্ধ্বশ্বাসে···

জহর রায় এলেন সবার শেষে, সেই সঙ্গে অনুপকুমারও। তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। আর সেই সঙ্গে প্রচণ্ড শীত। পরিচালক জগন্নাথ চ্যাটার্জি ওঁদের আগমনের জন্যে গেটের সামনে অপেক্ষা করছিলেন।

পরস্পরে কুশল বিনিময় হবার পর জগন্নাথ চ্যাটার্জি বললেন—আপনাদের জন্যে আলাদা একটা ঘরের ব্যবস্থা হয়েছে, আপনি, অনুপকুমার আর হারাধন ব্যানার্জি।

হারাধনবাবু আগেই পৌঁছে গিয়েছিলেন।

ওখানে দাঁড়িয়ে পরদিনের শুটিং নিয়ে আলোচনা হল।

জগন্নাথ চ্যাটার্জি বললেন—আমায় আজ রাত থাকতে থাকতে উঠতে হবে—সূর্যোদয়ের একটা শট নিতে হবে। সবাইকে বলে রেখেছি। ভোরবেলায় ওই শট নেওয়ার পর একেবারে ব্রেকফাস্ট করে তবে দিনের অন্য কাজ আরম্ভ করা হবে—

জহর রায় বললেন—বেশ ভাল কথা, আমি তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে থাকব, আমার তো বেশী মেকআপ নয়। তা তুমি উঠেছো কোথায়?

জগন্নাথ চ্যাটার্জি পাহাড়ের উপরের দিকে একটা টিলার দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন।

ওখানে পাশাপাশি কয়েকটা সুন্দর বাংলো।—ওর মাঝের যে কোয়ার্টার, আমি ওখানে উঠেছি—

জহর রায় তখন বললেন—ঠিক আছে, আমার তো খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যায়, আমিই বরং তোমাকে জাগিয়ে দেব—

জগন্নাথ চ্যাটার্জি সহাস্যে বললেন—তাই দেবেন তো জহরদা আমি আবার একটু ঘুমকাতুরে—

এরপর সামান্য দু-একটা কথার পর সবাই যে যার ঘরে চলে গেলেন। শীতের ঠ্যালায় সবার প্রায় কাঁপুনি ধরে গিয়েছিল।

কাট-টু-কাট—রাত সাড়ে তিনটে। ঘুমন্ত কলোনী হঠাৎ বিকট এক গানের ঠ্যালায় ধড়মড় করে উঠে বসল। সবাই শুনলো জহর রায় পাহাড়ের একটা টিলার ওপর দাঁড়িয়ে তারস্বরে একখানি কালোয়াতি গান ধরেছেন—জাগো জাগো নগরবাসী, আমি এক পরবাসী, জাগো জাগো নগরবাসী। উঃ, কি তার গমক, ঝোঁকটা নগরবাসীর দিকেই যেন বেশী।

গোটা ইউনিট জেগে গেল-ওই গানের গুঁতোয়।

মাধবী নিজের ঘর থেকে চেঁচিয়ে সাড়া দিলেন—জেগেছি জেগেছি, অমন আকুল সুরে আর গান গেও না গুণী—

সঙ্গে সঙ্গে গুণীর কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেল।

সকাল নটা নাগাদ ওখানকার পূর্ত বিভাগের সবচেয়ে বড় যে অফিসার, তিনি নিজে এসে হাজির। মুখখানা তাঁর থমথম করছে।

তিনি জগন্নাথবাবুকে ডেকে বললেন—দেখুন, আজ ভোরে একটা সিরিয়াস ব্যাপার ঘটে গেছে।

—কী বলুন তো? জগন্নাথ চ্যাটার্জি জানতে চাইলেন।

—আপনাদের মধ্যে কেউ ভোরবেলায় আমার কোয়ার্টারে গিয়ে দরজায় ভীষণ ধাক্কাধাক্কি করেছে। মশাই বাইরের ঘরে আমার বাবা মানে ওঁর বাষট্টি বছর বয়স হয়েছে, সর্দির ধাত, বিছানায় বসে বসে কাশছিলেন, তা সেই লোকটা গিয়ে তাঁকে কি বলেছে জানেন? বলেছে, নাও নাও আর ঢং করে কাশতে হবে না, এখন উঠে পড়। বলুন তো কি কাণ্ড? আমার বাবা ঢং করে কাশছিলেন? ছি ছি ছি। উনি যত বলেন—আপনি মশায় ভুল দরজা ধাক্কাচ্ছেন, লোকটা তত বলে, আরে রাখ রাখ। কোনটা ভুল আর কোনটা ঠিক—আমায় এই শেষ রাত্রে আর শেখাতে হবে না, এখন বাবা উঠে পড়, সূর্যিদেব উঠব উঠব করছেন,

হ্যাঃ—। আমার বাবা তো বিলক্ষণ চটে গেছেন। বুড়ো মানুষের ঘুম ভাঙিয়ে একি উৎপাত বলুন তো?

জগন্নাথ চ্যাটার্জি ব্যাপারটা বুঝলেন, এটা জহরদার কীর্তি, উনি উল্টো দিকের বাংলোয় গিয়ে ভুজ্জুত করে বসে আছেন। যাহোক, ইঞ্জিনীয়ার সাহেবকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিরস্ত করা হল। পরে জহর রায়কে বলতে তিনি বললেন—ও তাই বল, আমার তখনই কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল, জগন্নাথ আর যাই করুক, অন্ততঃ জ্বলন্ত বিড়ি ছুঁড়ে আমায় মারবে না। উঃ, বুড়োটা আমায় কি খিস্তি দিল, সক্কালবেলায় যত্তসব—

আমরা পাহাড়ে-জঙ্গলে রোজ শুটিং করে বেড়াই। ভোরবেলা ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে ফিরি সেই সন্ধ্যে নাগাদ। লোকেশানে বসে রান্নাকরা খাবার খাই। কলকাতা থেকে ভুবনঠাকুর তার পাঁচজন চেলা নিয়ে এসেছে লোকেশানে। দুবেলা একশো জনের খাবার রাঁধতে হয় তাদের। তাও এক ধরনের নয়, কেউ ঝাল বেশী খায়, কেউ ঝাল মোটে খেতে পারে না। কেউ মাংস ভালবাসে, কেউ আবার মাংসের নামও শুনতে পারে না। হাজারটা বায়নাক্কা।

এরই মধ্যে একদিন জহর রায়ের অফড়ে হয়ে গেল। সেদিন ওঁর লোকেশানে শুটিং নেই। আমরা সকালে বেরিয়ে গেলাম, ক্যাম্পে রয়ে গেলেন জহর রায়। সারাদিন তাঁর অখণ্ড অবসর।

আমরা সেদিন যখন ক্যাম্পে ফিরলাম তখন সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে। সারাদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমে তখন আর যেন কারো দাঁড়িয়ে থাকবারও শক্তি নেই। ক্ষিধেয় নাড়ি চুঁই-চুঁই করছে সকলের। ব্যবস্থা ছিল, লোকেশান থেকে ফেরবার সঙ্গে সঙ্গে সকলকে কিছু খাবার আর চা দেওয়া। তারপর একটু জিরিয়ে গা-হাত-পা ধুয়ে রাতের খাবার খেয়ে যে-যার বিছানায়। পরদিন ভোরবেলায় যে উঠতে হবে সবাইকে।

সেদিন ফিরে এসে ক্যাম্পের অবস্থা দেখে আমাদের তো চক্ষুস্থির! রান্নাবান্না কিচ্ছু হয়নি, পাঁচজন রাঁধুনীই বেহেড মাতাল, তারা তখনও

লুচি ভাজছে। বিরাট একটা কড়াইয়ে দালদা ফুটছে, একজন খুন্তি ধরে একটা টুলের ওপর বসে আছে স্ফূর্তির চোটে সে গান গাইছে, নীচে বসে একজন ময়দার নেচি কাটছে, একজন সেটা বেলে তোল্লা করে কড়াইয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে, আর একজন সেটা ভেজে তৎক্ষণাৎ পাশের বড় একটা ঝুড়িতে নামাচ্ছে। আসলে কিন্তু একটাও লুচি ভাজা হচ্ছে না। যে-ব্যাটা লুচি বেলে ছুঁড়ছে, লুচি যে কড়াই টপকে ওপাশের কয়লার গাদার ওপর গিয়ে পড়ছে, তা খেয়ালই করছে না। আর যার সেটা ভেজে তোলার কথা সেও যেন তৎক্ষণাৎ ভেজে তুলছে। সবাই দিশী গান ধরেছে—কতদিন ঘর যাওয়া হয়নি, বৌ রেগে কাঁই হয়ে আছে, এবার শাড়ী আলতা স্নো কিনে নিয়ে তবে যেতে হবে—এইসব হচ্ছে তাদের গানের বাণী। বুঝুন ঠ্যালা।

মুহূর্তের মধ্যে হল্লা হয়ে গেল।

ঠাকুরবৃন্দকে সামান্য একটু দাবড়াতেই তারা কেঁদে-কেটে কবুল করল, জহরবাবু তাদের ধরে মহুয়া খাইয়ে দিয়েছে। সকালে খাইয়েছে, দুপুরে খাইয়েছে, বিকেলে খাইয়েছে, সন্ধ্যেয় খাইয়েছে, আর রাতে একবার খাওয়াবে বলেছে।

শুনে আমাদের তো সকলের মূর্ছা যাওয়ার অবস্থা। জহরদাকে ধরতে তিনি তো হেসেই অস্থির, আহা, ওরা এত খাটাখাটনি করে এসব বলবর্ধক টনিক মাঝে-মধ্যে না খাওয়ালে ওদের ইঞ্জিন যে বার্স্ট করবে। তখন? তখন সামলাবে কে?

—তাই বলে আপনি মানে ওদের ইয়ে করলেন? এখন রাত্রে এই যজ্ঞি-বাড়ির রান্না কে রাঁধবে?

—আহা তোমরা ব্যস্ত হচ্ছ কেন,—ওরাই রাঁধবে, আগে লাস্ট ডোজটা দিয়ে দিই. দেখবে কেমন হাসতে হাসতে রান্নাবান্না করছে—বলে জহর রায় ঘড়ি দেখলেন—আর আধঘণ্টা পর।

শুনে ঠাকুরদের হাঁপুস নয়নে সেকি কান্না।

মেঝের ওপর পাশাপাশি তিনটে বিছানা। দু'পাশের দেয়াল ঘেঁসে

অনুপকুমার আর হারাধন বাঁড়ুজ্যে মাঝখানে জহর রায়। একদিন গভীর রাত্রে গোঁ-গোঁ বিকট এক ধরনের শব্দ শুনে তো অনুপকুমারের ঘুম ভেঙে গেল। অনুপকুমার তাড়াতাড়ি ঘরের আলো জ্বেলে দিলেন, তারপর যা দেখলেন তাতে তাঁর চক্ষুস্থির।

ঘুমন্ত জহর রায়ের দুটি পা ঠিক যেন সাঁড়াশীর মত হারাধন বাঁড়ুজ্যের গলায় চেপে বসেছে। আর ঘুমের ঘোরে হারাধন বাঁড়ুজ্যে ওই প্রাণঘাতী আওয়াজ ছেড়ে চলেছেন।

অনুপকুমার লাফিয়ে পড়ে দু'জনকে তফাৎ করে দিলেন—এই এই জহরদা—

—এঁ্যা এঁ্যা এঁ্যা ? জহর রায় হুড়মুড় করে উঠে বসলেন।

—আরে তুমি যে প্রায় শেষ করে ফেলেছিলে হারাধনকে। কি ব্যাপার বল তো ?

হারাধন বাঁড়ুজ্যে জেগে উঠে প্রবল আর্তনাদ—উঃ আমার দম প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, ভেরী ব্যাড়, ভেরী ব্যাড জহর—

জহর রায় ততক্ষণে ধাতস্থ হয়েছেন। সব শুনে বললেন—স্বপ্নে মারপিট করছিলাম হারাধন, ডোণ্ট মাইণ্ড, শালা রোজ এসে আমায় ঠুঁশো দিয়ে চলে যাওয়া, আজ জব্বর ধরেছিলাম ব্যাটাকে, ইস, ঘুমটা নেহাৎ ভাঙিয়ে দিলে নচেৎ ব্যাটাকে আজ জব্বর শিক্ষা দিয়ে তবে ছাড়তাম।

হারাধন বাঁড়ুজ্যে আর কোন কথা নয়, বিছানা বগলদাবা করে সোজা বারান্দায়।

জহর রায় চেঁচিয়ে বললেন—আরে ঘরে চলে এসো হারাধন, আর কোন ভয় নেই—

হারাধন বাঁড়ুজ্যে বিরস কণ্ঠে জবাব দিলেন—না তা ভরসাও অবশ্য আর নেই। রোজ ঘুমের ঘোরে লাথি খেয়ে খেয়ে ভাবতাম ওটা বুঝি আমারই মনের ভুল, আজ দমবন্ধ হয়ে মরবার উপক্রম হতে বুঝলাম—আর রক্ষে নেই, তোমার পাশে শুলে একদিন বেঘোরে আমার প্রাণটা যাবে। আমি আজ থেকে ভাই বারান্দাতেই শোবো।

অনুপকুমার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর জহর রায়কে প্রশ্ন করলেন —এখন আবার ঘুমোবে কি?

—ভাবছি, সবে তো রাত আড়াইটে বাজে—

—ঘুমোও, তবে সাবধান আমিও কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে একজনকে খুঁজছি, বুঝেছো, তাকে আমারও একটু শিক্ষা দেবার আছে। অতএব স্বপ্ন-টপ্ন যদি দেখোই, একটু সাবধানে দেখো—বলে অনুপকুমার লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

জহর রায়ের অভূতপূর্ব সব কীর্তিকলাপ নিয়ে লিখলে একটা গোটা বই হয়ে যায়। শিল্পী হিসাবে ওঁর যেমন তুলনা হয় না তেমনি ওঁর সেন্স অফ হিউমার। জহর রায় শিব্রাম চক্কোত্তির মতই কথার পানিং করতে ওস্তাদ। এ এক ধরনের বিশেষ ক্ষমতা, সব মানুষের মধ্যে থাকে না। জহর রায়কে আমি কখনও বিষণ্ন মুডে দেখিনি, একেবারে সদানন্দ পুরুষ, ইদানীং বয়স হয়েছে, শরীর একটু দুর্বল হয়েছে নতুবা অমন তাজা ছটফটে মানুষ বড় চোখে পড়ে না। 'বাইরে রোগা আর ভেতরে দারোগা' কথাটা যেন একমাত্র জহর রায়কেই শোভা পায়। আর ফিচলেমো বুদ্ধিতেও জহর রায় অসাধারণ। এর ওর পেছনে লাগতে উনি অদ্বিতীয়। শুটিং-এর সময় জহর রায়ের উপস্থিতি ফ্লোর বা লোকেশানে সকলের এনার্জির কাজ করে। শক্ত কাজে ফাঁকে ফাঁকে ওঁর রসিকতায় শিল্পী কলাকুশলীরা হেসে কুটিপাঠি হয়।

ফিল্মে ওঁর গোড়ার দিকের একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করি; তখন সবে লাইনে এসেছেন, ছোটখাটো কাজ করছেন, সব পরিচালকের কাছেই হাঁটাহাঁটি করছেন এমন সময় একদিন ওঁর বন্ধু, বিশু দাশগুপ্তের সঙ্গে গেলেন পরিচালক নরেশ মিত্রের সঙ্গে কথা বলতে। বিশু দাশগুপ্ত তখন নরেশ মিত্র মশায়ের প্রধান সহকারী। জহর রায়ের কথা উনি নরেশ মিত্রকে আগেই বলে রেখেছিলেন। নরেশ মিত্র বলেছিলেন—নিয়ে এস একদিন, কথা বলে দেখব।

নরেশ মিত্র তখনকার দিনের রঙ্গমঞ্চে বিরাট একটা ফিগার। একাধারে

শক্তিমান অভিনেতা এবং পরিচালক। উনি ওঁর 'নাঁকি' সুরে অভিনয়ের জন্যে বিখ্যাত এটা সবাই জানত। কণ্ঠস্বরের ওই ডিফেকট নিয়েও যে বেশ উঁচু জাতের অভিনয় করা যায় নরেশ মিত্তির তা প্রমাণ করে ছেড়েছিলেন। আর মানুষ হিসাবে উনি খুব রসিক প্রকৃতির ছিলেন।

বিশু দাশগুপ্ত একদিন দুপুরে জহর রায়কে নিয়ে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয় ওঁর অফিসে গিয়ে হাজির—নরেশদা এর নামই জহর রায়, আমি এর কথাই আপনাকে বলেছিলাম।

নরেশ মিত্তির তখন চোখ তুলে জহর রায়কে আপাদমস্তক দেখলেন। জহর রায় সেই দৃষ্টির সামনে কিন্তু কিন্তু হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। দেখা শেষ হতে নরেশ মিত্তির গম্ভীর নাঁকি সুরে বললেন—বসো।

বসা হল।

—কদ্দুর ?

—কি কদ্দুর ? জহর রায় অবাক হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

—লেখাপড়া ?

—ও লেখাপড়া ! বি-এ পাশ করেছি।

—থিয়েটার করা অভ্যেস আছে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কি কি বই করা হয়েছে শুনি ?

জহর রায় গড়গড় করে বলে গেলেন ওঁর অভিনীত নাটকের নামগুলো।

—অ।

এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল।

তারপর নরেশ মিত্তির তার সেই বিখ্যাত কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন করলেন—বায়োস্কোপে নামতে চাও বুঝি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—বিনয়ে যেন সাক্ষাৎ অবতার হলেন জহর রায়।

টেবিলের ওপর একটা ঐতিহাসিক নাটকের বই পড়ে ছিল। নরেশ মিত্তির তা থেকে একটা পার্ট খানিকটা পড়ে শুনিয়ে দিয়ে বললেন—এটা পড় তো দেখি। পারবে ? ঠিক আমি যে-ভাবে বললাম ?

—চেষ্টা করছি—বলে জহর রায় বইটি বাগিয়ে ধরে নরেশ মিত্তিরের সেই নাঁকি সুর অবিকল নকল করে বোঁ করে পার্ট-টা পড়ে দিলেন।

শুনে বিশু দাসগুপ্ত তো স্রেফ হিমক্রীম। সন্তর্পণে একটা বোম্বাই চিমটি কাটলেন জহর রায়ের গায়ে। ওদিকে নরেশ মিত্তিরমশায়েরও চক্ষু ছানাবড়া। যাই হোক তিনি এটা কল্পনাও করেননি। ধাতস্থ হতে তাঁর একটু সময়ও লাগল। তারপর বিশু দাশগুপ্তকে বললেন—না হে চলবে না। এ তুমি কাকে এনেছো? এ যে ভীষণ খচ্চর। তুমি এখুনি একে গেট আউট করে দাও—

বাইরে বেরিয়ে জহর রায়ের ওপর বিশু দাশগুপ্তর সেকি সাংঘাতিক চোটপাট।—এঃ, তুমি কেমন ধারা মানুষ হে? আমাকে শুদ্ধু ফাঁসাবার উপক্রম করেছিলে!

জহর রায় যেন কতই অবাক।—কি সব যে বলছো বুঝতে পারছিনে। আমার দোষটা কোথায়? উনি নিজেই তো আমাকে বললেন ওইভাবে পড়তে—

—তাই বললেন বুঝি? ক্রুদ্ধ বিশু দাশগুপ্তর পেল্লায় হুঙ্কার।

—আহা চটছো কেন? উনি বললেন—পারবে? ঠিক আমি যে-ভাবে বললাম! তাই তো আমি হুবহু নকল করলাম ওনার গলা, এখন দেখছি উল্টো কেস, এঃ—

নাঃ, নরেশ মিত্তির কিন্তু জহর রায়কে শেষ পর্যন্ত একেবারে বাতিল করে দিতে পারেননি। কারণ উনি এটা বুঝেছিলেন যে এই শিল্পী কালক্রমে একদিন বড় হবে। নরেশ মিত্তিরের কথা শেষ পর্যন্ত ফলেছে। তখন উনি ওঁর ছবিতে জহর রায়কে ছোটখাটো পার্ট দিতেন। জহর রায় সেখানেও নানা গণ্ডগোল করতেন। নরেশ মিত্তিরমশাইকে এক জহর রায় যেমনভাবে জ্বালাতন করতেন তা বোধ হয় আর কেউ পারতেন না বা সাহস করতেন না।

একটা ঘটনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি।

টালিগঞ্জের একটা স্টুডিওতে নরেশ মিত্র তাঁর 'বৌঠাকুরাণীর হাট'

ছবির বিরাট একটা সেট লাগিয়েছেন। তখনকার দিনে ওটা ছিল রীতিমত ব্যয়সাধ্য সেট কনস্ট্রাকশন।

সেই সেটে প্রথম দিনের কাজ আরম্ভ হতে চলেছে। সকাল থেকে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে স্টুডিওতে। প্রচুর লোক-লস্কর নিয়ে শুটিং। প্রোডাকশন ম্যানেজার যেন হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন, জিনিসপত্রের যোগান দিতে গিয়ে।` বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান জি, কে, মেহতা তাঁর সহকারীদের নিয়ে সেই বিরাট সেটে আলো তৈরী করছেন।

নরেশ মিত্তির সেদিন সকাল সকাল স্টুডিওতে এসেছেন। ফ্লোরে গিয়ে মেহতাজীজীর সঙ্গে কথা বলেছেন। মেহতাজী বলে দিলেন, কমপক্ষে ঘণ্টা দুয়েক লাগবে সেটের এই আলো রেডি হতে।

নরেশ মিত্তির নিজেও সেদিন ছবির আর্টিস্ট।

উনি তখন—বললেন—বেশ, আপনি তাহলে ওপাশের শুটিং জোন্-এর লাইট তৈরী করে রাখুন, আমি আগে ওপাশের শটগুলো নিয়ে নেব। তারপর লাইট ভেঙ্গে এপাশে আসব।

মেহতাজী বললেন—আজকে আর এপাশে আসতে পারবেন না। বরং কাল সকালে এপাশের লাইট করব।

নরেশ মিত্তির বললেন—ঠিক আছে, তাই হবে।

বলে তিনি মেকআপ রুমে চলে গেলেন। আর মেহতাজী সেটে আলোক-সম্পাতের কাজে কোমর বেঁধে লেগে পড়লেন।

বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে গেছে। মেহতাজী নিবিষ্ট মনে আলো করছেন, হাতে মিটার ধরে, এমন সময় ফ্লোরের অন্ধকার দিক থেকে হঠাৎ নরেশ মিত্তিরের গলা শোনা গেল—মেহতাজী ও মেহতাজী—

দূর থেকে মেহতাজী জবাব দিলেন—হাঁ জী।

—দেখুন, আমি চিন্তা করে দেখলাম ওপাশে আপনাকে আর লাইট করতে হবে না, আপনি বরং এপাশে আজ লাইট করুন—

মেহতাজী তাজ্জব।

—আপনে আভি বোলা পহেলা ইয়ে তরফ লাইট বনেগি ফির

বোলতা হ্যায় ওয়ো তরফ। আভি ম্যঁয় ক্যা করু বাতাইয়ে? এপাশে এত খেটে তাহলে লাইট করার কি অর্থ হলো?

নরেশ মিত্তিরের কণ্ঠস্বর ফের শোনা গেল।

—কি আর হবে, একটু বাড়তি খাটুনী হবে। আপনি ম্যানেজ করে নিন ভাই, এপাশে লাইট নিয়ে চলে আসুন। আমি যাই—

বলে নরেশ মিত্তির যেন যেমন এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন। আর মেহতাজী গজগজ করতে লাগলেন—এ যেন তামাশা হচ্ছে, এই এতক্ষণ ধরে এতগুলো লোক নিয়ে খেটেখুটে একটা আলো যাহোক দাঁড় করালাম এখন শেষ মুহূর্তে উনি এসে ভণ্ডুল করছেন। হায় ভগবান।··· চলো ভাই, লাইট নিয়ে এখন ওধারে চল—

সবাই বিরক্ত, সবাই ক্ষুব্ধ। কিন্তু নরেশ মিত্তিরের কথা কে আর অবজ্ঞা করার সাহস রাখে। নতুন শুটিং জোনে আবার লাইট করা শুরু হলো।

এমন সময় মেকআপ নিয়ে নরেশ মিত্তির ফ্লোরে এসে হাজির—কী মেহতাজী, আপনার লাইট রেডি হলো?

বিরস কণ্ঠে মেহতাজী জবাব দিলেন—কি করে হবে? এই তো মাত্তর দশ মিনিট আগে এসে বলে গেলেন আমাকে, নতুন জোন লাইট করতে, এখন পাক্কা এক ঘণ্টা সময় লাগবে!

নরেশ মিত্তির যেন আকাশ থেকে পড়লেন।—আমি দশ মিনিট আগে বলে গেলাম মানে? কি বলে গেলাম?

—বলে গেলেন ওখানে আজ আর লাইট করতে হবে না, এপাশে করুন—

—অ্যাঁ? আর্তনাদ করে উঠলেন নরেশ মিত্তির—বলেন কি মশায়, আমি তো সেই একবারই যা বলে গিয়েছিলাম—আর তো কিছু বলিনি। আপনি কি শুনতে কি শুনেছেন তার ঠিক নেই—

মেহতাজী দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করলেন।—আলবৎ আপনি বলে গেছেন। আর সেই জন্যেই তো আমরা—

—না আমি বলিনি। জেনেশুনে এরকম কথা আমি বলতেই পারি না। আপনি ভুল শুনেছেন—

—নেহি জী, হম ঠিক শুনা—

—হতেই পারে না মেহতাজী, আমি এতক্ষণ মেকআপ রুমে ছিলাম, ঘর ছেড়ে বাইরে একদম যাইনি—বলতে বলতে হঠাৎ উনি থমকে গেলেন, তারপর এক মুহূর্ত কি-যেন চিন্তা করলেন, ওঁর চোখ দুটি গোল গোল হয়ে উঠল, তারপর বললেন—হয়েছে, আমি বুঝতে পেরেছি সে শালা এসেছিল, জহর জহর, একমাত্র ওই খচ্চরটা আমার গলা হুবহু নকল করতে পারে··· দেখুন মেহতাজী, এবার থেকে আপনি আর আমার কণ্ঠস্বরে বিশ্বাস করবেন না। আমাকে দেখে তবে আমাব কথা বিশ্বাস করবেন। ওই খচ্চরটা কবে আমার যে বারটা বাজাবে, সেই ভয়েই মশাই দিন গুনছি, উঃ!

জহর রায় এসেছিলেন অন্য কি একটা কাজে। তারপর ঝোপ, বুঝে একটি মোক্ষম কোপ ঝেড়ে তিনি তখন কেটে গেছেন অন্যত্র, নরেশ মিত্রের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

কাহিনীটা এই রকম :

এক বাঙালী আঁতেল ভদ্রলোক গেছেন প্যারী বেড়াতে। সমস্ত দিন তিনি শহরের নানা জায়গায় ঘুরে বিষম ক্লান্ত হয়ে শেষে ঢুকলেন শহরের এক নামজাদা রেস্তরাঁয়। উদ্দেশ্য, কিছু চিবিয়ে খাবেন। রেস্তরাঁর ভেতর ঢুকে দেখেন; উরিপবাপ্, ভেতরে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। চেয়ার-টেবিল সব ভর্তি। নানা বয়সের স্ত্রী-পুরুষে বোঝাই। সকলেরই হাসিখুশী মুখ। আর একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক একটা উঁচু জায়গায় যেন সদ্য সদ্য পাঁচন গিলেছেন—এই রকম একটা মুখভঙ্গী করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সবাই তার দিকে তাকিয়ে খুক্ খুক্ করে হাসছে। আঁতেল ভদ্রলোক অবাক, ঘটনার বিন্দু-বিসর্গ তাঁর মাথায় ঢুকল না!

এমন সময় উঁচু প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো সেই ভদ্রলোক হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন—টুয়েন্টি।

যাঁহা বলা, আর যায় কোথা, শ্রোতারা হেসে কুটিপাটি। হাসি যেন আর থামতেই চায়না।

আচ্ছা, আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। বক্তা ভদ্রলোক পূর্ব্ববৎ কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে কি সব আকাশ-পাতাল যেন ভাবতে লাগলেন। তারপর আবার ঘোষণা।—ফর্টিফোর—

বেদম হাসি। যেন রেস্তর াঁর কড়িকাঠ উড়ে যাবার দাখিল।

আঁতেল ভদ্রলোক অপ্রসন্ন মুখে দাঁড়িয়ে। তাঁর প্রাণে ভয় ঢুকে গেল, কিরে বাবা, শেষে কোন পাগলের আড্ডায় এসে পড়লাম না তো!

পুনরায় ঘোষণা শোনা গেল। সেই একই পাঁচন কণ্ঠস্বরে—এইট্রি নাইন—

হো হো, হি হিঁ, হাঃ হাঃ। একঘর মানুষ যেন কোমর বেঁধে হাসির কম্পিটিশানে নেমেছে। আঁতেল ভদ্রলোক মহা বিরক্ত, আতঙ্কিত—এ কি রে ভাই!

—ফোর হাণ্ড্রেড থার্টি সিক্স—

ওরেপ্ ফাদার, কি বিকট হাসি আর সেই সঙ্গে মেয়েদের দারুণ অপ্রস্তুত মুখভঙ্গী। সে হাসি যেন আর থামতেই চায় না। মেয়েদের মুখও লজ্জায় লাল।

এবার আঁতেল ভদ্রলোক আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি পাশে দাঁড়ানো একজন ফরাসীকে খাটো গলায় প্রশ্ন করলেন—এটা কি ব্যাপার মশাই?

ফরাসী ভদ্রলোক ততোধিক খাটো গলায় জবাব দিলেন—এটা হাস্যকৌতুক—

—হাস্যকৌতুক? ইয়ে, দেখুন আমি একজন বিদেশী, দয়া করে ব্যাপারটা—যদি একটু আমায় বুঝিয়ে দেন···

ফরাসী ভদ্রলোক বললেন—ওই যে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন, উনি হচ্ছেন এদেশের একজন বিখ্যাত কমেডিয়ান। আজ এখানে উনি আমাদের কিছু জোকস্ শোনাচ্ছেন—

জোকস্। আঁতেল ভদ্রলোক এবার যেন আরও গভীর পাণিতে পড়লেন—উনি তো কতকগুলো নাম্বার হেঁকে বলছেন, এতে আবার জোকস্ কোথায় ?

ফরাসী ভদ্রলোক বললেন—ওঁর সমস্ত জোকসই আমাদের মুখস্থ। সেজন্য কষ্ট করে ওঁকে আর বলতে হচ্ছে না, উনি শুধু নাম্বারটা হেঁকে দিচ্ছেন আর আমরাও পটাপট মাল ক্যাচ্ করে নিচ্ছি। বেড়ে মজা হচ্ছে কিন্তু।

শুনে ভদ্রলোকের তো ভুঁয়ে বসে পড়ার অবস্থা।

এখন হয়েছে কি, এই গল্পটা পট্ করে আমার মনে পড়েনি, জহর রায়কে দেখে মনে হ'ল। সেদিন উনি স্টুডিওতে ঢুকে কিছু বাতেলা দিতেই আমাদের শোচনীয় অবস্থা। আজকাল চারপাশের যা অবস্থা দুঃখে এমনিতেই হাসি পেয়ে যায় কিন্তু জহর রায়ের ব্যাপারটা স্বতন্ত্র, সত্যিকারের মজার হাসি এখনও একমাত্র জহর রায়-ই বাঙালীদের হাসাতে পারেন। ক্ষমতাবান পুরুষ।

বিগত দুটি দশক ধরে জহর রায় বাঙালীকে হাসাচ্ছেন আর আমরাও নানান ফিরিস্তিতে হেসে যাচ্ছি। এতে আর যাই হোক, আমরা যে এখনও বেঁচে আছি, তা প্রমাণ হয়। কিন্তু জহর রায় আর কত কমিক করে হাসাবেন ? তার বদলে উনি যদি সেই ফরাসী কমেডিয়ানের লাইন ধরেন তো যুগপৎ উনি এবং আমরাও বেঁচে যাই। নাম্বার হেঁকে দিন, আমরাও হেসে লুটিয়ে পড়ি। অথবা এমন করতে পারেন, উনি হাঁকলেন —নিশিপদ্ম, আমরা তৎক্ষণাৎ সে-ছবির ফুচকা খাওয়া সিচুয়েশানের কথা ভেবে বেশ খানিকটা হেসে, নেচে নিলাম। উনি হাঁকলেন, ভবানীপুর। আমরা তৎক্ষণাৎ ওঁর নর্দান পার্কের সে-বছরের জম্পেশ কমেডি নাম্বারের কথা ভেবে নিয়ে হেসে খানিকটা গড়াগড়ি খেলাম।

অথবা ধরুণ, আমিই একটা কথা বলি, আপনারা পছন্দ সই একটা নম্বর বসিয়ে দিন ; একবার জহর রায় স্টুডিওতে এসে সব্বাইকে অনর্গল চাইনীজ ল্যাংগু শোনাতে আরম্ভ করলেন। মাতৃভাষা আর যেন বেরোতেই

চায় না। পরিচালক ভদ্রলোক মেকআপ রুমে এসেছিলেন সেদিনের শুটিং-এর ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে কিঞ্চিৎ আলাপ আলোচনা করতে। তিনিও সহসা জহর রায়ের চাইনীজ বাতেলা পেয়ে মানে মানে সরে পড়লেন। সবাই অবাক, সবাই হতভম্ভ। জহর রায় লোং ফোং চোং চ্যাং উয়া ইত্যাদিতে এমন তুলকালাম করতে আরম্ভ করলেন যে শেষে ব্যাপারটা যেন রীতিমত উদ্বেগের হয়ে দাঁড়াল। পরে জানা গেল, স্টুডিওয় আসবার সময় নির্ধারিত রাস্তায় ট্রাফিক-জ্যাম থাকায় ওঁকে আসতে হয়েছে ভায়া বেন্টিক স্ট্রীট। পথে প্রচুর চাইনীজ জুতোর দোকানের সাইনবোর্ড ওঁর চোখে পড়েছে। উনি স্রেফ সেই নামগুলোই মুখস্থ করতে করতে এসেছেন। এবং এসে অকুস্থলেই ঝেড়েছেন। বায়োস্কোপের লোকেরা অধুনা চীনেদের উৎপাতে ব্যতিব্যস্ত। স্যুটিং করতে গিয়ে চাইনীজ ডিপ্লোমেসিতে প্রায়শই কাৎ হচ্ছে। তাই হঠাৎ জহর রায়ের মুখে চীনা ল্যাংগু শুনে সবাই কেমন যেন ঘাবড়ে গিয়েছিল। যাবারই কথা। তাহলে ব্যাপারটা বিশদ করেই আপনাদের শুনিয়ে রাখি; দেখুন, বাঙলা ছবির জগতে চীনারা যে শেষ পর্যন্ত এই ভাবে এসে পড়বে, আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। এরজন্যে আমি প্রথমেই দায়ী করছি অপর্ণা সেনকে। উনিই চীনেদের বায়োস্কোপের লাইনটা চিনিয়ে দিয়েছেন। রক্ষে যে পুরুষ নয়, মেয়ে, এখন সেই চীনে মেয়েতে আমাদের বায়োস্কোপ লাইন ছয়লাপ। নিজের হাতে চুল বাঁধার রেওয়াজ উঠে গিয়ে এখন ফিল্মের বাঙালীচুল চীনে মেয়েরাই বেঁধে দিচ্ছে-নাকি নয়, বাস্তবিকই! এখন বলতে গেলে সব নায়িকার এক একজন চাইনীজ হেয়ার স্টাইলার ধরাবাঁধা। তারা এসে অব্দি নানা ফিরিস্তিতে চুল বাঁধছে। রোমান্টিক বা প্যাথেটিক খোঁপা সেতো আছেই, তদুপরি লম্বা, ঢ্যাঙ্গা, উঁচু, নীচু, সরু, মোটা, ঢপ এবং বেঢপ—অর্থাৎ চুল নিয়ে বায়োস্কোপে যত রকম সম্ভব অসম্ভব ফ্যাশন হতে পারে—তার কোনটাই বাদ পড়ছেনা। এমন কি, যে ছবিতে নায়িকাকে হয়ত দুখিনী বাল-বিধবা সাজতে হবে, সেখানে চাইনীজ কেশ-বিন্যাসকারিনীর যে কি ভূমিকা থাকতে পারে, বোঝা দায়!

সুনু রায়চৌধুরী আমাদের বায়োস্কোপের লাইনের একজন জাঁদরেল কণ্ট্রোলার অফ্ প্রোডাকশন্। সবাই সুনুবাবুকে খুব খাতির আত্তি করে। কারণ ভদ্রলোক বিশেষ ক্ষমতা ধরেন। উত্তমকুমার বা সুচিত্রা সেনকে ট্যাক্‌ল করতে হবে—ও এক সুনুবাবু ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভবপর নয়। সুনুবাবুর সঙ্গে ওই দুজনের দারুণ দোস্তি। স্বভাবতই ছবির প্রযোজকেরা সুনুবাবুকে প্রায়ই মস্‌কা দিয়ে থাকেন। সুনুবাবুও উইদাউট মস্‌কা বড় একটা কাউকে পাত্তা-ও দেন না। সুনুবাবু এমনিতে দারুণ মেজাজী মানুষ, বেশ ভাল মানুষ—কিন্তু ক্ষেপলে আর রক্ষে নেই। দেয়ালে দু'চাট্টে লাথি ওঁকে মারতেই হবে। না হলে রগ থেকে সহজে রাগ ওঁর নামবে না।

তিনি একদিন খুব দুখ্যু করে বললেন—এই হয়েছে এক যন্ত্রণা, হেরোইনদের সামলাই তো ওঁদের চীনেদের সামলাতেই এবার দেখছি প্রাণ ওষ্ঠাগত—

—কি ব্যাপার সুনুবাবু? আপনি হেন মানুষ এ-রকম আক্ষেপ করছেন কেন? একটু খ্যাড়া করে বলুন—

সুনুবাবু ব্যাজার মুখে তখন একটা ছবির নাম উল্লেখ করে বললেন—বারহাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচির মত ছবিতে নিয়েছে ওরা একগাদা হেরোইন। ফলে যা হয়, অমনি একদল চীনে সেখানে ঢুকে পড়েছে, কি না হেয়ার স্টাইল। অমন হেয়ার স্টাইলের কাঁথায় আগুন······

ঘটনাটা সেই ছবির আউটডোর সংক্রান্ত। কলকাতা থেকে আড়াই শো মাইল দূরে সে ছবির লোকেশান। ফলে আগের দিনই ইউনিটের বেশীর ভাগ লোক মাল পত্র নিয়ে লোকেশানে চলে গেছে। আর তার পরদিন, ভোর বেলার ট্রেনে আর্টিষ্ট এবং বাকি টেকনিশিয়ান্সদের রওনা দেবার কথা।

লোকেশানে মাত্র একজন হিরোইনের কাজ। অতএব তাঁর সঙ্গে একটি মাত্র চীনে মেয়ে যাবে। আর পড়বি পড়, সুনুবাবুর ওপরই দায়িত্ব পড়ল, শেষ রাত্রে তিনিই সেই মেয়েটি, যার নাম মার্গারেট, বাড়ি থেকে

তুলে নিয়ে হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছাবেন। স্থনুবাবু সে-দায়িত্ব অবশ্য সহজে কাঁধে নিতে চাননি, কিন্তু প্রযোজক ভদ্রলোকের অনুরোধ এড়ানো তাঁর পক্ষে শক্ত হ'ল।

স্থনুবাবু তখন বিরক্তির সঙ্গে বললেন—আমি কিন্তু মার্গারেটের বাড়ি চিনিনা—

প্রযোজক ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ একটুকরো কাগজে মার্গারেটের ঠিকানা টুকে স্থনুবাবুর হাতে গছিয়ে দিলেন—আপনি অনর্থক দুশ্চিন্তা করছেন স্থনুবাবু। ফিয়ার্স লেনে ঢুকে যাকে খুশী জিজ্ঞেস করলেই—

স্থনুবাবু চটে গেলেন—হেঃ কি যে বলেন আপনারা তার ঠিক নেই। শেষ রাত্রে আমার জন্যে ওখানে লোক দাঁইড়ে থাকবে যে জিজ্ঞেস করব?

অপ্রস্তুত প্রযোজক তখন কিঞ্চিৎ হেঁ হেঁ দেঁতো হেসে পাশ কাটালেন। —স্থনুবাবু, এই কাজটা আপনি ছাড়া কেউ পারবে না। আমি নিতান্ত সুব্রতা চ্যাটার্জিকে তুলতে ব্যস্ত থাকব, অন্যথায় ওটা আমিই করতাম…

স্থনুবাবুর সে রাত্রে দুর্ভাবনায় ভাল ঘুমই হলো না। পাড়ার একটা ট্যাক্সিকে বলে রেখেছিলেন। রাত আড়াইটেয় সে এসে হাজির—চলুন দাদা, রাত যে পুইয়ে এলো—

রাত আড়াইটেয় অগত্যা স্থনুবাবু সিদ্ধার্থের মত গৃহত্যাগ করলেন। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বললেন, চল ভাই চায়না টাউন, ওখান থেকে এক মক্কেলকে তুলে নিয়ে সোজা হাওড়া ষ্টেশান—

ফিয়ার্স লেনের মুখে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে পড়ল।—দাদা, গাড়ী ভেতরে ঢোকালে কিন্তু কিচাঈন হবে, ব্যাক করবার জায়গা নেই। আমি দাঁড়াচ্ছি। আপনি বরং গিয়ে ডেকে নিয়ে আসুন—

বিরক্ত মুখে স্থনুবাবু ট্যাক্সি থেকে নেমে বাড়ির ঠিকানাটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিতে গিয়েই মহা ব্যাকুফ্, যাঃ, পাঞ্জাবী বদলানোর ফলে সেটা দেখছি বাড়িতেই রয়ে গেছে, এখন তাহলে উপায়? এই শেষ রাত্রে মার্গারেট কে কি ভাবে খুঁজে বের করা যায়? বিশেষ করে চায়না টাউনের মত অমন একটা কুখ্যাত জায়গায়? গলির নামটা এমনিতেই

ফিয়ার্স লেন। সুনুবাবু ঠাঁই ঠাঁই করে কপাল চাপড়ালেন। তারপর 'যা আছে কপালে' বলে সেই ঘুট ঘুটে অন্ধকার গলিতে ঢুকেই পড়লেন—কেশ বিন্যাসকারিনীর সন্ধানে। তারপর এমুড়ো ওমুড়ো ঘুরে না পেলেন একটা লোকের সন্ধান, না পারলেন বাড়ির সঠিক ঠিকানাটা স্মরণ করতে।

সুনুবাবু বললেন—জীবনে কত ডিফিক্ল্যাট সেচুয়েশান আমি অক্লেশে ট্যাক্‌ল করে বেরিয়ে গেছি, কিন্তু এহেন উট্‌কো ফ্যাসাদে কখনও পড়িনি।

কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখেই ওঁর চক্ষুস্থির। ট্রেনের সময় হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। এখন কিং কর্ত্তব্য ?

হঠাৎ সুনুবাবুর মাথায় যেন একটা ঈশ্বর-দত্ত বুদ্ধি গজালো—আচ্ছা, গোড়া থেকে কড়া নেড়ে গেলে কেমন হয় ? এর একটা বাড়িতেই তো মার্গারেট থাকে……

ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে দ্রুত পরামর্শ করতে সে বললে—'দাদা,' চীনেরা এট্টু টেঁটিয়া টাইপের। তা সে আর কি করা যাবে। আপনি কড়া নেড়ে যান আর ইদিকে আমি 'হরেন' দিয়ে যাচ্ছি—সুনুবাবু আর কালক্ষেপ না করে তড়িঘড়ি কাজে নেমে পড়লেন। তারপর যুগপৎ কড়া নাড়া আর হর্নের বিকট পক্ পক্ শব্দে গোড়া চায়না টাউন-ই জেগে যায় আর কি !

এক একটা বাড়িতে কড়া নড়ে আর হতভম্ব হেড-চীনেম্যান দরজা ফাঁক করে সভয়ে গলা বাড়িয়ে দেখে, জনৈক ধুতি পাঞ্জাবী পরা বাঙালী বাবু, একগাল অমায়িক হেসে বাইরে দাঁড়িয়ে।

—মার্গারেট হ্যায় ?

হেড-চীনেম্যানের সান্দিগ্ধ্য দৃষ্টি,—লু চো য়্যাং ফোঁয়···মালগালেট ? নো বাবু, নো মালগালেট নো হিয়ার—

সুনুবাবু তখন নিজের চুল দেখিয়ে—আই ওয়াণ্ট দিস্ মার্গারেট—

কিন্তু তার জবাবে মুখের ওপর দরজা দড়াম, সওয়াল জবাবের কোন সুযোগ না দিয়েই। যাঃ বাবা !

এইভাবে পর পর গোটা দশেক বাড়ির কড়া নেড়ে নেড়ে সুনুবাবু

যখন ক্লান্ত, পর্যুদস্ত, তখন ট্যাক্সিওয়ালার বক্তব্য—দাদা, এবার চেল্লান, আর আমি পক্ পক্ আর ইলেট্রিক—দুটো হরেন-ই বাজাচ্ছি, দেখি আপনার মার্গারেট না ফার্গারেট বেরোয় কিনা—

এই পরিস্থিতিতে যা হয়, শেষ পর্যন্ত ট্যাক্সিওয়ালাব পরামর্শ-ই শিরোধার্য—সুনুবাবু গলির মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে বার কতক মার্গারেট মার্গারেট বলে বিকট চেঁচাতে হঠাৎ তের নম্বর বাড়ি থেকে পুরুষ কণ্ঠে কিছু দুর্বোধ্য চাইনীজ ল্যাংগু যেন স্রেফ তাড়া করে এল (সুনুবাবুর আজও ধারণা—সে ল্যাংগু নির্ঘাৎ অশ্লীল) এবং তৎক্ষণাৎ মার্গারেটের কণ্ঠ শোনা গেল—আয়, ইদাল আয়—

বলতে বলতে অন্ধকার ফুঁড়ে একজন ক্ষিপ্ত হেডচীনে ম্যানের সঙ্গে মার্গারেট এসে হাজির। তারপর কান এঁটো করে একগাল হেসে হেড চীনেম্যানের সঙ্গে পরিচয় করাল—মাই ফাদাল। অর্থাৎ আমার বাবা। অ্যান্ড হি ইজ ছুনুড্যাডা—

এতক্ষণে ফাদালের কঠিন মুখ ঈষৎ প্রসন্ন হলো। ফাদাল বলল—সি মাই ডটাল, নাউ গো, টেক কেয়াল। অর্থাৎ মেয়েটার যত্ন নিও।

কিন্তু সুনুবাবু কেয়ার নেবার আগেই অন্ধকারের পেছন থেকে একদল চীনের আবির্ভাব। তাদের ভঙ্গীটা রীতিমত উত্তেজিত। শেষ রাতে কড়া নেড়ে নেড়ে বলি ব্যাপারখানা কি হচ্ছে গোছের।

সুনুবাবু যত বলেন, আরে ধুস্, আমার এদিকে ট্রেন ফেল হবে—চীনেদের দল ততই দ্রুত চাইনীজ ল্যাংগু বলে তাঁকে বাধা দেয়—যাচ্ছো কোথায়, আগে ফয়সালা হোক।

তারপর ফাদালের কি চোটপাট। প্রথমেই একপ্রস্থ ক্যান্টোনীজ তক্কো হ'ল, ফাদাল শেষে এইস্যা উত্তেজিত হয়ে পড়ল যে কাছে-পিঠে একটা ড্রাম পড়েছিল, সেটা ঠেলেঠুলে এনে তার ওপর দাঁড়িয়ে কোমরে হাত রেখে তেড়ে একখানি বিশুদ্ধ চৈনিক বক্তৃতা ঝাড়তে, শুধু ধরল। এরপর কি হ'ল কে জানে, প্রত্যেকে সুনুবাবুর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক্ করে কান এঁটো একগাল হেসে হেসে শেষ রাতে ঘুমোতে গেল আর মার্গারেটকে

সঙ্গে নিয়ে সুনুবাবু সেদিন যেভাবে কোল্ডফিল্ড এক্সপ্রেস ধরলেন, সে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। সুনুবাবু বললেন,—ওটা আলাদা ভাবে না বললে মজা পাওয়া যাবেনা। এসো আর একদিন, গুছিয়ে বলব। তবে হ্যা, এই যে চীনেদের ব্যাপারে এত বললাম, মেয়েগুলো কিন্তু বেশ ভদ্র, অমায়িক, এটা মানতেই হবে···

কাট্ টু কাট্ এবার ফিরুন জহর রায়ের কাছে। উনি সারা বছরই এখানে-ওখানে ফাংশন করে বেড়ান। এটা ওঁর পেশার-ই একটা অঙ্গ। একবার কিছু যুবক এসে ওঁকে ধরল—জহরদা, আমাদের পাড়ায় আমরা ক'জন মিলে একটা ফাংশন করছি। আপনাকে যেতে হবে—

—বেশ যাব। তারিখটা বল।

ওরা বলল।

জহর রায় নিজের ডাইরীতে সেটা লিখে রাখলেন। তারপর যা নিয়ম, কিছু অগ্রিম টাকা ওরা জহর রায়কে দিয়ে বলল—এটা রইল, ফাংশনের দিন বাকিটা দিয়ে দেব। আমরা আজ চলি—

কয়েকদিন পর ওরা হঠাৎ আবার এসে হাজির। কিন্তু কিন্তু মুখে।

—কি ব্যাপার ?

ওদের মুখপত্র যে যুবকটি সে সামান্য ইতঃস্তত করে বলল—দাদা, আমাদের ফাংশানটা হচ্ছে না।

জহর রায় ভ্রুকুটি করলেন—সেকি হে, তোমাদের জন্যে ডেট্-টা তুলে রেখেছি, অন্য একদল এসেছিল ওই দিনটা চেয়ে, আমি তাদের ফিরিয়ে দিলাম, আর অ্যাদ্দিন বাদে এসে বলছ—হচ্ছে না।

ওরা কাঁচুমাচু হয়ে ঘাড় চুলকাতে লাগল। জহর রায় বললেন—যাক্গে, যা হবার হয়ে গেছে, ও নিয়ে আর চিন্তা করে লাভ নেই।

আশা করা গিয়েছিল ওরা অতঃপর মানে মানে সরে পড়বে, কিন্তু তেমন কোন লক্ষণই দেখা গেল না। সামান্য চুপ করে থেকে জহর রায় বললেন—কিছু বলবে ?

যুবকটি বলল—হ্যাঁ দাদা, মানে এই ইয়ে আরকি।

—বল, বলে ফেল্গ। জহর রায় উৎসাহ দিলেন।

—আমরা আপনাকে অ্যাডভ্যান্স হিসাবে যে টাকাগুলো—

—সেগুলো ফেরৎ চাইছো। এই তো? জহর রায় ওদের থামিয়ে দিয়ে বললেন—তা বেশতো, এর জন্যে চিন্তা কিসের—বলে উনি বাড়ির ভেতর চলে গেলেন। এবং পরক্ষণেই হাতে একটা টুথপেস্টের টিউব নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

টুথপেস্টের টিউব দেখে ওরা তাজ্জব।

জহর রায় টিউবটা টিপে খানিকটা পেস্ট বের করে সেই অবস্থায় সেটি যুবকটির হাতে দিয়ে বললেন—তার আগে টিউব থেকে যে মালটি বেরিয়ে এসেছে সেটা আবার যথাস্থানে ঢুকিয়ে দাও দেখি, আমিও টাকা ফেরৎ দিয়ে দিচ্ছি—

ফাংশন ওয়ালাদের মুখে আর কথা সরে না। কিছুক্ষণ পেস্টের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে তারা প্রত্যেকে জহর রায়কে সষ্টাঙ্গে পেন্নাম করে নিঃশব্দে সট্‌কে গেল?

কিছুদিন আগে জহর রায় আমাকে খুব মজার একটা গল্প শুনিয়েছিলেন। কমেডিয়ানরা সাধারণতঃ মানুষকে হাসিয়ে আনন্দ দিয়ে থাকেন অথচ তাঁদের ভাগ্যে যে কি ধরণের আনন্দ মাঝে মাঝে জুটে যায়—ব্যাপারটা হচ্ছে কতকটা সে-রকমই।

বললেন, কয়েকদিন আগে সকালে ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছি, হঠাৎ চাকর এসে খবর দিল—এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন।

ভদ্রলোক একজন অবাঙ্গালী। এদেশের একজন নাম করা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ম্যাগনেটের প্রাইভেট সেক্রেটারী। তিনি সবিনয়ে জানালেন—হামাদের বহুরানী আপনার একজন বড় ফ্যান—

—হ্যাঁ, তা কি করতে হবে?

—ব্যোপারটা হোচ্ছে, হামাদের বহুরানীকে আপনার কুছু জোকস্‌ শিখ্‌লিয়ে দিতে হোবে।

—জোকস্ শিখিয়ে দিতে হবে। সেকি? কেন?

—ব্যোপারটা হোচ্ছে, হামাদের বহুরানী কুছু দিন পোরে বোম্বে যাচ্ছেন—ওখানে ওঁর এক রিস্তার শাদী হোবে, তো শাদী বাড়িতে বহুরানী কুছু জোকস্ শুনাইয়ে আদমীলোগের জ্বেরা আনন্দ দিবেন, তো অগ্‌র আপনি মাষ্টারীটা হেঁ হেঁ হেঁ, কুছু চিন্তা নেই, পয়সা কা কোই সওয়াল নেই, যো লিবেন সো লিবেন, সাত দিনের কোর্স, ডেইলি এক ঘণ্টা, ব্যস্—

—ব্যস্?

—ব্যস্! ইযো জ্যায়দা কোই তকলিফ নেহি।

জহর রায় বিস্মিত, হতভম্ভ। কিন্তু রাজী হলেন শুধু এই ভেবে যে তাঁর এতে একটা নতুন ধরণের অভিজ্ঞতা হবে।

নির্ধারিত দিনে গাড়ি এল ওঁকে নিয়ে যাবার জন্যে। শহরের বিলাস-বহুল এলাকায় বিরাট আধুনিক বাড়ি। গোটা বাড়িটাই যেন এয়ার কণ্ডিশানড্। সেক্রেটারী একগাল হেসে জহর রায়কে লিড্ করে নিয়ে চললেন। একটার পর একটা ঘর পার হয়ে শেষে একটা সুসজ্জিত ঘরে ওঁকে বসিয়ে বললেন,—বউরানী এখুনি আসবেন। আভি বলুন ঠাণ্ডা ইয়া গর্ম? জহর রায় জানালেন—এখন এর কোনটাই লাগবে না।

কিছুক্ষণ প্রতীক্ষার পর ঘরের বাইরে হঠাৎ টুং করে একটা শব্দ হলো। দেখা গেল একজন রীতিমত রূপসী মহিলা ঘরে ঢুকছেন, পেছনে চাকরের কোলে ঢুকছে বই-য়ের পাহাড়।

শশব্যস্তে উঠে নমস্কার করে দাঁড়াতেই ভদ্রমহিলা হাসিমুখে বললেন —আপনার বোহত নাম শুনেছি জবহুরজী, আভি আপনি হামার মাষ্টারজী লাগছেন, তো ফির আমায় কুছু জোকস্ শিখিয়ে দিন—

জহর রায় সবিনয়ে হেসে বললেন—আপনাকে কি শেখাব ঠিক বুঝতে পারছি না। আসলে কমেডি তো কাউকে শেখানো যায় না, ওটা শিখে নিতে হয়।

ভদ্রমহিলা তখন বললেন—জরুর জরুর, হামি নিজের চেষ্টায় ভি কুছু শিখেছি মাষ্টারজী—

বলে চাকরের কোল থেকে একটা বই তুলে নিয়ে ভদ্রমহিলা বাছাই করা পাতা থেকে কিছু পড়ে শুনিয়ে দিলেন।

তখন জহর রায় বললেন—বেশ, তাহলে আরম্ভ করা যাক্। এই যে আপনি আমায় ডেকে এনেছেন—সেটাই একটা মস্তবড় জোক্। আমি এটা নিয়ে আরম্ভ করছি—এটাই আজ শিখুন—

বলে জহর রায় যথাসম্ভব ক্যারিকেচার করে পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে দিলেন। দেখে ভদ্রমহিলা তো প্রথমে হেসে কুটিপাটি, তারপর অসম্ভব তারিফ্ করলেন।

এরপর জহর রায় নতুন উৎসাহের সঙ্গে যেই আর একটি 'পাঠক্রম' শুরু করবেন করবেন স্থির করছেন, বাইরে সেই টুং শব্দটা আবার শোনা গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলা তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়ে তড়িঘড়ি বললেন—আজ ফিনিশ। কাল ফির হোবে। নমস্তে।

বলেই তিনি দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। দেখা গেল, এবার তাঁর পেছন পেছন ছুটে চলেছে একদল চাকর, তাদেব কারও হাতে সেতার, কারও হাতে তানপুরা, কারও হাতে বেহালা।

সেক্রেটারী হেসে বললেন—আভি গানা বাজানার কেলাস্।

এর পরের চারদিন এক ঘটনারই পুণরাবৃত্তি হ'লো। বাইরে টুং করে শব্দ হয়, আর তৎক্ষণাৎ ভদ্রমহিলা চলে যান। পেছনে ছোটে চাকর-বাহিনী। কোনদিন ঘোড়ার সরঞ্জাম। কোনদিন গলফের। কোনও দিন লন্ টেনিসের। পঞ্চম দিনের দিন জহর রায় লেসন দিলেন—এক বেচারি কমেডিয়ান আয়া থা লেকিন ভাগ গয়া—বলেই জহর রায় দে-চম্পট। তখনও টুং হয়নি। ভদ্রমহিলা দারুণ অবাক—কমেডিয়ান পালাচ্ছে না তাকে লেসন দিচ্ছে—কিছুই বুঝতে পারছেন না। তিনিও খানিকটা দৌড়ে নিলেন, অযথা।

ঘণ্টা খানেক পরে সেক্রেটারী ছুটে এলেন জহর রায়ের বাড়ি।—এঃ, আপনি ভেগে এলেন? বহুরানীর বড়ি আফশোষ, চলুন স্যার, এবার ডবল টাকা—

কিন্তু জহর রায় সে কথা হেসে হেসে হেসেই উড়িয়ে দিলেন। কারণ

জহর রায়ের মত কমেডিয়ান জীবনে নাকি এই প্রথম একটা অট্টহাসি হাসবার সুযোগ পেলেন।

সহকারী হিসাবে ফিল্মের কাজ করে যাচ্ছি বছরের পর বছর। প্রতি বছরের শুরুতেই ভাবি—এবার নিশ্চয় পার্টি পাবো, নিজে স্বাধীনভাবে ছবি পরিচালনা করতে পারবো। তাই পূজা সংখ্যার গল্প একটার পর একটা পড়ি। যে গল্পে ছবি হবার সম্ভাবনা আছে মনে হয়—কালবিলম্ব না করে তার চিত্রনাট্য লিখতে বসে যাই। কোন চিত্রনাট্য সাতদিনে শেষ হয়, কোনটা একমাসে। একটাব পর একটা বিদেশী ছবি দেখি, সিচুয়েশান গঁ্যাড়া দেবার জন্য। কিন্তু বিদেশী গল্পের সিচুয়েশান আমাদের দেশী পটভূমিতে মানাবে কেন? তাই নিরাশ হতে হয়। মনে মনে ছবির কাস্টিং করাই থাকে। ভাবখানা ও কিছুই না, গিয়ে একটু ধরাধরি করলেই আর্টিস্টরা রাজী হয়ে যাবে—এতদিন একসঙ্গে কাজ করছি—এত ভাল সম্পর্ক—ফেলে তো আর নিশ্চয় দেবে না।

কিন্তু পার্টি অর্থাৎ ফাইনানশিয়ার বা প্রোডিউসার আর জোটে না। সবাই বলে, আরে যাদের কাছে রাশি রাশি ব্ল্যাক-মানি আছে সেখানে যাও, তাদের কনভিন্স করো। দেখবে পার্টির অভাব হবে না। তখন বলি, বেশ ভাল কথা, দু-একজনের নাম করো, ঠিকানা দাও, সটান চলে যাচ্ছি, কনভিন্স করছি। একজন বললে—বড়বাজারে যাও, ওখানে ফুটপাতে বসে যে লোকটা বিজনেস করে, জানবে তারও হেভি ব্ল্যাক-মানি আছে। আর যারা দালানে বসে আছে বা এয়ার কণ্ডিশানে—তাদের কথা বাদ-ই দিলাম।

আমাদের এক বন্ধু গিয়েছিল। কদিন পরে স্টুডিওতে দেখা হতে বিরস বদনে বললে, ধুস্ ছবির প্রসঙ্গ তুললেই তেড়ে মারতে আসে রে ভাই—

জয়ন্ত একজন সিনিয়ার অ্যাসিস্টেণ্ট। একদিন আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে গোপনে বলল—এট্টা পেয়েছি রে?

আমি অবাক।—কি পেলি? লটারি?

জয়ন্ত চটে গেল—গাধা কোথাকার, লটারি কেউ পায় নাকি? যত বুজরুকি। আমি লটারি কেটে কেটে ফর্সা হয়ে গেছি। অন্য ব্যাপার—

আমি লজ্জিত। সপ্রশ্নে তাকাতে জয়ন্ত বললে—পার্টি। জবরদস্ত!

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে জেলাসিটা গোপন করে, যেন কত আনন্দেই হাসছি বললাম—বাঙ্গালী না ননবেঙ্গলী?

—কাপালিক।

—এঁ্যা? কাপালিক? বলিস কিরে?

জয়ন্ত বিজয়ীর ভঙ্গীতে চোখ নাচাল—হ্যাঁরে শালা হ্যাঁ। মোক্ষম পার্টি। ছবি আমার এবার হবেই। তুই থাকবি তো আমার সঙ্গে?

—সে না-হয় থাকলাম, কিন্তু কাপালিক—সে আবার কি ছবি করবে? লোকটা ফলস নয় তো?

জয়ন্ত গম্ভীর গলায় বললে—ওরিজিনাল। দেখলে তুই ঘেবড়ে যাবি। ইয়া চেহারা, ইয়াব্বড়-বড় দুটো ভাটার মত চোখ জবার মত টকটকে রাঙ্গা। চব্বিশ ঘণ্টা নেশা করে কিনা দেখলে বাস্তবিক ভয়ে বুক কেঁপে যায়। কিন্তু লোকটা ফাসক্লাস। এন্তার টাকা আছে। আমার একজন ওর কাছে নিয়ে গিয়েছিল। এমনি আর্জি জানাতে গিয়েছিলাম মনে মনে হে বাবা, একটা ভাল পার্টি দাও, ছবি করি। তা কাপালিকটা আমায় কি বলল জানিস? শুনলে তোর পিলে পর্যন্ত চমকে যাবে, অ্যাই ছোঁড়া, তুই বাইসকোপ করিস?

—এজ্ঞে হ্যাঁ বাবা।

—বুয়েচি তোকে দেখেই বুঝতে পেরেছি। তোর ক'দ্দিন হলো রে এই লাইনে?

—বছর দশেক না?

—এজ্ঞে হ্যাঁ বাবা।

—কাপালিক বিকট অট্ট হেসে বললে নিজে ইণ্ডিপেডেণ্ট করবি বুঝি?

—এজ্ঞে হ্যাঁ বাবা।

—পার্টি পেয়েছিস ?

—এজ্ঞে না বাবা।

—লাখখানেক হলে পারবি ?

—এজ্ঞে ?

—বলি একলাখের মত দিলে চলবে ?

—বাবা চলবে মানে ওর চোদ্দপুরুষ চলবে।

—গ্যাঁড়া মারবি না-তো ?

—বাবা একটা আধলা সরাবো না কথা দিচ্ছি।

—কাপালিক কিছুক্ষণ গুম মেরে থেকে কি যেন ভাবল তারপর বলল যাঃ আরম্ভ করে দে টাকার জন্যে ভাবিস নে—

শুনে স্তম্ভিত আমি। কাপালিক ছবি প্রোডিউস করবে আর তাও এই রাম-ক্যাবলা জয়ন্তর ? মরে যাই।

জয়ন্ত হুঁশিয়ার করল আমাকে—কাগজে আবার লিখে-ফিখে দিসনে হুট করে যেন। পার্টি জমুক তারপর একদিন প্রেস কনফারেন্স ডেকে সবাইকে যা বলবার বলা যাবে। ইয়ে, এখন কার গপ্পো নেয়া যায় বলত ?

—কেন ? তোর নিজের কোন গপ্পো রেডি নেই ?

—উহুঁ, উত্তমদার ক্যারেকটার হতে পারে সে-রকম গল্পই পেলাম না। যাক, এখন কি গপ্পো করা যায় ভেবে দেখ।

—কিরকম চাস ?

—আমি আর কি চাইব। আমি কি ছাই কিছু পড়ি। তুই লিখিস-টিখিস, পড়িস-টড়িস বলে তোকে বললাম। ধর না এইরকম একটা ক্রাইম-ট্রাইম—

—না হয় ধরলাম সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ, এটা কিন্তু তোর কাপালিক রাজী হবে তো ?

—সে আমার দায়িত্ব।

—ইয়ে, কাপালিক থাকে কোথায় ?

জয়ন্ত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল, পার্টি ভাগিয়ে নেবার মতলব আঁটছি

কিনা বুঝতে চেষ্টা করলো তারপর গম্ভীর গলায় বলল—শ্মশানে। তোকে নিয়ে যাব একদিন। কাউকে বলিসনি যেন। পাঁচকান হলে পার্টি হাতলেত্তি হয়ে যেতে পারে—

আমি নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লাম।

জানেন তো ফিল্ম লাইনের মানুষের দেবদ্বিজে ভক্তি একটু বেশী। লাইনটা যত না আর্টের তার চাইতে বেশী কপালের। এখানে বেশীর ভাগ মানুষ কপালে করে খায়, টু-পাইস ব্যাঙ্কে রাখে। যাদের মন্দ-ভাগ্য তারা বলে, ভাই এখানে প্রতিভার কোন মূল্য নেই। এই দেখ না অমুক আকাঠ মুখ্য অথচ কেমন করে খাচ্ছে! আর যাদের পজিশন একেবারে নড়বড়ে তারা বলে এ শালার ফিল্ম লাইনে সৎ ব্যক্তির কোন ঠাঁই নেই, এখানে ফেরেব-বাজি করো, দেখবে পার্টি সব হুড়মুড় করে আসছে। দেখছো না অমুক লেউড়ি কি করছে…।

—আমি এ-সব কিছুই বুঝতে পারি না। প্রতিভাবান মানুষ অথচ কিছু করতে পারছে না। এটা যেমন বিশ্বাসযোগ্য নয় তেমনি সৎ ব্যক্তিরও এখানে না-হওয়ার কোন কারণ দেখতে পাই না। আর একটা ব্যাপারে সবাই কিন্তু এককাট্টা, সবারই একজন করে গুরু আছে। অমুক ক্ষ্যাপা, তমুক ক্ষ্যাপারা ফিল্ম লাইনে বেশ উঁচু ঘরানায় অধিষ্ঠিত। ছোটখাটোরা অমুক বাবা বা তমুক স্বামী নিয়ে খুশী আছেন। সবার ধারণা, গুরু না থাকলে বিপদ-আপদ কাটাব কি উপায়ে? পয়সা এলেই তো হলো না, পয়সা যাতে বরাবরের মত বানের জলের মত আসে সে-ব্যবস্থা তো করে রাখতে হবে।

—ভাবুন শিল্পের লাইনের আসল ব্যাপারটা। একবার নামজাদা স্টারের এক গুরুকে আমরা আউটডোরে ফেলে খুব ঠেঙ্গিয়ে দিয়েছিলাম। গুরু তিনি যদি শুধু গুরুর মতই থাকতেন তো বেঁচে যেতেন। কিন্তু কপালে দুঃখ্যু থাকলে কে বাঁচায়? তিনি আমাদের সঙ্গে মস্ত ঝামেলা বাঁধালেন। আমরা তক্কে তক্কে ছিলাম, গুরুদেব যখন-তখন দাবী করতেন—তিনি

সব অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ জানেন। ইচ্ছে করলে মাটি থেকে নাকি এক বিঘৎ উঁচু দিয়ে চলতে পারেন, তা সুযোগ পেয়ে আমরা সবাই একদিন ধরলাম, গুরুদেব, দেখিয়ে দাও—

—কি দেখাব রে শালারা ?

—মাটি থেকে এক বিঘৎ উঁচু হয়ে তোমার চলাফেরার ম্যাজিকটা—

গুরু আমাদের ওপর তখন বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—তোরা সব মহাপাপী, তোদের দেখাব কেন ?

আমরা তৎক্ষণাৎ জেদ ধরলাম, দেখাতেই হবে।

গুরুও দেখাবেন না। অতএব রবীন বাঁড়ুজ্যে, আমাদেরই এক বন্ধু, গুরুদেবকে মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করলো—দেখাও গুরু দেখাও—

আচমকা মুষ্টিযোগ খেয়ে গুরুর তো আক্কেল গুড়ুম। রেগে কাঁই। চেঁচিয়ে বললেন—এই শ্যালারা তোরা আমায় মারলি ?

আমরা তখন আর একটু ইয়ে করলাম ওঁকে। উনি পটাপট এতগুলি কিল গাট্টা খেয়ে দিশেহারা, ক্ষেপে খড়ম ছুঁড়লেন, চোখা চোখা বাণী দিতে লাগলেন আর আমরাও দারুণ বিক্রমে প্যাঁদাতে লাগলাম। গুরু প্যাঁদানির চোটে মুক্তকচ্ছ হয়ে দাঁড়ালেন ভূঁয়ে, ভাবখানা, ওরে আর আমায় মারিস নি, দেখাচ্ছি দেখাচ্ছি। আমরা তৎক্ষণাৎ সিজ ফায়ার করলাম। গুরু দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে কি সব যেন সাপের মন্ত্র পড়লেন কিছুক্ষণ। তারপর 'হুপ্' একটা শব্দ করে দে দৌড়। সাক্ষাৎ অলিম্পিক স্টাইল-দৌড়। রবীন পোঁ পোঁ করে তার পেছনে ছুটলো কিছুক্ষণ ধর ধর শব্দে, কিন্তু গুরু আর কি দাঁড়ায়, চোখের নিমেষে পগার পার। সেই গুরুকে আমরা আর কক্ষণো ফিল্ম লাইনে দেখিনি। অথচ রটে গেল আমরা নাকি ওঁকে ভূঁয়ে ফেলে বুকে বাঁশ রগড়েছি, বলুন তো, নিছক প্যাঁদানি আর বুকে বাঁশ—এক জিনিস ?

সে-কথা জয়ন্তর স্মরণে ছিল। একদিন জনান্তিকে আমায় বললে, এই দেখ তোদের রেপুটেশান—গুরু ঠ্যাঙ্গাতে ওস্তাদ, তা-বলে কাপালিকের সঙ্গে পাঁয়তাড়া করতে যেও না, উনি কিন্তু জাগ্রত কাপালিক, অভিশাপ খেয়ে মরবি।

বললাম, তা একদিন মিট্ করা, আলাপ-টালাপ হোক্—

জয়ন্ত বললে, সে হবে এখন, তুই গপ্পো খুঁজেছিস ?

—বিলক্ষণ, সে আর বলতে।

—কি গপ্পো ? বেশী দামী মলাটের দরকার নেই আমার—

বললাম, আরে ভয় পাবার কিছু নেই, বঙ্কিমচন্দ্রের গল্প তো এখন ইচ্ছে করলেই বিনে পয়সায় পাওয়া যায়, ন্যাশনাল রাইট, আমি ভেবে দেখলাম 'কপালকুণ্ডলা' করলে খুউব ভাল হয়—

—কিন্তু ওটা যে একবার হয়ে গেছে—

—তাতে কি হয়েছে, আমরা আবার রি-মেক করবো। আজকাল দেখছিস না কথায় কথায় রি-মেক হচ্ছে, রিস্ক কম্—

—কাস্টিং ?

—এক নবকুমার, তুই ধর যদি ছবিটা আমরা ইস্টম্যানকালারে করি তো বোম্বে থেকে শত্রুকে আনবো। আর মেয়েটি ? মাদ্রাজ থেকে জয়শ্রী-টিকে আনবো, আরেব্বাস, মেয়েটির টেরিফিক্ সেক্স, নাচে ভাল, গায় ভাল, দেখবি তোর কাপালিক কত খুশী হবে—। কাপালিকের নিজেরও একটা বড় পার্ট রয়েছে।

জয়ন্ত বললে, ভেরি গুড আইডিয়া, দেখি কথাটা বলে, রাজী হয় কিনা।

—হ্যাঁ, গিয়ে বলবি—'পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ ?' কাপালিক তো, শট্ করে ব্যাপারটা বুঝে ফেলবে, কন্‌ভিন্স করতে তোর বেগ্ পেতে হবে না।

দিনতিনেক পরে জয়ন্ত একদিন হন্তদন্ত হয়ে এলো, ইদিকে আয় তোর সঙ্গে পরামর্শ আছে।

—গেলাম।

—জয়ন্ত চোখ বড় করে বললে, আরে কাপালিক কি বললে জানিস ? শত্রু নাকি ওর ছেলেবেলার বন্ধু আর জয়শ্রীকে 'টি' উপাধি নাকি ও-ই দিয়েছে। বললে কোই পরোয়া নেহি, চালিয়ে যাও—

—কি চালিয়ে যাব? আমি অবাক।

জয়ন্ত বললে, ছবি করার কাজ-কর্ম।

—হ্যাঁ তা-তো যাচ্ছিই, সে আর বলবার কি আছে, কিন্তু মালকড়ি? সে সবের কি ব্যবস্থা?

জয়ন্ত বিরস মুখে বললে, সে-কথাই তো বলছি। মাইরি একটু আওয়াজও দিচ্ছে না।

—তা কাপালিকের গতিক্ কি বুঝলি? শিষ্য-টিষ্য কি রকম?

—গতিক বুঝতে পারলাম না, সব তাতেই 'হ্যাঁ' চালিয়ে যাচ্ছে। তবে অনেক শাঁসালো শিষ্য-সামন্ত আছে দেখলাম, বড় বড় কিছু বিজনেসম্যানও—

শুনে মনে যেন আশার সঞ্চার হলো, বলা যায় না, কাপালিক বলে একটা কথা, সামান্য এট্টু তুক্ করে দিলে শুধু কলকাতায় কেন, বোম্বে এবং মাদ্রাজে গিয়েও কালার ছবিতে ছয়লাপ করে দেয়া যায়।

—কি রকম ওখানে প্যালা-ট্যালা পড়ছে দেখলি?

জয়ন্ত বললে—বিস্তর পড়ছে, দিশী-বিদেশী সব রকম। কাপালিক তো ইন্টিমেট সেণ্ট ছাড়া মাখেই না। সারাক্ষণ ভুরভুর করছে গন্ধ। শিষ্যরা গদগদ—

—ফিমেল শিষ্য দেখলি?

জয়ন্ত ঢোক গিলে বলল—দেখলাম বৈকি, ওঁয়ারাই তো ভক্তিতে সেঁটে বসে আছে। থাকগে, আমার অত কথায় কাজ নেই, ছবিটা হলেই বাঁচি—

—হয়ে যাবে, কিচ্ছু চিন্তা নেই।

—বলছিস্?

—হ্যাঁ, বলছি।

এরপর আমরা পড়লাম আর্টিস্ট নিয়ে। বোম্বের শত্রুঘ্ন সিনহা আর জয়শ্রী-টি তো আমাদের কাগজে কলমে ফাইন্যাল, কাপালিক আমাদের গ্রীন সিগন্যাল দিলে—স্থির হলো জয়ন্ত ট্রাভেলার্স চেক নিয়ে বোম্বে ফ্লাই করবে। ওদের দুজনকে স্বাক্ষর করাতে। আর তদ্দিনে অন্যান্য চরিত্রের

জন্য স্থানীয়ভাবে শিল্পী নির্বাচন করতে আমরা প্রায় মিনি-মাগনায় নেমে পড়লাম।

ফিল্ম লাইনে অনেকগুলো শঙ্কর। এরা কেউ অবশ্য বর্ণ-সঙ্কর নয়, বরণ্ শঙ্কর, অর্থাৎ জন্মগত শঙ্কর। কেউ গুহ, কেউ চাটুজ্যে আর কেউ বা বাঁড়ুজ্যে। ক্যামেরা ডিপার্টমেন্টেই এদের বেশী আধিপত্য, কেউ কেউ প্রোডাকশন বা আর্টিস্ট শঙ্কর। আর এদের একজন আমার বিশেষ বন্ধু। এই রকম রসাত্মক ছেলে বড় চোখে পড়ে না। নিজে সহজে রাগে না, কিন্তু অন্যকে সহজে রাগিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে। মানে, পেছনে লাগার একখানা। দুষ্টুবুদ্ধিতে মগজ গিজ্-গিজ্ করছে। সারাক্ষণ এর টুপি ওর মাথায় পরিয়ে চা-টা, সিগ্রেটটা, কাটলেটটা ম্যানেজ করছে। ছবির শুটিং উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছে। ক্যামেরার মেকানিজমটা খুব ভাল জানে, লোকজনের সঙ্গে অতি সহজে মিলে-মিশে যেতে পারে, সাউণ্ডের কাজটা মোটামুটি আয়ত্ত করেছে, শব্দযন্ত্রী অনুপস্থিত থাকলে সে-কাজটা বেশ ভালই চালিয়ে নিতে পারে, মজার মজার কথা বলতে পারে, প্রচণ্ড গুল দিতে পারে, মুক্ত হস্তে খরচ করতেও পারে, পরোপকারী—সব মিলিয়ে-মিশিয়ে শঙ্করের মত মানুষ অদ্বিতীয়।

ফিল্মে মন্দা পড়লে এই শঙ্কর এককালে ট্যুরিস্ট গাইড হিসাবে কিছুকাল কাজ করেছিল। কলকাতা সম্পর্কে তার ঘোড়ার ডিমের জ্ঞান। কিন্তু বিদেশী ট্যুরিস্টদের সে তার বিচিত্র ইংরেজীতে যা বোঝাত—ভেবে আমরা হতভম্ব হতাম।

একদিন আমরা কলকাতার রাস্তায় আউটডোর শুটিং শেষ করে ফিরছি, কালিঘাটের কাছে এসে দেখি শঙ্কর একদল আমেরিকান ট্যুরিস্ট নিয়ে হাসিমুখে কি-সব যেন বলতে বলতে চলেছে মন্দিরের দিকে। আমার তো ভারি মজা লেগে গেল। যে শঙ্কর ক্যামেরার পেছনে অত তুখোড়, লেন্স অ্যাপারচার, ফোকাশ, ফিল্মের ইমালশান নিয়েই প্রকৃত যার কাজ-কারবার, একদল হোৎকা সাদা চামড়ার ট্যুরিস্টদের নিয়ে সে কি করছে, দেখতে বড় লোভ হল।

গেলাম পেছন পেছন।

সায়েব-মেমেদের চোখে যা পড়ছে, তাই অভিনব। স্বভাবতই। একদঙ্গল ভিখারীকে হটিয়ে দিয়ে শঙ্কর তার ক্লায়েন্টদের নিয়ে বিজয় গর্বে মন্দিরে উপস্থিত হয়ে তার বিচিত্র ইংরিজীতে তাদের যা বোঝাল—শুনলে আপনার চক্ষুস্থির হবে।

—সাহেব, দিস ইজ আওয়ার টপ গডেস। ভেরি অ্যাংরী গডেস। অ্যাণ্ড ভেরি দয়ালু গডেস। আই মীন ভেরী কাইণ্ড গডেস।

জনৈক বিপজ্জনক সাহেব জানতে চাইলেন—তোমাদের এই গডেসের নাম কী।

শঙ্কর অম্লান বদনে তাকে বলল—শী ইজ মাদার ইংক!

শঙ্কর বেঙ্গলী টু ইংলিশ সোজা ট্রানস্লেশন করে দিল। মা অর্থে মাদার, আর কালি অর্থে ইংক। পরিষ্কার হিসেব।

শুনে সাহেবরা সম্ভবত তাজ্জব—কাণ্ড শোন, ভারতীয়রা দোয়াতের কালির-ও পুজো করে।

তারপর হাড়িকাঠ?

এটা ভয়াবহ, মানে শঙ্কর এদ্দিনে এর ব্যাখ্যা অন্ততঃ ইংরিজীতে দেবার মত এলেমদার হয়নি।

শোনা গেল, শঙ্কর, হরর-টরর যা ইচ্ছে তাই ইংরিজী ঝেড়ে এবং দেহ ভঙ্গিমায় খানিকটা মাইম (কি? মূকাভিনয়?) করে ওদের বলল—গ্রেট মাদার ইংক, ওয়ান্স ইন এ ইয়ার, সীট হেয়ার, হিয়ারস রিয়েল স্যাংস্‌ক্রিট (সংস্কৃত ওর দুর্জ্ঞেয় ভাষা, ক্লাসে ওই বিষয়ে ও নাকি বরাবরই গাড্ডু, তবু পণ্ডিতমশাই ওকে ভালবাসতেন, এখন শঙ্করের বিশ্বাস দেবীর মন্ত্র-ই একমাত্র খাঁটি সংস্কৃত, আর বইয়েরটা যে বেবাক খারাপ এবং অশুদ্ধ, এমনকি ট্যুরিস্টদেরও এটা বোঝা উচিত···) অ্যাণ্ড ঢ্যাং কুড় কুড়, দেন কামস বলিদান হেয়ার ইন দিস গিলোটিন অর হাড়িকাঠ—ঢ্যাং কুড় কুড়—মাটন ঘ্যাঁচ, ঢ্যাং কুড় কুড়—মাটন ঘ্যাঁচ, ঢ্যাং কুড় কুড়—মাটন ঘ্যাঁচ—

অর্থাৎ শঙ্কর বোঝাল, এক একবার বলির বাদ্যি বেজে ওঠে আর সঙ্গে

সঙ্গে পাঁঠা বলি হয়ে যায়, নাগাড়ে এটা চলতেই থাকে। মাটন চপের ওপর বিশেষ লোভ থাকায় শঙ্কর পাঁঠাকে মাটন যে বলবে— এ আর কি অসামান্য কথা…

সেই শঙ্কর কাপালিকের ছবির প্রস্তাব শুনে আহ্লাদে দে-লম্ফ। একগাল হেসে বললে—নাঃ, এ-ছবি তোদের হবেই। আমি লিখে দিতে পারি। কাপালিকদের হাতে এন্তার পয়সা অথচ ইনকাম ট্যাকসের লোকেরা সাহস করে ধরতে পারে না—অভিশাপের ভয়ে, সুতরাং ইস্টম্যান বল আর ফুজিকালার বল, রঙ্গীন ছবি একটা হবেই হবে। আমায় ভাই ক্যামেরাম্যান নিস, সস্তায় করে দেব, বোম্বে ফিল্ম ল্যাবরেটরীর নাদকার্ণির সঙ্গে আমার বিশেষ খাতির। বলতে গেলে একরকম মাগনায় নেগেটিভ ডেভালাপ করে দেবে।

—জয়ন্ত বলল—যাঃ, তুই কালা ফটোগ্রাফীর কি জানিস ? স্রেফ গুল—

শঙ্কর বলল—তাহলে তোরা লেটেস্ট খবর রাখিস না। আমি এই কিছুদিন হলো নাগাল্যাণ্ডে গিয়ে একটা কালার ডকুমেণ্টারী ছবির শুটিং করে এসেছি। টেস্ট দেখে নাদকার্নি আমায় টেলিগ্রাম করে কনগ্রাচুলেশন জানিয়েছে। দেখাবো তোদের সেই টেলিগ্রাম। পড়ে অজ্ঞান হয়ে যাবি তোরা।

জয়ন্ত বা আমি, কেউই ওর সেই টেলিগ্রামে উৎসাহী নই। শঙ্করও আর পীড়াপীড়ি করল না।

ফ্যাসাদ বাধলো ছবির শিল্পী নির্বাচনে। আমরা যাঁকে অনুরোধ করি, প্রযোজক একজন কাপালিক শুনে তিনি সঙ্গে সঙ্গে সে প্রস্তাব নাকচ করে দেন। মেয়েরা তো জয়ন্তর প্রস্তাবে হেসে লুটোপুটি—শেষ পর্যন্ত কাপালিক ধরলে ?

জয়ন্ত ক্রুদ্ধ।—কেন, কাপালিক মানুষ নয় ?

—না, মানুষ তো বটেই, কিঞ্চিৎ অতি মানুষ, তিনি মাথায় থাকুন।

পরিস্থিতি যখন এই তখন একদিন বিমর্ষ জয়ন্ত বলল—নাঃ, সব কেমন যেন গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে।

আমি কিছু বলবার আগেই ক্যামেরাম্যান শঙ্কর বলল—দেখ, খালি মুখের কথায় কিছু হবার নয়, ক্যাশ-কড়ি ছাড়, দেখবে সবাই রাজী হয়ে যাবে। বিনি পয়সায় তোমাদের কপাল হয় কিন্তু কুণ্ডলা হয় না।

জয়ন্ত গুম।

বললাম—কথাটা মিথ্যে নয়, তুই শঙ্করকে তোর সেই কাপালিক পার্টির কাছে একদিন নিয়ে যা, শঙ্কর পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে বলবে'খন—

জয়ন্ত তৎক্ষণাৎ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমাদের দুজনের দিকেই তাকালো। আমি তাড়াতাড়ি বললাম—তুই ঘাবড়াচ্ছিস কেন? শঙ্কর তোকে লেংগি মারার কোন চেষ্টা করলে আমরা ওর ছাল-চামড়া খুলে দেব না? ও যাবে কোন দিক দিয়ে?

শঙ্কর চোখে তখন একটা বিবাগী ক্লাসের দৃষ্টি ফুটিয়ে বলল—ওরে আমি যদি সেরকম খচ্‌ড়া হতাম তো ফিল্ম লাইনের বহু তাবড় মানুষের হাতে স্রেফ ভাঁড় ধরিয়ে কালিঘাটে পাঠিয়ে দিতে পারতাম। তোর ফাইনানশীয়ার তো মাত্তর সামান্য একজন কাপালিক—

জয়ন্ত কিছুক্ষণ গুম মেরে থেকে আমায় বলল—তাহলে তুই-ও বরং সঙ্গে চ। শঙ্করকে ঠিক বিশ্বাস করা যায় না, মানে ওর কথার তো কোন মাথা-মুণ্ডু নেই, কি বলতে কি বলে বসবে, কাপালিক হয়ত খচে ব্যোম হয়ে যাবে।

এইটাই আমি চাইছিলাম। পার্টি হাত-লেত্তি করে টেনে নেবার কোন অভিসন্ধি আমার নয়, আমি দেখতে চাইছিলাম, জানতে চাইছিলাম—আসলে ব্যাপারটা কি।

জয়ন্ত খাটো গলায় বলল—উনি নৈহাটীতে থাকেন, গঙ্গার পাড়ে একটা একতলা বাড়িতে—

—আশ্রম নাকি?

জয়ন্ত ইতঃস্তত করে বলল—না ঠিক আশ্রম-ও বলা যায় না, আবার গেরস্থর বাড়ি—তা-ও নয়, মাঝামাঝি—

দেবদ্বিজে ভক্তি অন্যান্যদের মত ফিল্মের মানুষের এক চুল কম নয়।

বরং খানিকটা বেশী। এখানে লাখ লাখ টাকার লেনদেন, ছবি যখন তৈরী হয় তখন টাকা যেন জলের মত হুড়-হুড় করে বেরিয়ে যায়, তাতে কোন কমা ফুলস্টপ নেই, কিন্তু সেই ছবি যখন বাজার মাৎ করে পর্দায় চলে তখন ফেরেও বটে, মানে লাখ লাখ সেই বানের জলের-ই মত। ফ্লপ করলে থান ইঁট। এত তুরন্ত লাভ এবং লোকসান পৃথিবীতে একমাত্র এই শো-বিজনেসেই আছে, অন্যত্র নেই। সেইজন্যে এই ট্রেডের মানুষের সংস্কারই বলুন বা কুসংস্কার—একটু বেশী করেই চোখে পড়ে। ঠাকুরের নির্দেশ না নিয়ে এখানে কোন কাজ হয় না। ঠাকুর বললেন—আচ্ছা বেটা, আভি তুম সিনেমা বানাও—ব্যস, শুরু হয়ে গেল ছবির কাজ। আবার ছবির মাঝপথে যদি ঠাকুর হঠাৎ ভক্তকে বলেন—সিনেমা বন্দ্ করো, সঙ্গে সঙ্গে সে-বায়োস্কোপেরও কম্মো ফতে।

কিন্তু সেই ঠাকুরকে গিয়ে যদি প্রশ্ন করা যায়—বাবা ঠাকুর, ইয়ে যো পিকচর ম্যায় আভি বানাতা হুঁ, বো হিট হোগী? ব্যস ঠাকুর দেখবেন কি বেধড়ক বাক্য দিচ্ছেন আপনাকে—তুম শালে পাপী হো, তেরেকু কোই ভলা নেই হোগা, হো নেই সকৃতা—

অথবা, অমুকে-তমুকের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে বায়োস্কোপের বারোটা বাজাচ্ছে, বাবাঠাকুর আপ জেরা উসকো সামহাল কর দিজিয়ে, সত্যনাশ হোনে কি পহেলে—তো ঠাকুর কি মধুরবাণী দেবেন—বো আভি বাচ্চে হ্যায়, চৈতন্য হোনে কি পহলে বইসাই হোতে হ্যায়, কোই ফিকির নহি, খুদ পরমাত্মাই সামহালেগা—

জয়গুরু।

কিন্তু প্যালারাম এসব বোঝে না। বায়োস্কোপ ইজ বায়োস্কোপ। সে বলে, কষে ধোলাই দাও, দেখবে সব বুজরুকী হাওয়া। পুরুষকার-ই বড়, ভাগ্য-ফাগ্য বোগাস। কি জানি। এতদিন ফিল্ম লাইনে লাইন দিয়ে পড়ে আছি, এখনও পর্যন্ত রহস্যটা ভেদ করতে পারলাম না।

নৈহাটীতে নেমে রিকসায় গঙ্গার পাড়ে গিয়ে ঠেলে উঠলাম

কাপালিকের আস্তানায়। চতুর্দিক রাশভারী আতরের গন্ধে মো মো করছে। ভেতরে ট্রানজিস্টার রেডিওতে বোম্বের ফিল্মের গান বাজছে শোনা গেল।

শঙ্কর বললে—হয়েছে। বায়োস্কোপের গান যখন বাজছে তখন ও আর দেখতে হবে না, তোদের এ ছবিটা হচ্ছে, নির্ঘাৎ।

জয়ন্ত ক্রুদ্ধ চোখে ওকে বললে—থাক, তোকে আর ফোরকাস্ট দিতে হবে না, যা কপালে আছে তাই হবে।

বাইরের একটা ঘরে আমাদের বসিয়ে জয়ন্ত ভেতরে গেল খবর দিতে। কিছুক্ষণ পর কাপালিক এলেন। মানে দরজায়। এসে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ফলে পেছনে ছিল জয়ন্ত, সে-ও।

আমি ততক্ষণে তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়েছি। এ-যে চেনা মানুষ। যতই জটাজুট আর রুদ্রাক্ষের মালা ঝুলুক না কেন, এ-মানুষকে কি কখনও ভোলা যায়?

জয়ন্তকে চমকে দিয়ে কাপালিকের এক হুঙ্কার, বলা বাহুল্য আমারই উদ্দেশ্যে—কিরে শালা, আবার এখানেও এয়েচিস

শঙ্কর ফ্যাল ফ্যাল, তার বোধগম্য হচ্ছে না ব্যাপারটা।

দাপটের সঙ্গে, মনে সে-যতই ভয় থাকুক না, বলতে হল—হ্যাঁ, এয়েচি। তা এখানে তোমার কি কারবার গুরুদেব? কি লীলা দেখাচ্ছো?

কাপালিক জয়ন্তকে দেখিয়ে বললে—এটি বোধহয় তোর বন্ধু?

—হ্যাঁ। বিশেষ বন্ধু।…তুমি একে ফাইন্যান্স করছ গুরু?

—ভেবেছিলাম, কিন্তু তোকে দেখে এক্ষুনি মত বদ্‌লালাম। নাঃ, ছবি করব না।

জয়ন্ত ভড়কে গেল—সেকি, আমার কি দোষ? ও শালা যদি আপনার সঙ্গে ইয়ে করে থাকে, সে-দোষ তো আমার নয়—

তখন আমি আর না থাকতে পেরে বললাম—জয়ন্ত কেটে পড়, পরে তোকে সব খুলে বলব—

কাপালিক সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রস্তাব অ্যাপ্রুভ করল—হ্যাঁ, কেটে পড়, আমিও তোকে পরে সব বুঝিয়ে বলব—

শঙ্কর ততক্ষণে বাড়ির বাইরে।

সে-ছবি হয়নি। জয়ন্ত বিশ্বাসই করেনি—এ-লোকটা ফ্রড, এ-লোকটা নোট জাল করতে গিয়ে একবার জেল খেটেছিল বছর চারেক, তারপর জেলে দাঁড়ি রেখে রেখে মেয়াদ শেষ হবার পর সেখান থেকে বেরিয়ে প্রথমে সাধু সেজে বাজার গরম করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু সেখানে বিশেষ সুবিধে হয়নি, রবীন বাঁড়ুজ্যের রদ্দা খেয়ে সরে পড়েছিল, সেই লোকটিই আবার কাপালিক সেজে ফিরে এসেছে !

জয়ন্ত এখনও ভাবে, সম্ভবতঃ নিজের সম্পর্কেই—'পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ ?'

আমি যাঁর কথা লিখছি তিনি বাংলা ছায়াছবির জগতের একজন প্রবীণ খ্যাতনামা অভিনেতা। আজকাল আর তাঁকে ছবিতে দেখা যায় না। শরীরের গতিক ভাল নয় দেখে তিনি বেশ কিছুকাল আগে ফিল্ম এবং স্টেজ থেকে বিদায় নিয়ে এখন বাড়িতেই থাকেন। সেই ভদ্রলোক একদিন সকালে উঠে খবরের কাগজ খুলে দেখেন তিনি আর ইহলোকে নেই ; গত রাত্রেই পরলোকগমন করেছেন। আর সেই শোক সংবাদটি বেশ ফলাও করেই কাগজে ছাপা হয়েছে।

এটা পড়ে ভদ্রলোকের আক্কেল গুড়ুম, আরে, এটা কি ব্যাপার ? তিনি জলজ্যান্ত বেঁচে রয়েছেন অথচ তাঁর মৃত্যু সংবাদ ছাপা হয়ে গেল ? উনি হাসবেন না কাঁদবেন—কিছুক্ষণ স্থির করতেই পারলেন না।

অথচ সেই সংবাদ রটে গেল ক্রমে। চারিদিকে হুলুস্থুলু কাণ্ড। হয়েছে কি, ওঁর সেই অসুস্থতা সাময়িক কিছু বাড়াবাড়ি হতে ওঁকে সম্পূর্ণ নিরাময় করে তোলার জন্য হাসপাতালে দেওয়া হয়েছিল। সংবাদপত্রের রিপোর্টার আগের দিন রাত্রে টেলিফোনে ওঁর স্বাস্থ্যের খবর নিতে গিয়ে নাকি শুনতে পান, অমুক ? অমুক তো মরে গেছেন। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে ওবিচুয়ারি রিপোর্ট কম্পোজ হয়ে গেল—প্রবীণ অভিনেতার পরলোক গমন। আর পরদিন সকালে হাসপাতালের কেবিনে শুয়ে সেই সংবাদ

পড়ে অভিনেতা ভদ্রলোকের কি রিঅ্যাকশান! নিজের গায়ে চিমটি কেটে তবে তাঁকে সেদিন বুঝতে হয়েছিল—সংবাদপত্র তাঁকে মারলেও আসলে তিনি কিন্তু মরেননি···

যাক, ভুল ধরা পড়তে পরদিন সেই একই কাগজে ভ্রম সংশোধন ছাপা হয়ে বেরুলো—না, না, উনি বেঁচে আছেন, সুস্থ আছেন, আমরা দুঃখিত। কিন্তু দেখুন, তার আগে ড্যামেজ যা হবার তা পুরোদস্তুর হয়ে গেছে। রাশী রাশী শোকবার্তা টেলিগ্রাম পিয়ন বিলি করে গেল। সাদা ফুলের মালা গুচ্ছের এসে গেল। শোকাভিভূত অনেকের চোখে মানুষটির স্মৃতি স্মরণে জল এসে গেল। গুণমুগ্ধরা আর দেরী না করে সেদিনই সন্ধ্যেবেলায় ধড়াধ্বড় কয়েকটা শোকসভা করে বসলেন। আবার সে-সব সভার রিপোর্ট যখন কাগজের অফিসে পৌঁছাল তখন উদ্যোক্তারা টের পেলেন কেলেঙ্কারী, উনি জলজ্যান্ত বেঁচে আছেন। আরে ছিঃ।

এই ঘটনার পর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। অভিনেতা ভদ্রলোক বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন। হঠাৎ একদিন ভোর বেলায় আমাদের ফিল্মের সুনীল রায় চৌধুরী (সুনুদা) গুপীদের কাছ থেকে একটা ফোন পেলেন। সুনুদা ফোন তুলে সাড়া দিতে গুপী কাতর কণ্ঠে বলল—দাদা, উনি চলে গেলেন—বলে অভিনেতা ভদ্রলোকের নাম উল্লেখ করল।

সুনুদা স্তম্ভিত।—কিরে গুপে, খবরটা ঠিক পেয়েছিস তো?

গুপী জোর গলায় ঘোষণা করল—তা নয়তো সকালে তোমায় গুল মারছি? পাক্কা খবর।

সুনুদা অপ্রস্তুত ভঙ্গীতে গুপীকে বুঝিয়ে বললেন—না না মানে বুঝতেই তো পারছিস···গতবার ওঁকে নিয়ে ওইরকম একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড হয়ে গেছে, তাই বলছিলাম আর কি! তোকে খবরটা কে দিল?

গুপী তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সূত্র উল্লেখ করে বলল—আজ সকালে আমায় ফোন করেছিল। ওঁর বাড়ির কাছেই থাকে, আমার বন্ধু। সে বললে, ওবাড়িতে মড়াকান্না উঠেছে।

—বটে বটে!

গুপী তখন বলল—সুনুদা, এইটুকু শুনে বুকের মধ্যেটায় কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল, ওনাকে কতটা রেসপেক্ট করতাম, বুঝতেই তো পারছেন—

সুনুদা অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন—তারপর তুই ওঁদের বাড়িতে ফোন করেছিলি তো ?

গুপী বলল—ওঁর বাড়িতে ফোন নেই তো। তবে বন্ধুটাকে বললাম, তুই একবার ভাল করে কান পেতে শোন তো,—বন্ধুটি বলল, হ্যাঁ রে হ্যাঁ, ভাল করে শুনেই তবে তোকে ফোন করছি। ডেথ নিউজ নিয়ে তো ঠাট্টা করা যায় না। ব্যস্, এই পর্যন্ত। এখন বল কিংকর্তব্যং ?

সুনুদা আমতা আমতা করে বললেন—দাঁড়া দাঁড়া, হুট করে একটা ডিসিশান নিলেই তো হবে না, তুই বরং এক কাজ কর, তুই এখন লাইনটা ছেড়ে দে, আমি কর্তাদের সঙ্গে একটু পরামর্শ করে তোকে রিং-ব্যাক করছি।

গুপী বলল—সেই ভাল, আমি ফোনের কাছেই বসে রইলাম—

বলে সে ফোন ছেড়ে দেবার উদ্যোগ করতেই সুনুদা তাড়াতাড়ি, যেন লাস্ট মিনিট চেক-আপ, বললেন—তাহলে তুই বলছিস—দাদা নেই ?

—বলছি।

—কখন গেলেন ?

—কান্না যখন শেষরাত্রে উঠেছে তখন মনে হয় শেষ রাতেই—

—অ।

—তুমি চিন্তা করো না। খবরটা কনফার্মড। তুমি নিশ্চিন্ত মনে কর্তাদের সঙ্গে পরামর্শ-টর্শ করতে পার। জানবে, গুপী কখনও ফালতু খবর নিয়ে মাথা ঘামায় না···

লাইন কেটে গেল।

দাদা শেষ পর্যন্ত চলেই গেলেন। বুকভাঙা একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল সুনুদার।

সুনুদা বয়সে ছোট হলেও দীর্ঘদিন এই ফিল্মে একসঙ্গে কাজকর্ম

করেছেন। সুখ-দুঃখের মধ্যে একত্রে ওঁদের অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। বেদনায় বুকটা টন টন করে উঠল। আহা, বড্ড ভালবাসতেন আমাকে, একবার শেষের দেখাটাও হলো না। একটা অপরাধবোধ মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করতে লাগল। কলকাতার শহরতলীতে ওঁর বাড়ি। কতদিন ভেবেছেন একটু অবসর করে দেখা করতে যাবেন, কিন্তু তা আর শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠল না।

সুমুদা সম্বিত ফিরে পেয়ে তাড়াতাড়ি ফোন তুললেন। ডায়াল করলেন উত্তমকুমারকে—খবর শুনেছ? দাদা কাল রাত্রে চলে গেলেন—

—সেকি?

—হ্যাঁ। এইমাত্র খবর পেলাম ফোনে—

—সংবাদটা ঠিক তো? মানে গতবার...

—ঠিক খবর। গুপে ফোন করে এই মাত্তর আমায় জানাল, পাকা খবর—

—ইস!...

উত্তমকুমার দুঃখ করে বললেন—সুমুদা, একজন খাঁটি মানুষ চলে গেলেন।...যাই হোক, তোমরা যাচ্ছ ওঁর বাড়িতে?

—হ্যাঁ যাচ্ছি—

—সুমুদা, আমার তরফ থেকে একটা রীদ্ (শোকজ্ঞাপক সাদা ফুলের মালা) দিয়ে দিও। উত্তমকুমার শোকার্ত কণ্ঠে বললেন।

—দেব।

উত্তমকুমার বললেন—আর হ্যাঁ, যদি সম্ভব হয় তো একবার শ্মশানে যাব। তুমি ওখানে পৌঁছে আমাকে ফোনে একবার খবর দিও। আমি বাড়িতেই রইলাম—

—ঠিক আছে।

বলে লাইন কেটে দিয়ে সুমুদা একের পর এক ফোন করে দাদার মৃত্যু সংবাদ জায়গায় জায়গায় পাঠিয়ে দিলেন। স্টুডিওতে ফোন করে কোন লাভ নেই। কারণ দিনটা রবিবার। সব স্টুডিও এমনিতেই

বন্ধ। এখন শুধু স্টেজগুলো বন্ধ করা দরকার। ধীরে ধীরে সে-সব জায়গাতেও খবর দেওয়া হল।

ইতিমধ্যে গুপীর ফোন এলো—কী ব্যাপার। সেই তখন থেকে হা-পিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে রয়েছি ফোন করবে বলেছিলে অথচ তা-ও করলে না, এখন কী করব? কি সিদ্ধান্ত হলো তোমাদের? যাচ্ছ কি যাচ্ছ না?

সুনুদা বললেন—যাচ্ছি। তবে গুপে তুই এট্টা কাজ কর তো, তুই কলেজ স্ট্রীট মার্কেট থেকে গোটা পাঁচেক রীদ-এর অর্ডার দিয়ে করিয়ে রাখ। অনেকেই যেতে পারছেন না। অতএব তাঁদের বী-হাফে আমাদেরই নিয়ে যেতে হবে। টাকা আছে?

—এ্যাঁ?

—বলি তোর সঙ্গে টাকা আছে? রীদ কেনার?

—না তো—

সুনুদা বললেন—ঠিক আছে। তাহলে শুধু তৈরী করিয়ে রাখ। আমি গিয়ে পেমেন্ট করব। তারপর সবাই একসঙ্গে মিলে যাওয়া যাবে।

সুনুদা তৈরী হয়ে বেরুতে বেরুতে হঠাৎ ওঁর খেয়াল হল—যাঃ, আজ যে একটা টেকিং আছে। কী হবে?

সুনুদা, কোন প্রাপ্তিযোগকে খাটো করে বলেন—টেকিং। সুজাতা ছবির বাবদ আজ সে ছবির প্রোডিউসার বিশ্বনাথ নান সবাইকে একটা টোকেন মানি দিয়ে সই-সাবুদ করাবেন স্থির ছিল। তাছাড়া সুনুদার নিজের পকেটের অবস্থাও তখন বিশেষ ভাল নয়। এতগুলো রীদের টাকা সেটা অবশ্য মার যাবে না, সবাই পরে দিয়ে দেবে, কিন্তু ট্যাকসি খরচা? অন্যান্য রাহা খরচা?

ভাবলেন, যাই তবে ধর্মতলাটা হয়েই যাই বরং। ওঁদের খবরটাও দেওয়া হবে আর সেই সঙ্গে অ্যামাউণ্টের টেকিং-টাও হয়ে যাবে। ভালই হবে। পকেটে রেস্ত না থাকলে আবার শোক-টোকগুলো ভাল আসে না।

ধর্মতলায় গিয়ে প্রথমে ভাঙ্গলেন না। দুঃসংবাদটা দিলে হয়ত বিশ্বনাথ নান্ বেঁকে বসবে। বলবে, এই রকম একটা শুভ সূচনায় যখন ব্যাগড়া পড়ল তাহলে আজ আর কাউকে পেমেণ্ট করব না, আর একটা শুভদিন দেখেই বরং……। না, না, সুনুদা বহুত দূর তক্ পৌঁছা হুয়া আদমী, ও লাইনেই হাঁটলেন না। যাক্, ভালয় ভালয় টেকিং পর্বটা হয়ে গেল। ফাউ হিসাবে বড়কা সাইজের দু-পীস্ সন্দেশও জুটে গেল। সুনুদা জল-টল খেয়ে তারপর খবরটা ভাঙ্গলেন। শুনে সবাই থ।

পিনাকী মুখার্জি-ই আঘাত পেলেন সবচেয়ে বেশী। মুহূর্তে তাঁর চোখে জল এসে গেল। কিছুক্ষণ কথা বলতেই পারলেন না।

সুনুদা বললেন—চল্ পানু, শেষ দেখাটা দেখে আসি, অন্ততঃ শেষের প্রণামটা আমাকে আজ গিয়ে দিতেই হবে।

কাট্-টু কলেজ ষ্ট্রীট।

গুপী উদ্বিগ্ন মুখে ঘন ঘন সিগ্রেট টানছে আর প্রতিটি ট্যাকসি দেখছে। আর তার ওপর নজর রাখছে ফুলওলা। সে ভাবছে, মাল তৈরী করে আবার কেটে না যায়, আর গুপী ভাবছে ইস্, বড্ড জোর ফেঁসে গেলাম তো। এখন যদি সুনুদা না আসে? যা খামখেয়ালী মানুষ। হয়ত অন্য পথে কারও সঙ্গে চলে গেছে দাদার ওখানে। তাহলে? ফুলওলা কি সহজে ছাড়বে? চল্লিশ পঞ্চাশ টাকার মাল, পকেটে পয়সা বলতে নেই, এখন কি উপায়?

দুঃশ্চিন্তায় গুপী হঠাৎ ঘামতে শুরু করল। একি সাংঘাতিক প্যাঁচে পড়লাম।

এমন সময় সুনুদা এসে হাজির। সঙ্গে পিনাকী মুখার্জি। দেখে গুপী আশ্বস্ত হলো। বাপরে, না এলে ফুলওলা যে ওকে আজ প্যাঁদাতো এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। না প্যাঁদাক, অপমান তো বিলক্ষণ করতো। আর সেটাই বা কি এমন আহ্লাদের কথা।

—হয়েছে রীদ্?

গুপীর তখন কি হেককড়—দাও তুলে দাও মাল, হ্যাঁ হ্যাঁ, ট্যাকসিতে..

ক-টাকা হয়েছে যেন তোমার? পয়তাল্লিশ? পাবে না, পাবে না। বাসী ফুল চালিয়ে আর পয়তাল্লিশ পেতে হয় না। সুনুদা, ওকে চল্লিশটে টাকা দিয়ে দাও তো, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওতেই রফা হয়ে যাবে···।

ট্যাকসিতে বড় একটা কথা হল না। গাড়ী সটান গিয়ে বাড়ির সামনের গলিটায় দাঁড়াল। সুনুদাই দাঁড় করিয়ে দিলেন।—বুঝলি না হুট্ করে রীদ নিয়ে গিয়ে হাজির হওয়াটা ঠিক হবে না। তোরা গাড়ীতে বস, আমি টুক করে গিয়ে হাওয়াটা বুঝে আসি—

বলে সুনুদা গলিতে অদৃশ্য হলেন। সেখানেই দাদার বড় কন্যার সঙ্গে দেখা। বেচারি কাঁদতে কাঁদতে তাঁর স্বামীর সঙ্গে কোথায় যেন চলেছে। ব্যস, সুনুদা তৎক্ষণাৎ মোর দ্যান কনফার্মড। সঙ্গে সঙ্গে থমথমে আষাঢ়ের আকাশ হয়ে গেল ওঁর মুখ। আর সুনুদাকে আসতে দেখে দাদার মেয়েরও কি কান্না। স্বভাবতই, সুনুদার কান্না এসে গেল। অতিকষ্টে সামলে নিয়ে প্রশ্ন করলেন—কোথায় যাচ্ছিস?

—শ্মশানে সুনুকাকু।

—চলে গেছে—

—হ্যাঁ, এই তো কিছুক্ষণ আগে—

সুনুদা দৌড়ে ফিরে এলেন ট্যাকসিতে। পিনাকী মুখার্জিকে বললেন হাঁ করে দেখছ কি? রীদগুলো বার করো। শ্মশানে যেতে হবে—

পিনাকী মুখার্জি ট্যাকসির বুট থেকে রীদগুলো বের করতে তৎপর হলেন। গুপীর কাঁদো কাঁদো চেহারা, চোখ ছলছল।

মেয়েকে সান্ত্বনা দিলেন সুনুদা—কাঁদিসনে মা কাঁদিসনে। এখন মনটা শক্ত কর, শেষকৃত্যগুলো এখন তো সব তোকেই করতে হবে।

হঠাৎ জামাই বললে—মা যে হঠাৎ এইভাবে চলে যাবেন, আমরা কেউ ভাবতেই পারি নি—

সুনুদার মাথায় কেউ যেন হঠাৎ দুম্ করে হাতুড়ির বাড়ি মারল

মা? মা মানে?

জামাই বললে—হ্যাঁ, মা যে যাচ্ছেন এটা বুঝতেই দিলেন না কাউকে?

স্নুদা ফ্যাল ফ্যাল করে খানিকটা তাকিয়ে থেকে বললেন—তাহলে দাদা?

মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে—বাবা উপরের ঘরে রয়েছেন। ওখানে আর আর সবাই রয়েছে স্নুকাকু—

বলে ওরা চলে গেল।

আর স্নুদা খানিকটা গুম মেরে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ হুঙ্কার দিলেন,—গুপে, অ্যাই গুপে—

গুপী ততক্ষণে আমসী।

ভয়ে ভয়ে আমতা আমতা করতে করতে বলল—তা-আ-আ-আমি কি করে বুঝব যে—

—শাট আপ, তোর জন্যে আজ আমার···উঃ পানু আর ঢং করে রীদ বের করতে হবে না। দাদা নয়, বৌদি। এই রাস্কেলটা আজ আমায় স্রেফ ডুবিয়েছে। এখন আমি আর আর সবাইকে কি করে যে ফেস করব—এক ভগবানই জানেন। উঃ—

পিনাকী মুখার্জি তখন কাঁচুমাচু হয়ে বললেন—স্নুদা, কেলেঙ্কারী যা হবার হয়েই গেছে, এখন চল রীদ্‌গুলো অন্তত শ্মশানে পৌঁছে দেওয়া যাক—

স্নুদা বোমার মত ফেটে পড়লেন—আমি যাব? ওই রাস্কেলটা যাবে। গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে। আবার দয়া করে কার্ডগুলো সমেত যেন দিয়ে না আসে, পানু তুমি কার্ডগুলো এক্ষুনি ইয়ে করে দাও অর্থাৎ ডেস্ট্রয়, নইলে কেলেঙ্কারী আজ চূড়ান্ত উঠবে। উঃ! আজ কার মুখ দেখেই যে শয্যাত্যাগ করেছিলাম। হায় হায়।

গুপী ততক্ষণ যেন জনি বেলিণ্ডা হয়ে গেছে। অনুগত বিমর্ষ ভঙ্গীতে ওই ভারী ভারী রীদগুলো কাঁধে চাপিয়ে আড়াই মাইল দূরের শ্মশানের পথে যাত্রা করল। আর মনে মনে বন্ধুটির আদ্যশ্রাদ্ধ করতে লাগল। হাতের কাছে সে ব্যাটাকে একবার পেলে হয়, স্রেফ কিচক বধ করে ছাড়ব।

তারপর ওঁরা স্নু আর পানু গেলেন দাদার সঙ্গে দেখা করতে। কী

আর করা, দাদা চালাক মানুষ, উনি দেখলেই বুঝবেন যে আবার একটা গণ্ডগোল হয়েছে। একে সদ্যমৃত স্ত্রীর শোক, তার ওপর এই মিসআণ্ডার-স্ট্যাণ্ডিং। সুনুদার ইচ্ছে করছিল গুপেটাকে খুন করে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে।

ওঁরা গিয়ে দাদার বিছানার পাশে দাঁড়াতেই দাদা হাউ হাউ করে কেঁদে বললেন—সুনু, এসেছিস। আয় আয়। তোর বৌদি চলে গেল। আয় পানু আয়। খবরটা কে দিল তোদের?

—ওই ইয়ে মানে ওই রাস্কেলটা, গুপে—বলেই সুনুদা তৎক্ষণাৎ সামলে নিলেন নিজেকে। কেলেঙ্কারী, প্রায় ফাঁস হয়ে গিয়েছিল আর কি! কিছুক্ষণ পর ফেরার পালা।

গুপী শ্মশান থেকে ফিরে এসে গুম মেরে দাঁড়িয়ে আছে ট্যাকসিতে ঠেশ দিয়ে। পাঞ্জাবী ড্রাইভাররা আবার সিগ্রেট খায় না, নইলে একটা চেয়ে নেয়া যেত। পকেট গড়ের মাঠ।

সুনুদারা ফিরে এলেন। দুজনেরই চোখ-মুখ থমথম করছে।

ট্যাকসি আবার কলকাতার দিকে ফিরে চলল।

সুনুদা ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন—পানু, আমি ভিখারী হয়ে গেলাম। ট্যাকসির মিটার যা দেখলাম তাতে মনে হচ্ছে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাতেই ষাট টাকার মত লাগবে। রীদের টাকাগুলো গেল। ও আর ফেরৎ পাওয়া যাবে না। আজকের স্মল টেকিংটা একবারে গরুর মত দুয়ে নিয়ে গেল এই রাস্কেলটা, গুপেটা—

গুপে সামান্য নড়েচড়ে বসল মাত্র, কিছু বলল না।

—ভেবেছিলাম টেকিং-এর পর তোকে নিয়ে আজ এট্টু ভালমন্দ চাইনীজ খাব, কতদিন খাওয়া হয়নি, তা কপালে নেই—

হঠাৎ ভয়ে ভয়ে গুপী বলল—সুনুদাদা, এট্টু চা খাওয়াবে? তেষ্টায় গলাটা কাঠ হয়ে গেছে—

সুনুদা এমন বিকট একটা আওয়াজ দিলেন যে মায় পাঞ্জাবী ড্রাইভার সেও তাড়াতাড়ি ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল।

সুমুদা দু হাত মাথার ওপর তুলে তখন চেঁচাচ্ছেন—স্কাউণ্ড্রেল, চা খেতে চাইতে তোর লজ্জা করছে না? তুই একাই আজ একটা জলজ্যান্ত মানুষকে মেরে ফেলবার তালে ছিলি তুই আবার কথা বলছিস ? চা খেতে চাইছিস? আমার এতগুলো টাকার পিণ্ডি চটকালি অথচ তোর চা খেতে চাইতে ঘেন্না করছে না?

(প্রথম পর্ব সমাপ্ত)

বায়োস্কোপিক

লেখকের অন্যান্য বই ঃ

হিপিসঙ্গমে

বায়োস্কোপিক (২য়) [যন্ত্রস্থ]

ঘটনা সামান্য [যন্ত্রস্থ]

॥ দুই ॥

আমাদের দেশের এই যে এই শো-বিজনেস - এতে বাঙালীদের দান-ই যে সবচেয়ে বেশী, সে কথা স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। প্রথম ভারতীয় বায়োস্কোপ হীরালাল সেন মশাই করেছিলেন না ফাল্‌কে সাহেব করেছিলেন—এ নিয়ে বিতর্ক আছে। তবু হীরালাল সেন মশাইয়ের নাম লিস্টের মাথায় আছে, এই সত্যকে কে এড়িয়ে যায়? এরপর দেখুন বাঙালীরা কিভাবে এই শো-বিজনেসের মাথায় চড়ে আছেন; বোম্বেতে শশধর মুখার্জি, সুবোধ মুখার্জি, হৃষিকেশ মুখার্জি, শক্তি সামন্ত, প্রমোদ চক্রবর্তী, অশোককুমার, কিশোরকুমার, শচীন দেববর্মন, রাহুল দেববর্মন—এঁদের খ্যাতি আসমুদ্র-হিমাচল পর্যন্ত বিস্তৃত। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের আসরে সত্যজিৎ রায়কে সবাই চেনে, শ্রদ্ধা করে, আর আছেন ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, তপন সিংহ। এঁরা হচ্ছেন চলচ্চিত্র জগতের সত্যিকারের পার্সোনালিটী। এঁদের বাদ দিলে ভারতীয় চলচ্চিত্রের কিছু কি শেষপর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে?

গোড়ার দিকে ঝাঁসি এবং ভাগলপুর থেকে বাঙালীদের স্বতন্ত্র দুটি দল এসেছিলেন চলচ্চিত্র শিল্পে। প্রথম দলটি চলে যান বোম্বেতে, শেষেরটি যোগ দেন বাঙালীর সাংস্কৃতিক তীর্থভূমি কলকাতায়। শশধর মুখার্জিরা হলেন ঝাঁসির। অর্ধেন্দু মুখার্জিরা ভাগলপুরের। এঁরা এখন লতায়-পাতায়-পল্লবে আমাদের এই আধুনিক শো-বিজনেসের শিরায়-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়েছেন। তপন সিংহ, পিণাকী মুখার্জি, দিলীপ মুখার্জি, অনিল চ্যাটার্জি, ছায়া দেবী এবং আরও অনেকে হচ্ছেন ভাগলপুর গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। আবার ঝাঁসি গ্রুপের সঙ্গেও এঁদের নিবিড় আত্মীয়তা উঠেছে। ছায়াদেবী যেমন শশধর মুখার্জির নিকট আত্মীয়, তেমনি শশধর মুখার্জির এক ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে অধুনা লোকান্তরিত জনপ্রিয় অভিনেতা দীপক মুখার্জির কন্যার। আবার অশোককুমার কিশোরকুমারদের

ভগ্নিপতি হচ্ছেন স্বয়ং শশধর মুখার্জি। ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পে শশধর মুখার্জির অবদান অসামান্য। সম্প্রতি ভারত সরকার ওঁকে পদ্মশ্রী উপাধি দিয়ে যোগ্য সম্মানই দিয়েছেন।

বোম্বেতে যেসব বাঙালী এখন সুপ্রতিষ্ঠিত, কেরিয়ার গড়ে তোলার জন্য সূচনায় এঁদের প্রত্যেককেই অমানুষিক স্ট্রাগল করতে হয়েছে। ওখানে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কেউ কুসুমাস্তীর্ণ ভূমি পান নি। কঠিন জীবন-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি ভূমি দখল করতে হয়েছে সকলকে। তবেই এঁরা প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন।

যান মাদ্রাজে, সেখানেও কিছু বাঙালীকে ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রীর শীর্ষে দেখতে পাবেন। আগে মাদ্রাজে কোন স্টুডিও ছিল না। ওঁরা ছবি করবার জন্যে সদলবলে কলকাতায় আসতেন। তারপর ওখানে যখন একে একে স্টুডিও গড়ে উঠল তখন কলকাতা থেকে বিরাট একদল কলাকুশলী মাদ্রাজে গিয়ে নবনির্মিত স্টুডিও'র প্রাথমিক কাজকর্ম করে দিয়ে এসেছিলেন। বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান-পরিচালক অজয় কর মশায়কে মাদ্রাজীরা নিয়ে গিয়েছিলেন, পরে অবশ্য উনি কলকাতায় ফিরে আসেন। কলকাতা থেকে ওঁরা তখনকার দিনের খ্যাতনামা মেকআপম্যান হরিবাবুকে নিয়ে গিয়েছিলেন। হরিবাবুই ওখানে প্রথম আধুনিক মেকআপ শিল্পের প্রবর্তক। শিবাজী গণেশন পর্যন্ত হরিবাবুর বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। হরিবাবুর ছেলে নানুবাবু এখন মাদ্রাজী চলচ্চিত্র শিল্পের একজন বিশিষ্ট মানুষ। নানুবাবু অবশ্য তাঁর বাবার লাইনে যাননি উনি ফিল্মের কাহিনী ও চিত্রনাট্যে বেশী প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। আর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ক্যামেরাম্যান নিমাই ঘোষ। ওঁকে মাদ্রাজের চলচ্চিত্র শিল্পের সকলেই বিশেষ শ্রদ্ধা করে। মাদ্রাজে চলচ্চিত্র কলাকুশলীদের যে ফেডারেশন গড়ে উঠেছে, নিমাইবাবু হচ্ছেন তার প্রেসিডেন্ট। স্মরণ থাকতে পারে, কলকাতায় 'ছিন্নমূল' নামে উদ্বাস্তু-সমস্যা নিয়ে প্রথম যে ছবিটি তৈরী হয়েছিল এবং পরে যে-ছবিটি প্রথম সোভিয়েত রাশিয়ায় যায়, সে ছবিটি উনিই পরিচালনা করেছিলেন।

বাঙালীর ব্রেন আছে, পরিকল্পনা করা এবং তার সুষ্ঠু রূপ দেবার ক্ষমতা আছে, সূক্ষ্ম শিল্পবোধ আছে, উপস্থিত বুদ্ধি আছে, শুধু যেটা নেই তা হচ্ছে টাকা। সেই জন্যেই আমরা শো-বিজনেসে পড়ে পড়ে মার খাচ্ছি, আর ফয়দা তুলছে অবাঙালী ফিল্ম মেকার্সরা। ঠিক আছে, আমরা জেলাস নই, কেউ যদি টু-পাইস কামায়, আমাদের কিছু বলবার নেই। তবে একটা কথা আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একদিন বাঙালীর পুণঃপ্রতিষ্ঠা অনিবার্য। চাকা একদিন ঘুরবেই। ঘুরতে বাধ্য।

এই দেখুন ধান ভানতে বসে শিবের গীত হল, তবু আমি মশাই আশাবাদী, এখানে শক্তি সামন্ত মশাই সম্প্রতি একটা বায়োস্কোপ করেছেন বাংলায়, তার ধাক্কায় দেখুন ছেলে-ছোক্‌রারা কেমন হিন্দী বায়োস্কোপ ফেলে এখন সেই বাংলা ছবিতেই ভীড় করছে। এটা একটা দারুণ ভাল লক্ষ্মণ। এরপর হৃষিকেশবাবু একটা করবেন, প্রমোদবাবু একটা করবেন—হিন্দীর সঙ্গে সঙ্গে একখানা করে বাংলা ছবি, ফলে দেখুন না কেমন রম্‌ রম্‌ করে সেসব ছবির কাটতি হয়। আর এই করতে করতেই একদিন কলকাতায়ও হিন্দী ছবির পরেব পর সব প্রোডাকশন শুরু হয়ে যাবে। কি, হবে না?

বোম্বেতে স্তম্ভিত করে দেওয়ার মত বাঙালী ক্যারেকটার সম্ভবতঃ একটিই আছেন। আর তিনি হচ্ছেন কিশোরকুমার। এতবড় শো-ম্যান বড় দেখা যায় না। নাচে, গানে, অভিনয়ে যাকে বলে একেবারে অদ্বিতীয়। এক ওঁকে কেন্দ্র করে বোম্বের ফিল্ম লাইনে এত গল্প চালু আছে যে সেসব যদি লিখতে আরম্ভ করি তাহলে বছর খানেকের আগে তা শেষ হবে বলে মনে হয় না।

জুহু-তে প্রথম যেদিন আমি ওঁর বাড়িটা দেখি, আমি মশাই বেশ তাজ্জব। বাংলো বাড়ি, সমুদ্র অদূরে। ডানদিকে তাকালে আমি যদি দেখি একজন একটা শর্ট পরে সমুদ্রের তীরে গুনে গুনে ডন-বৈঠক ঝাড়ছেন,

সন্দেহ কি তিনিই কিশোরকুমার। অসম্ভব খামখেয়ালী মানুষ। মাথায় একটা কিছু চাগালে আর রক্ষে নেই, সেটা না করা পর্যন্ত ওঁর আর রেহাই নেই।

বিমল রায়ের সহকারী দেবু সেন আমাদের বন্ধু। উনি তখন ভ্রান্তিবিলাসের হিন্দী সংস্করণ তুলেছিলেন হিন্দীতে। কি যেন নাম? হ্যাঁ, মনে পড়েছে, 'দো-দুনে চার'। ছবির নায়ক কিশোরকুমার। ওঃ, সে এক কাণ্ড। একদিন আন্ধেরীতে দেবু সেনের সঙ্গে হঠাৎ দেখা, সঙ্গে ছিলেন অশোক ঘোষাল। দু'জনেরই মুখ শুকিয়ে আমসি।

—কি ব্যাপার ভাই?

দেবু সেন বিরস কণ্ঠে বললে—আর বলেন কেন মশাই, আজ থেকে একটানা সাতদিন আমার শুটিং করবার কথা কিন্তু সব গুবলেট হয়ে গেল—

—কেন? আমি অবাক।

অশোক ঘোষাল বললেন—কিশোরকুমার সটকে গেছে—

—এ্যা? সটকেছে মানে?

—মানে কেটে পড়েছে। বাড়িতে গিয়ে শোনা গেল উনি নাকি আজই ভোরের ফ্লাইটে ব্যাঙ্গালোর চলে গেছেন কোন্ কম্মে, শুনে সবার মাথায় হাত।

—এঃ, দ'য়ে বসবার অবস্থা আর কি, এরপর আর কিছু কারো বলার থাকে? আমি প্রমাদ গুনে মানে মানে অতঃপর সরে পড়েছিলাম।

এর কিছুদিন পরে শুনলাম, ভ্যাট, উনি কোথাও যাননি। ঘাপ্টি মেরে বাড়ির মধ্যেই নাকি ছিলেন। দুদিন পরে দেবুর সঙ্গে দেখা হতে বলেছেন—কি ব্যাপার, আমায় সেদিন নিতে এলে না কেন?

দেবুই তখন বলবার তালে ছিল, আচ্ছা তো মশাই, আপনি এই রকম বিনা নোটিশে কেটে পড়লেন? আমাদের সব প্রোগ্রাম যে আপসেট হয়ে গেল?

কিশোরকুমার হেসে বললেন—বো ঠিক হ্যায়, চলো ম্যায় আভি তুমহারা শুটিং কর্ দেতা, কোই ফিক্র নহি—

বিব্রত দেবু সেন সে-কথা শুনে জেট প্লেনের গতিতে তৎক্ষণাৎ

স্টুডিওতে দৌড়, সেট যাতে ভাঙ্গা না পড়ে—সেই নির্দেশ দিতে। তারপর ভালয় ভালয় সাতদিন একটানা শুটিং হয়ে গেল। কিশোরকুমার ভেরি পাংচুয়াল, ভেরি অ্যাকমোডেটিং আর্টিস্ট তখন, কোন হুজ্জোত হাঙ্গাম নেই।

কাজ শেষ হয়ে যাবার পর কিশোরকুমার নাকি একদিন দেবু সেনকে বলেছিলেন, আমি আসলে তোমার ক্যারেকটার স্টাডি করছিলাম—

দেবু হেসে একাকার।

—দাদা, এটা আপনার ক্যারেকটার স্টাডি হলো? ওদিকে ভয়ে আমার যে প্রাণপাখি খাঁচাছাড়া হবার দাখিল—

কিশোরকুমার জানতেন—সকালে স্টুডিওর গাড়ি আসবে, ওঁকে মোহন স্টুডিওতে নিয়ে যাবার জন্যে। কিন্তু হঠাৎ কি-যে হলো, উনি দ্বারোয়ানকে ডেকে বললেন—বলবে আমি নেই, আমি ব্যাঙ্গালোর চলে গেছি, ওক্কে?

—হাঁ-জী।

আর সেদিন দেবু সেন নিজেই এসেছিল ওঁকে তুলতে, সঙ্গে অশোক ঘোষাল। দ্বারোয়ান সাফ বলে দিল—সাহাব সুবে নিকাল গয়া?

—নিকাল গয়া? দেবু সেনের চোয়াল ঝুলে যাবাব দাখিল, সে ফিরে, বললে—ফিরে কব তক্ আয়েঙ্গে?

—মুঝে মালুম নহি; করিব সাত রোজ তো জরুর হোঙ্গে।

—অ্যাঁ, সা-ত-দি-ন, ও অশোক; আমার যে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। এখন কি হবে?

আর বাইরে এইসব যখন ঘটছে, তখন বাড়ির ভেতরের এক ফোকর দিয়ে তা অদৃশ্যে সব দেখে যাচ্ছেন স্বয়ং কিশোরকুমার। দেবুর অবস্থা দেখে নাকি উনি ক্যারেকটার স্টাডি করছিলেন। পরে দেবুকে বলেছিলেন, ম্যায় তো সব দেখ চুক। তুমি বড্ড নার্ভাস টাইপের ছেলে। তোমার উচিত এক্ষুনি ভাল ডাক্তারকে কনসাল্ট করা। এখন থেকে ট্রিটমেন্ট করালে হয়ত ভাল হয়ে যেতে পার…

একবার এক আর্কিটেকট ভদ্রলোক এলেন কিশোরকুমারের সঙ্গে

দেখা করতে। ভদ্রলোক আমেরিকা ফেরৎ, নামজাদা স্থপতি, আধুনিক ডিজাইনের ইমারৎ তৈরিতে সিদ্ধহস্ত। ভদ্রলোক আবার কিশোরকুমারের মস্ত একজন ফ্যান।

কিশোরকুমার তো ভদ্রলোককে বিলক্ষণ খাতির করলেন।

আব্ বাতাইয়ে? ঠাণ্ডা ইয়া গর্ম? চা-কফি খাবেন না কোক্? সন্দেশও খেতে পারেন, রসগুল্লাও দিতে পারি—

ভদ্রলোক এত খাতিরের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বিব্রত শশব্যস্ত ভঙ্গীতে বললেন—কিছু না কিছু না, আমি কিছুই খাব না—

কিন্তু কে-কার কথা শোনে। কিশোরজী ভদ্রলোককে প্রায় জোর জবরদস্তি খাইয়ে দিলেন—বাঙালীর বাড়িতে অতিথি সৎকার হবে না? অসম্ভব, খেতে আপনাকে হবেই।...এখন বলুন কি দরকারে এসেছেন?

অনুরোধে ঢেঁকি গেলার মত খাবারগুলো খেয়ে ভদ্রলোক দম নিয়ে জানালেন, বড় বড় বিল্ডিং তৈরি করাই হচ্ছে তাঁর পেশা। তিনি বোম্বের বহুৎ রইস্ আদমীর মোকান তৈরি করে দিয়েছেন। সে-সব বাড়ি, আহা দেখতে এমন সুন্দর হয়েছে যে একবার তাকালে চোখ ফিরিয়ে নেয়া শক্ত। যাই হোক তাঁর বহুদিনের ইচ্ছা যে তিনি কিশোরজীর জন্যে অমন সুন্দর এট্টা বাড়ি তৈরি করেন, অনেষ্ট।

আর সেই প্রস্তাব শুনে কিশোরকুমার সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন।

বললেন—কোই ফিকর নহি, বাড়ি তৈরিতে আমার কোন আপত্তি নেই, তবে আমার প্ল্যানও খানিকটা নিতে হবে—

এ-কথা শুনে আর্কিটেকট ভদ্রলোক মহাপুলকিত। কিশোরজী যে এত সহজে রাজী হয়ে যাবেন তা তিনি কল্পনাও করেন নি। সুতরাং হৃষ্ট কণ্ঠে বললেন—বেশক বেশক, আপনার বাড়ি করব অথচ আপনার ছোটখাটো কোন প্ল্যান নেব না—একি কখনও হয়? নিশ্চয় নেব। এখন বলুন তো আপনার প্ল্যানটা?

কিশোরকুমার গম্ভীর গলায় তখন বললেন—বাড়িটা আমার অন্তত পক্ষে আটতলা হওয়া চাই।

আর্কিটেকট গদগদ কণ্ঠে জবাব দিলেন—ওকে, তাই হবে।

কিশোরকুমার এবার বললেন—অথচ বাড়িতে কোন সিঁড়ি থাকবে না।

আর্কিটেকট কেমন যেন থতিয়ে গেলেন, সিঁড়ি থাকবে না—এটা আবার কি-রকম কথা?

প্রশ্ন করলেন—তাহলে শুধু কি লিফট থাকবে?

—না, তা-ও থাকবে না।

শুনে আর্কিটেকট ভদ্রলোক কিঞ্চিৎ ঘাবড়ে গেলেন—তাহলে স্যার, আটতলা বাড়িতে নামা-ওঠা করবেন কিভাবে? আমার দিমাগে কিছুই ঢুকছে না ব্যাপারটা—

—ঢুকবে ঢুকবে, বুঝিয়ে বললে সব ঢুকে যাবে—কিশোরকুমার স্থপতিকে আশ্বস্ত করে বললেন—ধরুন, আমি যদি টার্জেনের মত একটা কিছু করি?

—টার্জেন?...এর মধ্যে আবার টার্জেন কি-করে এলো?

কিশোরকুমার একগাল হেসে বললেন—হ্যাঁ টার্জেন। বায়োস্কোপে টার্জেনের ছবি দেখেন নি?

ভদ্রলোক ভয়ে ভয়ে ঘাড় নেড়ে জানালেন—হ্যাঁ দেখেছি।

—তবে আবার কি! স্রেফ টার্জেনের স্টাইলটা ফলো করতে হবে আমাদের। প্রত্যেক ফ্লোরে একটা করে মোটা কাছি দড়ি নীচে পর্যন্ত ঝোলানো থাকবে, আর আমি সেই দড়ি ধরে টার্জেনের মত আঁ-আঁ-আঁ-আঁ-আঁ আওয়াজ করতে করতে জাম্প দিয়ে নামব।

শুনে ভদ্রলোকের চক্ষু ছানাবড়া, আরেব্বাস, এ বলে-কি?

কিশোরকুমার তখন দারুণ উৎসাহে বলে চলেছেন—তারপর আসুন, এবার বাড়ির গ্রাউণ্ড-ফ্লোরটা যে-রকম ভেবেছি—ওটা হবে একটা ছোটখাটো লেক, ড্রইংরুমের সব কিছু—সোফা, টেবিল, চেয়ার, আলমারি সেই লেকের জলে যেমন নৌকো, ঠিক তেমনিভাবে ভাসতে থাকবে, আর প্রত্যেকটির সঙ্গে দুটো করে দাঁড় থাকবে। ধরুন টেলিফোন বাজলো,

আমি সোফার দাঁড় বেয়ে গিয়ে ফোনটা অ্যাটেণ্ড করলাম। আর হ্যাঁ, লেকের জলে নানারকম মাছ থাকবে, লাল, নীল, সবুজ, বেগনী, রুই, কাৎলা, হিলশা···। বলুন আইডিয়াটা কি-রকম লাগল?

আর্কিটেকট্ ভদ্রলোকের অবস্থা ততক্ষণে রীতিমত কাহিল হয়ে গেছে। তিনি তখন চম্পট দেবার প্ল্যান ভাঁজছেন, বাড়ির প্ল্যান সাক্ষাৎ মাথায় উঠে গেছে। তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে কিশোরকুমারের দিকে তাকালেন। মুখে আর বাক্য যোগাচ্ছে না।

কিশোরকুমার এরপর হঠাৎ বললেন—আর এট্টু কফি খান দাদা, আমার মাথায় আর একটা ফ্রেশ্ আইডিয়া এসে গেছে, মারাত্মক, বলছি—

শুনে ভদ্রলোক বিপন্ন, কাতর কণ্ঠে শশব্যস্তে বলে উঠলেন—কিশোরসাহাব মুঝে আজ ছোড় দিজিয়ে, ম্যায় পিছে কোই বক্ত আপসে ফিরে মিলুঙ্গা, মালুম দেতা আজ আপকো তবিয়ৎ আচ্ছা নহি—

কিশোরকুমার প্রতিবাদ করে বললেন—একদম ভুল বললেন, আমার শরীর আজ সবচেয়ে ভাল আছে। শুনুন—

উনি বলবার উদ্যোগ করতেই তাড়াতাড়ি ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে জোড়হস্তে বললেন—মুঝে মাফ কর-দিজিয়ে, ম্যয়—

বলে দরজার দিকে এগোতে আরম্ভ করলেন। কিশোরকুমার তাঁকে যত বাধা দেন ভদ্রলোক তত মরিয়া হয়ে ওঠেন। এবং এই করতে করতে এক ফাঁকে ভদ্রলোক কিশোরকুমারের বগলের তলা দিয়ে কোন গতিকে গলে দে-দৌড়, আর দাঁড়াবার ভরসা হল না তার, কি জানি যদি পেছনে তাড়া করে। বাপস্···

এত বড় গায়ক, গলায় এমন অসাধারণ মেলোডি এক কিশোরকুমারের যা আছে তেমন আর কজনের আছে? ওঁর ছেলে অমিত ক্রমে তৈরি হচ্ছে। পিতা-পুত্রের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক সে তো নিজের চোখেই দেখলাম। ওপেন স্টেজে যাঁরা ওঁকে গাইতে দেখেন নি, তাঁরা নিশ্চিত

কিছু মিস্ করেছেন। বোম্বে সেন্ট্রালের একটা হাউসে একবার এক কিশোরকুমার এনআইটিই-তে গিয়েছিলাম। তিন ঘণ্টার একটা একক প্রোগ্রাম উনি নেচে গেয়ে হেসে কেঁদে কিভাবে যে শ্রোতাদের মুগ্ধ বিমুগ্ধ করে রাখলেন—সেকথা লিখে বোঝান সম্ভব নয়।

উনি একবার একটা ছবি কবেছিলেন যাব কাহিনী, চিত্রনাট্য, অভিনয়, সঙ্গীত-পরিচালনা, প্লে-ব্যাক, প্রযোজনা এবং পরিচালনা—একধারে সবই ওঁর। এ-পর্যন্ত উনি যে-কটি ছবি কবেছেন, সব কটিতেই ওই একই ব্যাপার। তা আমার দেখা সেবারের সেই ছবিটির নাম ছিল 'হাম দো ডাকু'। ওঁর দাদা অনুপকুমার আর উনি মিলে সে-ছবিতে যা হুল্লোড় করেছিলেন যাঁরা দেখেছেন—জীবনে ভুলতে পারবেন না। ছবি দেখার সময় হাসতে হাসতে আমার কতবার যে দমবন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে, তার লেখা-জোকা নেই। গল্পের অবশ্য কোন মাথা-মুণ্ডু ছিল না। দুই বন্ধু একটা বিতিকিচ্ছিরি মোটরগাড়িতে করে দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছে। গাড়িতেই তাদের যা-কিছু সর্বস্ব। দুজনেই নাকি রিসার্চ-স্কলার। নানান পার্থিব বিষয় নিয়ে গবেষণা করছে। হঠাৎ ওরা গিয়ে পড়ল একটা অদ্ভুত দেশে। সেখানে এই অনধিকাব প্রবেশের দায়ে একদল সৈন্য তাদের ধরে নিয়ে গেল তাদের রাজাব কাছে। রাজাটি মস্ত এক খিটকেল। পার্টটা করেছিলেন বিখ্যাত কমেডিয়ান ভগবান। রাজা তো ওদের দেখে খচে ভ্যোম। বিনা পারমিশনে রাজ্যে ঢুকেছে? সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপিটাল পানিশমেণ্টের সাজা হল। রাজা ওদের কোতল করবার হুকুম দেবার আগে জানতে চাইলেন—কমবক্ত, তুমে কোই কুছ আর্জি হ্যায়?

কিশোরকুমার তৎক্ষণাৎ দাপটের সঙ্গে জবাব দিলেন—জরুর হ্যায়।

রাজা বললেন—বলে ফেল।

কিশোরকুমার বললেন—আমি যে কে তা জানেন?

রাজা ভাবলেন, কে রে বাবা? একটু ঘাবড়ে গিয়ে জানতে চাইলেন—কেন বাবা, তুমি কে?

কিশোরকুমার বলে উঠলেন—হম হ্যায় এক ইনকাম ট্যাকস অফিসার—

ইনকাম ট্যাকস অফিসার শুনেই রাজার মুখ ভয়ের চোটে শুকিয়ে আমসি (অথচ গল্পের রাজা কিন্তু মধ্যযুগের, তীর ধনুক তরোয়াল সম্বল), তিনি শট করে সিংহাসন থেকে উঠে পড়ে অস্ফুটে মন্তব্য করলেন—সত্যনাশ, মর গিয়া, মুঝে বাঁচাও—বলতে বলতে ছুটে এসে কিশোর-কুমারের পা ধরে কাকুতি-মিনতি আরম্ভ করে দিলেন।

আমি হাসতে হাসতে ঘটনার আইরনিটা শুধু ভাবছিলাম। এ-এক কিশোরকুমারের পক্ষেই ভাবা সম্ভবপর, করা সম্ভবপর যেটা এদেশে আর কেউ পারবেন, মনে হয় না। কিশোরকুমার, তোমার জয় হোক।

আমি আর সুকুমার, আমরা এই দুজন দাঁড়িয়ে আছি সেই সকাল সাতটা থেকে। সুকুমার তার ক্যামেরা নিয়ে, ভাবখানা যেন সে ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না, দাঁড়িয়ে পরপর দুটি সিগ্রেট পোড়াল। শীতের সকাল, সুকুমার গলায় ঠিকই কম্ফোর্টার জড়িয়ে রেখেছে, বায়োস্কোপের কাভারেজ বলে এমন স্বদেশী কম্মো তো কিছু নয়, ঠাণ্ডা লাগলেই গলা খুকখুক, তখন অ্যান্টিবায়োটিক টেনে টেনে ধুন্ধুমার, বরং সে বড়ই অস্বস্তিকর, অতএব···

টালিগঞ্জে অনেকক্ষণ সকাল হয়েছে, নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর মাথায় গোটা রাত ধরে যে হিম ঝরে পড়েছিল, এখন রোদ্দুর যত উষ্ণ হবে আকাশের হাতছানিতে সে হিম বাষ্পের আকারে ঊর্ধ্বগামী, যেন ডানা মেলা পাখির মত মহাশূন্যে গা ভাসাবে। এরই মধ্যে সংসার সীমান্তের বায়োস্কোপের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সূচনা। স্টুডিওর ফটক ডিঙিয়ে একে একে সব গাড়ি ঢুকছে, আর তা থেকে নামছেন ছবির কলাকুশলী আর শিল্পীরা। উবু হয়ে রোদ পোয়াতে বসা দ্বারোয়ানরা শরীরের আলস্য ঝেড়ে, তীর বেগে ঠেলে উঠে, স্যালুট ঠুক্কে ঠুকে আবারো রোদে গা এলিয়ে···এই হচ্ছে ব্যাপার।

আর একটা ব্যাপার হচ্ছে মিডিল-টোন ; ছবিতে মিডিল-টোন না

থাকলে রস থাকে না, রূপটা কোন গতিকে টিকে থাকে মাত্র। বায়োস্কোপের বড় তাই মিডিল-টোন। ওটা রাখুন, সব বজায় রইল, কিন্তু ওটা ফেলে দিন দেখবেন চকচকে ভাবটা অন্তর্হিত। খাঁটি কথা। সংসার সীমান্তে দাঁড়িয়ে আমার ভাবনা এখন মিডিল-টোন নিয়ে। এই যে গল্পটা ফেঁদেছিলেন একজন কবি-কথাকার, কি আশ্চর্য, মাঝখানে কতগুলো বছর চলে গেল, পৃথিবী থেকে অনেকগুলো রকেট উঠে চাঁদের বুকে মানুষ নামা-ওঠা করিয়ে আবার ফিরে এল, গল্পটি কিন্তু অম্লানই রয়ে গেল। এই যে এই মুহূর্ত পর্যন্ত, এই যে এখন নিঃশ্বাস নিচ্ছি—এই অনুপল পর্যন্ত। যে-যার সীমান্তে এখনও আমরা প্রতিপক্ষের দিকে, যেন রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে, মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে সোনালি কোন স্বপ্ন দেখার প্রত্যাশায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র কি-জানি কি ভেবেছিলেন, একজন বেউশ্চে, আর এক ব্যাটা চোর, ত্রিভুবনে ওদের অস্তিত্বের খাতিরে কবি মানুষ কত মমতার সঙ্গে এমন সব লিখলেন যে এখনও, বিড়ম্বিত ভাগ্য আমি, আমরা ঈর্ষার সঙ্গে ভাবি—আসলে আমিই অঘোর, সামাজিক ছক্কা-পাঞ্জায় আমি এক ঠেঁটো চোর, অহর্নিশি মালের সন্ধানে কলকাতার অলিতে-গলিতে ঘুরপাক খাই—ওটা উনি নিশ্চিত আমাকে ভেবেই সেদিন লিখেছিলেন। অঘোরের কত প্রেস্টিজ, শেষ পর্যন্ত সিনেমার পর্দায় এসে গেল, কত তরিবৎ আদর আপ্যায়ন করে বেউশ্চে রজনী আর ছিঁচকে চোর অঘোরকে সেলুলয়েডে এনে ফেলা হচ্ছে, অতএব হরিপদ কেরানী আর নয়—অঘোর চোর হওয়াই ভাল। ধ্যাঃ, ভাল আর কি আপাদমস্তক হয়েই আছি যে!

—কী? সুকুমার সপ্রশ্নে ভ্রূ-ভঙ্গী করল—কি বিড়বিড় করছ?

রঞ্জনের খ্যাক খ্যাক হাসি, শালা যেন ধূর্ত এবং ফচকে শেয়াল, বললে—নিজের ফিউচার ভেবে ইয়ে করছিলাম। চল, চা খাওয়া যাক। খাবে?

—নাঃ, এখন না, পরে। সুকুমার নিজের ক্যামেরার লেন্সে যেন নিজেরই প্রতিবিম্ব দেখছে।

—আচ্ছা সুকুমার, তোমরা তো ফটো তোলো, ছবির মিডল-টোন গায়েব হয়ে গেলে ইমেজটা কিরকম দাঁড়ায়?

সুকুমার অবাক। ভাবখানা, প্রাতঃকালে বায়োস্কোপের খবর করতে এসে রঞ্জনের শালা যত্ত বাজে হেঁয়ালী। এখন টোন নিয়ে পড়ছে, কিছু পরে দু'পাঁচটা ট্যাকা হাওলাত চাইবে। একেবারে নিশ্চিত। সুকুমার বিষম বিরক্ত হওয়ার ভঙ্গী করে বলল—ওসব এখন থাক।

তবে থাক। আমার বয়েই গেছে। তুমি চিরকাল লেন্স, ফোক্যাস আর অ্যাপারচার নিয়েই থাকো। দুনিয়ার প্রেস ফটোগ্রাফাররা সবাই এক নয়, কিন্তু আমি আর আমরা কয়েকজন এক। ভাওয়াল সন্ন্যাসী আর অঘোর—আমার কাছে সবই এক কিস্তির মাল। ইতালীতে জন্মালে মিকেলেঞ্জোলো আন্তনিয়নি হয়ত আমিই হতাম, কলকাতায় জন্মে অপরাধ। প্রকৃত অঘোর হয়েও সেই হরিপদ হয়ে আছি। কেন? ব্যাটা স্লাই ফক্স। কিছুতেই জীবনের মিডিল-টোন নিয়ে বাক্য বলবে না। আসলে ভয়ের চোটে অস্থির ; বলে যদি ফ্যাসাদ হয়। আরে কত ফ্যাসাদ হবে? যে সমাজে এখন আছি, এটা কি? বানান ভুল হল? মরুক গে। আদি-গঙ্গার ধারে বেউশ্যে পাড়ায় ওই জিনিসটি কিন্তু নেই। অর্থাৎ মিডিল-টোন। চোরের আবার, বেশ্যার আবার জীবন, তায় মিডিল-টোন। যত ফালতু কথা। বেড়েক ভাই, বেড়েক ভাই, লম্পট চোলাইটানা বদমায়েস যেন কাপ্তেনটি সবাই। অথচ বাস্তবে দেখ, গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী চাপিয়ে তাতে ইন্টিমেট ঢেলে গন্ধে মো মো করে আমরা, না না, আমরা নই, বাবুরা সবাই আদি-গঙ্গার জলে তরতাজা রূপোলী ইলিশ মাছ দর করছে। ছবি তোলো সুকুমার, তোমার ক্যামেরা বর্তে যাবে হে…

স্টুডিওতে কার মাথায় যেন কাক ইয়ে করে দিয়ে গেছে, তাই নিয়ে কত হাসাহাসি। প্রাতঃকালে একি কাণ্ড। একজন ছুটে গেল মেকআপ ঘরের দিকে। দু-তিনজন রূপকার, তারা খেটে-খেটে হয়রান। প্রথমে একগাদা মেয়ের মেকআপ, তারও পর রয়েছে নায়ক-নায়িকা। সাত-সকালে ক্যান্টিনে আঁচ পড়েছে, চা আর কফির কাপ হাতে হাতে ঘুরছে, সবাই এক লহমায় উষ্ণ হতে চায়, শীতের জড়তা কাটিয়ে টান টান শরীরে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়, কিন্তু সব চাইলেই কি আর পাওয়া যায়?

অথচ মাত্র কয়েকটা দিন আগে পর্যন্ত, এখন আপাতত যেখানে কালিঘাটের সেই বারবনিতাদের বস্তিটা, প্রধানত খোলার চালে চাওয়া, আচমকা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, ওটা আগাছা জঙ্গলে ভরা স্টুডিওরই একটা মাঠ ছিল। কার্পেন্টি বিভাগের কর্মীরা করাত আর বাটালি দিয়ে কাঠের কাজ করত আর হ্যাঁ পাখিরা জঙ্গলের গাছগাছালির ডালে শীতের সকালে কিছু না কিছু রোদ পুইয়ে হুস হুস খাদ্যের সন্ধানে টালা থেকে টালিগঞ্জের আকাশে উড়ত—সে মাঠের কি বিচিত্র রূপান্তর। একদিন আমি ওখানে গিয়ে অবাক। আর বাহ, তরুণ মজুমদার তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে, দেখি, ওখানে দাঁড়িয়ে। পাশে শিল্প-নির্দেশক উঃ, রবি চাটুজ্যে, সবাই শলা-পরামর্শ করে সংসার সীমান্ত বায়োস্কোপের সেট তৈরি করছেন। এখানে বজনী থাকবে। আর ব্যাটা চোর অঘোর চুরির দায়ে একদিন পুলিশের তাড়া খেয়ে পালাতে পালাতে ঠেলে উঠবি তো ওঠ, সটান রজনীরই ঘরে—এই মাগী, টু শব্দ করবি তো পেট একদম ফাঁসিয়ে দেব।

আতঙ্কে রজনীর চোখ দুটি স্থির।

চোরের হাতে ধারাল লম্বা একটা ছুরি; লম্ফর কাঁপা কাঁপা আলোয় সেটা ঝিলিক হানছে।

ব্যস! যাকে বলে জীবনের মিডিল-টোন, সেলুলয়েডের ফিতেয় মিনিটে নব্বুই ফুট ছাপ ফেলতে ফেলতে এগিয়ে চলতেই থাকল।

সাদা অ্যাম্বাসেডর গাড়িটা দৌড়ে এসে ঝুপ করে ব্রেক কষে স্থির হয়ে দাঁড়াল স্টুডিওর লনে। নামলেন সৌমিত্র চ্যাটার্জি। কব্জি উল্টে কে যেন ঘড়ি দেখলেন। কাঁটা মিলিয়ে সৌমিত্র এসেছেন শট্ দিতে, প্রসন্ন মুখে। গাড়ি এক্ষুনি ফেরৎ যাবে। গিয়ে ওঁর ছেলেমেয়েকে ইস্কুলে পৌঁছাবে। প্রোডাকশন চীফ দিলীপ ব্যানার্জি, আদতে একজন পাকা মাউন্টেনীয়ার, শক্ত পায়ে নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন, সৌমিত্র চ্যাটার্জিকে মৃদু হাসিতে অভ্যর্থনা করলেন। তৎক্ষণাৎ বোঁ করে একজন দৌড়ে গেল, এক পেয়ালা গরম কফি চাই···

সৌমিত্র পাক্কা দেড় ঘণ্টা নিলেন। মুখে রং চাপড়ালেই অভিনেতা হওয়া যায় না, অঘোরের রূপসজ্জা নিতে দেড় ঘণ্টা সময় লেগেই থাকে, কি করা।

আসল খেলাটা তরুণবাবুর। এটা যদি বায়োস্কোপের গল্প হয়, এই সংসার সীমান্ত, বাবারে, কত ছ্যাপা এই কাহিনীতে। সাবেক ব্যাপারটা স্মরণ হয় এখন আমার। কত তাবড় পরিচালক এই গল্পের ওপর কাজ করেছেন। ঋত্বিক ঘটক, রাজেন তরফদার ছাড়া আরও কতিপয়। ঋত্বিক ঘটকের মুখে একদিন এর স্ক্রীন-প্লে শুনেছিলাম, আরিপ্ বাপ্, শুনে আমার চক্ষুস্থির, এটার নাম বায়োস্কোপ? রাস্টিক, ছন্নছাড়া, বাউণ্ডুলে ফেরেব্বাজ অঘোর শালা স্বপ্ন দেখে—রজনীকে বে করে ব্যাটা গেরস্থ হয়েছে, স্বপ্নবৃত্তান্ত আগুনের হল্কার মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে ঠেলে আকাশমুখো, আমি চেয়ার উল্টে মাটিতে পড়ে যাই আর কি।

অথচ তরুণ মজুমদার বায়োস্কোপে কত মিষ্টি মধুর কিশোর প্রাণের প্রেম-প্রণয়ের গল্প বলেন, আহা, আর সেই মানুষটি যাহা সংসার সীমান্তে হেঁটে হেঁটে এসে দাঁড়ালেন, আমার কি ধন্দ! বুকের পাটা নিশ্চিত ইয়াব্বড়, নইলে এ-গল্পে ছবি করা আর আঙুলে বে-মক্কা রক্তমুখী নীলা ধারণ সে প্রায় একই ব্যাপার।

তরুণ মজুমদার চিত্রনাট্য লিখে-টিখে প্রায়ই যেতেন কালিঘাটের ওই বেউশ্যে পল্লীতে। নিপাট ভদ্দরলোক, হুট হুট গাড়ি থেকে নেমে গলিতে ঢুকতেই পল্লীবাসিনীদের মধ্যে কি দারুণ কমোশান—এটা কে-রে বাপ? পুলিশ নয় তো? দেখ দিকি লোকটি কার ঘরে সেঁধুল? মতলবটা কি?

একদিন তরুণবাবু গল্প করছিলেন, বুঝলেন, ওখানে যাওয়াটা মানে জিনিসটা ভালভাবে বুঝে নেবার দরকার ছিল। গোড়ার দিকে ওরা খুব সন্দেহের নজরে দেখত, আমি, আমার সহকারী মিলে একদল মানুষ, ওদের ঘাবড়ে যাবারই কথা। সমাজে ওরা শুধু বঞ্চনার দিকটাই দেখেছে, ওরা প্রতারিত, পরে ওদের সে ভয়টা ভাঙল। আমরা বুঝিয়ে বললাম গল্পের

দিকটা, ছবির ব্যাপারটা, বলা বাহুল্য ওরা খুশী। তারপর থেকে সবরকম সহযোগিতা পাওয়া গেছে ওদের কাছ থেকে। এইভাবে প্রাথমের সেই হার্ডলটা আমি, আমরা উত্তীর্ণ হয়ে গেছি···

সেট সাজানো হচ্ছিল। তরুণ মজুমদার দাঁড়িয়ে তদারক করছিলেন। বস্তির উঠোনে স্তূপীকৃত জিনিসপত্র। মেয়েরা একদল। তরুণবাবু বলেছিলেন, আপনারা যে-যার ঘর পছন্দ করে নিন। তারপর সাজিয়ে ফেলুন নিজের পছন্দমাফিক।

পদ্ম গোলাপী বসন—যাইহোক এরা শিল্পী কেবল বায়োস্কোপের বারবনিতা সাজা অর্থাৎ প্রিটেণ্ড করা, ন্যায্যভাবে প্রিটেণ্ড করতে পারলে অভিনেতা একদিন শিল্পী হয়ে যান—এটাই তো থিয়োরী, তাও আবার সজ্ঞানে। দেখি মেয়েবা শাড়ী গাছকোমর বেঁধে নিজের নিজের ঘর সাজাচ্ছেন সযত্নে। হলো পরিপাটি বিছানা। দেয়ালে পারা খসা আয়না ঠাকুর দেবতার ছবি। খানকতক এরোটিক ছবি। সস্তার স্নো পাউডার আলতার শিশি শাড়ি ব্লাউজ, সায়া। আর হ্যাঁ, দিশী মদের বোতল। সিঙ্গিল রিডের হারমোনি ফেঁসে যাওয়া তবলা। আর যত সাংসারিক দ্রব্য—সিলভারের ঘটি-বাটি থেকে শুরু করে ঘোড়ার নাল-টি পর্যন্ত। দেহ নিয়ে বেসাতি কত মানুষ আসে-যায়, কত হাসি-কান্না মাতলামো প্রতিশ্রুতি এবং আশাভঙ্গ—আদি-গঙ্গার জলে পবিত্র আর নোংরা জল যেমন মিলে-মিশে একাকার, কালি কালি কলকাত্তাবালী, ওগো ফটোওয়ালা সুকুমার, জীবনের মিডিল-টোন এখানে জন্মের মত নির্বাসিত পার তো খানকতক ফটো তুলে রাস্তার মোড়ের হোর্ডিং-এ টাঙিয়ে দাও, কেল্লা ফতে হয়ে যাবে···

—বসো রঞ্জন, বসো সুকুমার। স্নিগ্ধ আপ্যায়ন তরুন মজুমদারের। জগদীশ এদের চা দাও--বলে তনুদা কাজে ডুবে গেলেন। এই বায়োস্কোপটা তনুদাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। জীবনের মস্ত বড় একটা রিয়ালিটী নিয়ে এর পত্তন। বহুল পঠিত গল্প। সবাই ওৎ পেতে আছে। উনি গিয়েছিলেন দিল্লীতে। সেখানে গিয়ে শুনলেন, সত্যজিৎ রায় এখন রাজধানীতে।

তনুদা সোজা চলে গেলেন সত্যজিৎবাবুর কাছে। দু'জনের মধ্যে গাঢ় প্রীতির সম্পর্ক। আলোচনা হল শুধু সংসার সীমান্ত নিয়েই। তনুদার কিছু কনফিউশান ছিল, আলোচনায় সেটা দূর হল। নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে তনুদা দেখলাম খুবই সচেতন, স্পষ্ট করেই বললেন আমি যে ধরনের গল্পে ছবি করি এটা তা নয়, এটা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের গল্প, সুতরাং আমায় খুব সতর্ক হয়ে কাজ করতে হচ্ছে।

ঠিকই। এটা একটা ডিপারচার। তনুদা কিন্তু ঠিকই উৎরে দেবেন বলে প্রত্যয় হচ্ছে। ওঁর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস আছে। মেকারের আত্মবিশ্বাসই ফিপটি পার্সেন্ট ছবিকে এগিয়ে রাখে, এ-দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি।

এবার এদিকে দেখুন, অদূরে একটা দড়ির খাটিয়ার উপর বসে দুটি বারবনিতা উকুন বাছছে। সৌমিত্র সহাস্যে—জানেন তো মানুষ উকুন বেছে মেরে ফেলে আর একটা প্রাণী খেয়ে ফেলে—

পাদপূরণ: বাঁদর, বাঁদর।

সৌমিত্র লাঞ্চ সেরে সেটে এসেছেন। মাথার ওপর শীতের সূর্য দ্রুত পশ্চিম দিকে চলছে। হাতে দামী সিগ্রেট জ্বলছে।

ক্যামেরায় বসেছেন তনুদা। অ্যারিফ্লেক্স ক্যামেরা, ব্লিম্ফ দিয়ে আপাদ-মস্তক মোড়া। আসল ক্যামেরাম্যান রেজা সন্ধ্যা রায়ের মুখে দু' কিলো লাইট ফেলছে—ফুল টাইট ফুল টাইট—

দুখী ইলেকট্রিশীয়ান আলো তৎক্ষণাৎ ফুল টাইট করে দিল। সূর্যের আলোর সঙ্গে কৃত্রিম আলো পাঞ্চ করা হচ্ছে। ওটা ককটেল হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

উঠোনে বারবনিতার কেউ বাঘবন্দি খেলছে কেউ পোষা বেড়ালটি জাপ্টে আদর করছে, ট্রানজিস্টার রেডিওতে চটুল হিন্দী গান গাক গাক করে বাজছে, একটা মেয়ে টাইট জিনস পরে হিন্দী বাদ্যের সঙ্গে নাগাড়ে নাচছে, রজনী তখন রান্না চাপিয়েছে সবে। বসে বসে শিল-নোড়ায় বাটনা বাটছে ঘস ঘস শব্দে।

হেনকালে অঘোরের আগমন।

দিব্য সাজগোছটি করে রীতিমত বাবু-বাবু ভঙ্গীতে সঙ্গে এনেছে একটা উপহার—জেল্লাদার একখণ্ড শাড়ি, সাত সকালেই চোলাইটি টেনে চক্ষুটি রঙিন করে তবে এসেছে মেয়ে মানুষের সান্নিধ্যে—

লেবাবা, কথা কয় না যে ?

রজনী চোখ তুলে দেখে সেই ছুরমুশমুখো হাড়হাবাতে শয়তানটি আবার এসেছে। বেউশ্যেকে যে ঠকায় সে মানুষ ? সে আস্ত একখণ্ড জানোয়ার।

অঘোর মিটি মিটি হাসে।

বলে—চিনতে পারলি নে ? আমি রে আমি।

বাক্য শেষও হয় না, সট করে মুখটা ঈষৎ বাঁ-কাতে সরিয়ে নেয়, আর সঙ্গে সঙ্গে বোঁ করে বেরিয়ে যায় একটা ফ্লাইং মিসাইল—নোড়া নোড়া, আই বাবাগো—কি র‍্যা খুন করবি নাকি ?

এই খণ্ড দৃশ্য আমরা দাঁড়িয়ে, শালা মাথার ওপর একটা কাক তখন থেকে জ্বালাতন করছে কা-কা-কা, একজন ধাঁ করে একটা আধলা ইট ছুঁড়ে মারল, মর শ্যালা মর শ্যালা, সাউণ্ড ইঞ্জিনীয়ার বললে—হাই ফ্রিকোয়েন্সীতে সব্বার আগে শালা কাগের ডাক রেকর্ড হয়ে যায়, ডায়লাগ ট্র্যাকের তেইশটা বাজিয়ে দিয়ে যায়, হুস হুস……

সৌমিত্র মোড়ার ওপর আরাম করে বসলেন। সপ্রশ্নে তাকালেন আমার দিকে—দেশলাই আছে ?

—কী ?

—কালা নাকি ? তোমার কাছে দিয়াশলাই আছে ?

—আছে।

—দাও, আর সিগ্রেট চেয়ো না, পাবে না, আর মাত্র একটা আছে—

—তুমি বিলিতি সিগ্রেট খাচ্ছো ? মিসায় ধরবে যে।

—ধরুক।

একটা মেয়ে তখন নিজের বুকের আঁচল সামলাচ্ছে। একজন দেখি শ্যেন-দৃষ্টিতে তাকিয়ে, এঃ, বেটা বকধার্মিক, যত শালা পারভার্ট……

সুকুমার নিজের ব্র্যাণ্ড থেকে সন্তর্পণে একটা সিগ্রেট বের করে ধরাল।

আমি চারমিনারে মজে আছি। বেশ্যা বাড়িতে…। মাতালরা বাংলাকে বেঙ্গল বলে। এক পাঁট বেঙ্গলে নাকি চাদ্দিন নেশা থাকে? একদিন টেনে দেখতে হবে। বৌ-কে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিয়েই অবশ্য। ভদ্দরলোক তো, আসলে আস্ত একজন অঘোর অথচ প্রেস্টিজ প্রেস্টিজ করেই জীবনটা গেল। কিছু সাধ আহ্লাদ মিটল না এই সংসার সীমান্তে……

অদূরে সন্ধ্যা রায় তাঁর চাইনীজ হেয়ার ড্রেসার নিয়ে বসে আছেন। বাংলাটা ভাল বোঝে। কারণ কে যেন একটা রসাত্মক ডায়লাগ ছেড়েছিল, ওমা, দেখি মুচকি মুচকি হাসছে চৈনিক রমণী। যাব্ বাবা।

তখন আমি সৌমিত্রকে : হ্যাভ ইউ এভার বীন টু এ ব্রথেল?

সৌমিত্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আমাকে বললেন, আই-নো হোয়াট ব্রথেলস আর!

অর্থাৎ সোজা এড়িয়ে গেলেন। আরে বাবা, ওরা হচ্ছে বায়োস্কোপের হিরো; সাংবাদিকদের কি-ভাবে ট্যাকল করতে হয় সে বিদ্যেটা ওদের ভালভাবে রপ্ত করা আছে।

সৌমিত্র : এই, কে আছিস, আমার ইয়েটা নিয়ে আয় তো!

ইয়েটা এল।

দেখলাম অ্যাণ্টাসিড, এক চামচ ডায়োভল খেলেন। যেন দই খাচ্ছেন। এঃ।

—তুমি কিন্তু এটা লিখবে না।

—নাঃ। লিখব না। লিখলাম কি?

তনুদা বিরক্ত। সকাল থেকে চেঁচিয়ে তাঁর গলা ঈষৎ ভেঙেছে। কাকে যেন বললেন—আর পারছি না। এই প্রভু, তুমি হেঁকে বল তো—আপনারা উকুন মারুন, উকুন মারুন—

অমনি খাটিয়ার মেয়ে দুটি উকুন মারার অভিনয় করতে আরম্ভ করল, থাকলে তো ছাই মারবে। শাড়িটা সরে যেতেই সে মেয়েটির সুডৌল স্তন দেখা গেল। একজন মৃদু কাশল, মেয়েটি সতর্ক হলো। আবার উকুন মারতে আরম্ভ করল।

সৌমিত্র বললেন—পার্টটা স্বতন্ত্র। ভাল লাগছে না মন্দ লাগছে বলতে পারব না, তবে করে যাচ্ছি আন্তরিকভাবে—এই পর্যন্ত বলতে পারি।

তবে একটা কথা, প্রায় এক মাসের ওপর এই সেটে আমার কাজ, বুঝতেই পারছ, তারপরের এক বছর আর মহিলাদের দিকে তাকাব না। মানে তাকাতে পারব না।

ক্যামেরা সন্ধ্যা রায়ের ওপর তখন নিঃশব্দে ট্র্যাক হচ্ছে। তনুদা নিজেই দেখছি অপারেট করছেন। রজনীর ক্রুদ্ধ ভঙ্গি, দৃপ্ত চাউনি, রজনীর কপাল থেকে চুল সরিয়ে নিতে বললেন তনুদা—সন্ধ্যা, সরিয়ে দাও, দেখতে ভাল লাগছে না……

টালিগঞ্জে সন্ধ্যা হতে আরম্ভ করেছে। পাখীরা তাদের ডানায় রোদের তাপ মুছে ফিরে ফিরে আসছে। গাছের তলায় সংসারের মানুষেরা সব জটলা করছে। ওরা না সরলে এরা ফেরে কি করে? ওরা ওদের সীমান্তে। মানুষেরা মানুষের সীমান্তে। মাঝখানে এক টুকরো সংসার। সবাই ওখানে যেতে চায়, ভালবাসা পেতে চায়, দিনের কর্মক্লান্তি মুছে নরম বিছানায় গা এলিয়ে দিতে চায়, প্রিয়জনকে দু'বাহুর আলিঙ্গনের মাঝে ধরতে চায়—এই সেই সংসার, যাতে হয়ত সঙ সাজাই সার, অথবা আরও বড় আরও মহৎ কিছু…

পার্থপ্রতিম চৌধুরী, তরুণ দত্ত (এখন বোম্বেতে), সুশীল মুখার্জি, সুনীল ব্যানার্জি আর আমি ভবানীপুরে বিখ্যাত একটি সিনেমা হলের দোতলার লবিতে বসে আড্ডা দিচ্ছি, কিছুক্ষণ আগে 'ছায়াসূর্য' ছবির ইভনিং শো আরম্ভ হয়েছে, ছবির রিপোর্ট মোটামুটি সন্তোষজনক। ফলে আমরা সবাই খুব হাসিখুশী। শর্মিলা তখন আমাদের সঙ্গে আড্ডা দিত। পার্থর সঙ্গে কি-যেন ব্যাপারে শর্মিলা একটা বাজি হেরেছে,আর সেই বাজির শর্তানুযায়ী শর্মিলা সেদিন আমাদের চাইনীজ খাওয়াবে বলে প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ। আমরা হাউসে বসে আছি শর্মিলা ঠাকুরের অপেক্ষায়। ও এলে আমরা সবাই মিলে পার্ক স্ট্রীটে যাব, এমন সময় মিঠু চ্যাটার্জি হঠাৎ ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল—পার্থদা, এই মাত্তর একটা কাবুলি (কাবুলীওলা) টিকিট

কেটে ছবি দেখতে ঢুকল।

শুনে আমাদের সবার চক্ষুস্থির।—সেকি রে!

বিস্ময়ে পার্থর চোয়াল ঝুলে যাবার দাখিল।—যাঃ, কাবলি আমার ছবি দেখবে কোন দুঃখে! তুই ভুল দেখেছিস—

মিঠু চ্যাটার্জি সশব্দে প্রতিবাদ করল।

—না পার্থদা, তুমি বিশ্বাস করো, আমি হলের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম, হঠাৎ দেখি একটা কাবুলি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে প্রথমে এদিক-ওদিক কি-যেন দেখল, তারপর একটা টিকিট কিনে বোঁ করে হলের মধ্যে ঢুকে পড়ল, অনেষ্ট।

বোঝা গেল, মিঠু গুল দিচ্ছে না। কিন্তু তা-বলে এটাও বিশ্বাস করা শক্ত যে একজন কাবুলি এত ছবি থাকতে বেছে বেছে ছায়াসূর্য ছবি দেখতে আসবে! তপন সিংহের 'কাবুলীওয়ালা' ছবি হলেও সেটা খানিকটা বিশ্বাসযোগ্য হত। বা কোন সেকসসাইটিং হিন্দী ছবি হলেও। 'ছায়াসূর্য' তো সে-ধরনের বায়োস্কোপ নয়।

আমরা অবাক বিস্ময়ে মুখ চাওয়া-চাউয়ি করলাম। তরুণ দত্ত ফস্ করে বলল—হ্যাঁরে পার্থ, ব্যাপারটা কিছু আন্দাজ করতে পারছিস?

পার্থ বিব্রত ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ল।—উঁহু, একদম না।

সুশীল মুখার্জি বলল—পার্থ, মনে হচ্ছে তোর ছবি লেগে গেছে। নইলে কাব্‌লে ছবি দেখে?

আমি বললাম—উল্টোও হতে পারে।

পার্থ ঘাবড়ে গিয়ে বলল—একবার খবর নেয়া যাক কাউণ্টারে, বুকিং ক্লার্ক নিশ্চয় বলতে পারবে—

সবাই তখুনি হুদ্দাড় করে নিচে নামা হলো।

বুকিং ক্লার্ক তখন টাকা গুনছিলেন। আমাদের প্রশ্নে চোখ বড় করে তাকিয়ে বললেন—কা-ব্‌-লে? বলেন কি মশায়?

তরুণ বলল—কেন আপনি দেখেননি? আপনার কাছ থেকেই তো শুনলাম টিকিট কেটে হলে ঢুকেছে—

—আমি মশাই কারো মুখ দেখি না—ক্লার্ক গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন —যারা টিকিট কেনে আমি শুধু তাদের হাত দেখি, ফোকরটা ছোট্ট কিনা, মুখ দেখি না, বুয়েছেন।

তরুণ নির্বিবাদে ঘাড় নেড়ে বোঝাল, পরিষ্কার বুঝেছি।

তরুণ বুঝেছে দেখে বুকিং ক্লার্ক কথাটা টেনে ধরে বললেন—আর খাঁটি কথা যদি শুনতে চান তাহলে আরও খোলসা করে বলি ; একবার এক পরমা সুন্দরী ভদ্রমহিলা টিকিট কিনতে এসেছিলেন। আমি কি তখন ছাই জানতুম যে পেছনে পরমা সুন্দরীর পতি পরম গুরু দাঁইড়ে রয়েছে। আমি মশাই এট্টুসখানি দেখেছি ভদ্রমহিলাকে, গোলাপ ফুল দেখতে কার না ভাল লাগে বলুন, তারপর টিকিট বেচে দিয়ে দীগ্‌গোশ্বাস ফেলে অন্য কাজে মন দিয়েছি, তারপর সে মশাই কি কেলেঙ্কারী, আমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি। সেই পতি পরম গুরু এসে আমায় ধরে কি যাচ্ছেতাই হেনস্থা। বলে কি যে আমি নাকি ওঁয়ার পরিবারের দিকে কু-দৃষ্টি দিয়েচি। আবে মশাই ঘরে আমার এয়োস্ত্রী রয়েচে, পুত্র রয়েচে, কন্যে রয়েছে—তাদের ছেড়ে আমি অন্য এয়োস্ত্রীর পানে তাকাব ? ছিঃ। তা সে লোকটা মশাই আমার কথা আমলই দেয় না, ব্যাটা বলে আমি নাকি ড্যাব ড্যাব করে ওঁয়ার দিকে চেয়েছিলুম। ঝাঁটা মার ঝাঁটা মার, আমার চরিত্তির অত খারাপ নয়। আর অতই যদি সন্দ-বাত্তিক তো পাট্যেচ্ছিলে কেন পরিবারকে টিকিট কাটতে ? এই নিয়ে বিরাট গণ্ডগোল, হৈ-চৈ। তারপর সবাই মাঝে পড়ে ব্যাপারটা সামলে দিল। আর আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম যেন। তারপর শুনুন কি কাণ্ড। রাত্তিরে ক্যাশ মেলাতে গিয়ে দেখি হেভি শর্ট। দেখে তো মাথায় রক্ত উঠে গেল। হয়েছে কি ওই মহিলাটি একশো টাকার নোট দিয়েছিল। তালে-গোলে ওকে বেশী দিয়ে ফেলেচি। ও আর পাওয়া গেল না। ব্যাটা যে-রকম তড়পে গেছে, আর আগ বাড়িয়ে গিয়ে ঘাঁটাতে সাহস হলো না। শেষে ঘর থেকে এনে ভতুকি দিয়ে ক্যাশ মেলাতে হল। মশাই সেই থেকে প্রতিজ্ঞা করেছি, ইহজন্মে আর কারো মুখের পানে তাকাব না, হাত শুধু

দেখব, ক্যাশ দেখব, টিকিট দেব, ব্যস।...তা হ্যাঁ, বলছেন একজন কাব্‌লে ঢুকেচে? ব্যাটার মাথায় নির্ঘাৎ পোকা নড়েচে। নইলে এই বায়োস্কোপ দেখতে ঢোকে?

বলেই তার স্মরণ হলো ছবির পরিচালক স্বয়ং সমুখে দাঁড়িয়ে। জিভ কেটে তৎক্ষণাৎ—তা'বলে ভাববেন না আমি ছবির নিন্দে করছি। বড় ভাল বায়োস্কোপ করেছেন। কাবুলি-রা বুঝতে পারবে না, তাই বলছি।

গেট-কীপার বলল—হ্যাঁ, এট্টা কাব্‌লে ঢুকেছে বটে। আমি ভেতরে বসিয়ে দিয়েছি, ব্যস। কেন? গণ্ডগোল আছে নাকি?

তরুণ তাড়াতাড়ি বলল—না, গণ্ডগোল কিছু নেই। আমরা শুনলাম, তাই জিগ্যেস করছিলাম আর কি—

বলাইদাকে বায়োস্কোপের লাইনে সবাই চেনে। একবার ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে দেখি বলাইদা গোটা আষ্টেক কাবুলির সঙ্গে খুব জোর শলা-পরামর্শ করছে। কাবুলিরা খুব মনোযোগ দিয়ে বলাইদার কথা শুনছে।

বুঝলাম, একটা ভাল রকম কেস হচ্ছে।

পরে বলাইদার সঙ্গে অন্য একদিন দেখা হতে প্রশ্ন করলাম—হ্যাঁ বলাইদা, স্টুডিওতে কাবুলি কেন?

বলাইদা মুখে বিরক্তির ভ্রূ-ভঙ্গি করে বলল—সে কথা শুনে আর কাজ নেই। যত্তসব সব থার্ড-কেলাস ব্যাপার।

শুনে কাজ নেই বললে তো এ-বান্দা ছাড়বার পাত্র নয়, শুনতে আমায় হবেই। স্টুডিওতে নানা দেশের নানা মত এবং ধর্মের লোক হরদম দেখা যায়, কিন্তু কাবুলিদের কখনও দেখা যায় না। ওরা এদিকে বড় একটা মাড়ায় না। সেকি চোট্ হয়ে যাবার ভয়ে? কি জানি, আমি এর সাইকো-টা ঠিক বুঝতে পারি না। অথচ খোদ স্টুডিও পাড়াতেই ওদের একটা ডেরা আছে। প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড ধরে দু-নম্বর নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর দিকে এগিয়ে গেলে বাঁ-হাতে কাবুলিদের বিরাট

একটা আস্তানা চোখে পড়ে। ওদের পাশে থাকে একজন ওস্তাদ। ইয়াব্বড় একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে তার। লোকটা নল চালায়। কোথাও চুরি-চামারি হলে পুলিশের কাছে গিয়ে হয়রান না হয়ে এই ওস্তাদকে নিয়ে গেলে নাকি তৎক্ষণাৎ মুস্কিল আসান হতে পারে। মন্ত্রপূত চাল খাইয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে নাকি বামালের সন্ধান স্রেফ টেলি-যোগে মক্কেলের হাতে পৌঁছে যাবে। তারপর আসামীকে ঘা-কতক দিতে পারলে মাল বেরিয়ে পড়তে কতক্ষণ? এছাড়া এই ওস্তাদ এবং তার পরিবার এমনও মন্তর জানে যে বুড়ো আঙুলের নখে হারানো ছেলের ছবি দেখিয়ে দিতে পারে। একজন বলল, তার নাম মোশাই নখ-দর্পণ। ফী খুব সামান্য। একবার পরখ করে দেখতে পারেন।

কাবুলিদের ডেরাটা সেই ওস্তাদের ঘরের পাশে বলে আমার মনে হয় এটা সেরকম কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, রীতিমত তাৎপর্যপূর্ণ একটা ব্যাপার। তাবৎ কাবুলিরা নিঃসন্দেহে-ই শক্ত মানুষ। নইলে ধরুন কাঁহা কাঁহা মুল্লুকে ওরা দেদার সুদে টাকা খাটায়; সময় মত সুদ আদায় করা সে তো বড় চাট্টিখানি কথা নয়! মশাই এমনও দেনাদার এই পৃথিবীতে আছে যে তারা পাওনাদারের কাল ঘাম ছুটিয়ে দেবার অলৌকিক সব ক্ষমতা রাখে। অর্থাৎ কাবুলিদের তেরটা বাজিয়ে যে ব্যাটা আসলী টাকা, সুদের টাকা হাপিস করবার ক্ষমতা রাখে, সে তো মহাপুরুষ! আর সে-রকম বিপদ হলে কাবুলিরা নির্ঘাৎ ওই ওস্তাদের শরণাপন্ন হয়। নল-ফল চালিয়ে কাবুলিরা টাকা ঠিকই উদ্ধার করে নেয়। তাই মনে হয় ওস্তাদকে কাবুলিরাই ওখানে বসিয়েছে শুধু ওই জন্যেই।

আমি নাম করতে চাই না, একজন বিখ্যাত অভিনেতাকে আমি বহু দিন দেখেছি, তিনি চলেছেন আর তাঁর ডান বাঁয়ে দুজন কাবুলিও চলেছে। ভদ্রলোক প্রাণপণে ওদের বোঝাচ্ছেন। ওরাও বুঝবে না। এবং পরক্ষণেই বলছে—সুদ দো সুদ। বলুন তো কি-কাণ্ড! উনি একদিন ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে একটা ছবির শুটিং করতে এসেছেন। ওরা গন্ধে গন্ধে ঠিক চলে এসেছে। এসে সেঁটে বসে আছে, প্যাক-আপ হলে উনি

পেমেণ্ট পাবেন এবং সর্বস্ব দিয়ে শুধু ট্যাক্সি ভাড়া নিয়েই হয়ত ওঁকে বাড়ি ফিরতে হবে।

স্টুডিওর দ্বারোয়ান তখন আমাদের সেই বৃদ্ধ চাচাজী, এখন রিটায়ার করে দেশে চলে গেছে, ওফ, একটা ক্যারেকটার ছিল লোকটা। আর ছিল অদ্ভুত ওর 'সেন্স অব হিউমার'। চাচাজী থেকে থেকে এমন সব কাণ্ড করত যে আমাদের পিলে চমকে যেত, অন্যথায় হাসতে হাসতে ভুঁয়ে লুটোপুটি খেতে হত। কাবুলি প্রসঙ্গে পরে আসছি, তার আগে চাচাজীর ক্যারেকটারটা কি-রকম ছিল এট্টু আভাস দিয়ে রাখি এই বেলা।

স্টুডিওর গেটে প্রায়ই উমেদারদের ভিড় হয়। সবাই-ই ছবিতে পার্ট করতে চায়। সব ছেলে চায় উত্তমকুমার হতে। আর সব মেয়েই চায় সুচিত্রা সেন হতে। আর এই আগন্তুকদের সমস্ত ঝঞ্ঝাট এই চাচাজীকে-ই বরাবর পোয়াতে হয়। অর্থাৎ নানা রকম বোলচাল দিয়ে হটাতে হয়।

একদিন দুপুরে চাচাজী গেটের পাশে তার টুলে বসে বসে ঝিমোচ্ছে। ভেতরে একটা ছবির শুটিং হচ্ছে, হঠাৎ একটি ছোকরা এসে উপস্থিত। বলা বাহুল্য, ছবিতে হিরো হবার বাসনা নিয়েই সে অকুস্থলে হাজির।

চাচাজী তাকে দেখে ক্ষেপে লাল।

—তুহারকে ফিন আসতে মানা করলাম উ রোজ, তু ফির আসলো? তুহার শরম নৈ থে?

ছোকরাটি তার টেড়ি সামলাতে সামলাতে জবাব দিল—শরম নিশ্চয় আছে। তবে সেটা বন্ধুমহলে। এখানে ছবিতে নামার ব্যাপারে তার কোন শরম-ফরম নেই। সিনেমায় তাকে যে-কোন উপায়েই হোক নামতে হবে। নইলে বন্ধুদের কাছে তার মাথা কাটা যাবে—

চাচাজী অতএব আপ্তবাক্য দিল—তু অব মর। তুহার অব মরনাই চাহিয়ে।

ছোকরা দাঁত বের করে হেসে বলল—চাচাজী, তুমি বলেছিলে ছবিতে হিরো হতে গেলে টাকা লাগে? আমি সেই টাকা এনেছি। কড়কড়ে ক্রেস্পি নোট, পনেরো হাজার টাকা—

—এঁ্যা ? ?

বিস্ময়ে চাচাজী তার টুল উল্টে পড়ে যায় আর কি।—সেকিরে, তুই টাকা নিয়ে এসেছিস ? হিরো সাজবি বলে ? তা টাকা পেলি কোথেকে ?

টাকা সে পেলো কোথেকে—সে কথা ভেঙে বলার ব্যাপারে ছোকরার কোন উৎসাহ দেখা গেল না। শুধু কৌতুকের ভঙ্গিতে চোখের ভুরু নাচাল বারকতক, তারপর বেশ রহস্য করে বলল—শুধু ক্যাশ নয় চাচাজী, সঙ্গে আরও মাল আছে—

বলে সে হাতের রেশন-ব্যাগটা দেখিয়ে দিল। থলেটা যে বেশ ভারী তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। দেখে চাচাজীর চক্ষু ছানাবড়া। কিছুক্ষণ সে ছোকরার দিকে তাকিয়ে রইল, ফ্যালফ্যাল করে।

—ব্যাগে কি ?

—গয়না।

—এঁ্যা ! তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল চাচাজী।

ছোকরা তখন নির্বিকার ভঙ্গি করে বলল—ক্যাশ আর গয়না মিলিয়ে ত্রিশ হাজার টাকা এনেচি চাচাজী। এবার বল, এতে হবে আমার ছবি ?

চাচাজী ততক্ষণে যেন খানিকটা ধাতস্থ হয়েছে।

বললে—তুই বোস্. এই এখানে, আমার এই টুলে।

ছোকরা অট্টহেসে বলল—ঘেবড়ে গেলে বুঝি ?

চাচাজী প্রশ্ন করল—এসব গয়না পেলি কোথায় ?

—কেন, মা-র আর ঠাম্মার মাল—

—সব ঝেড়ে আনলি বুঝি ?

ছোকরা এবার একটু সলজ্জ ভঙ্গি করল।

চাচাজীর টেনশান তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে।

—শালা তোকে তো এবার পুলিশ ধরবে। তুই দেখছি আমারও কোমরে দড়ি ফেলবি—

—কেন, আমার বাপের মায়ের আর ঠাম্মার জিনিস আমি এনেছি, পুলিশ ধরবে কেন ?

চাচাজী বলল—তখন মালুম পাবি যখন ধরবে। বেশরম কঁহিকা, বাড়ি যা, এক্ষুনি বাড়ি চলে যা যদি বাঁচতে চাস। খবদ্দার কাউকে আর বলবি না যে তোর সঙ্গে এত মাল আছে। বললে—

—বললে কি হবে ? কেড়ে নেবে ?

চাচাজী ছোকরাকে তখন ব্রহ্ম-বাক্য দিল—না কেড়ে নেবে না, তোকে ঠিক এইভাবে মধুর মত চেটে লেবে—বলে হাতের তালুতে মধু চাটার ভঙ্গি করে দেখাল চাচাজী—শালা পালিয়ে যা, নইলে আমিই পুলিশে খবর দেব, দিয়ে তোকে হাজতে ঢোকাব—

ছোকরা শেষ পর্যন্ত বামাল সমেত বাড়ি ফিরেছিল, চাচাজীর অন্তত সেই রকমই রিপোর্ট।

সাত-সকালে ক'জন কাবুলিকে হঠাৎ স্টুডিওর গেটে ঘোরাঘুরি করতে দেখে চাচাজী তো অবাক।—ক্যা খবর খান সাহাব ?

খান সাহেবরা আসল রহস্য কখনও উদ্‌ঘাটন করে না, কারণ তাতে পাখি উড়ে যাবার ভয় থাকে। হেসে জানাল—বেড়াতে এসেছে।

অথচ চাচাজী জানে, শুধু শুধু এরা বেড়াবার পাত্তর নয়, অভিসন্ধি নিশ্চিত জোর একটা কিছু আছে।—বৈঠ বৈঠ—

খাতির করে বসিয়ে এটা-সেটা চাপ দিতে শেষ পর্যন্ত কাবুলিরা কবুল করল —সুদের তরে এয়েছি চাচাজী। বাবুটা আমাদের কলজে হাল্কা করে দিচ্ছে।

—কৌন বাবু ?

কাবুলিরা নাম বলল। শুনে চাচাজী শুধু বলল—সত্যনাশ !

কাবুলির দল গেটের মুখে ঠায় বসে রইল। ওরা জানত একসময় না একসময় সেই ভদ্রলোককে এই গেট পার হতেই হবে। তখন ওরা চেপে ধরবে। টাকা হাওলাৎ করবার সময় মনে ছিল না যে একদিন সুদ-সমেত সে-টাকা শোধ করতে হবে ?

ঠিক যেন হাওয়ায় সে-খবর যথাসময়ে পেয়ে গেলেন আমাদের এই

অভিনেতা ভদ্রলোক।

খবর শুনে তিনি শুধু হাসলেন মুচকি মুচকি। ওরা অ্যাদ্দূর অব্দি সাহস করে এয়েচে? বটে!

হ্যাঁ, যা নিয়ে শুরু করেছিলাম, সেটা শেষ পর্যন্ত কেমন চমকপ্রদভাবে শেষ হল—এবার শুনুন। পার্থপ্রতিমকে কেন্দ্র করে আমরা সবাই হতভম্ব হয়ে সেই সিনেমা হাউসের লবিতে দাঁড়িয়ে আছি। কাবুলীওয়ালা মানে শেষপর্যন্ত একজন কাব্‌লে তেড়েফুঁড়ে এসে গ্যাঁটের পয়সা খর্চা করে পার্থ-পরিচালিত নিরেট বাংলা ছবি দেখতে ঢুকেছে এই সংবাদেই আমাদের অচৈতন্য হয়ে যাবার কথা, কিন্তু যেহেতু বায়োস্কোপের লোকেদের নার্ভ নিতান্তই একস্ট্রা স্ট্রং—তাই ঠ্যাঙেব ওপব ভর দিয়ে তখনও সটান দাঁড়িয়ে আছি, বিশেষ করে পার্থপ্রতিমের তো বিস্ময়ে চোয়াল ঝুলে পড়ার দাখিল, গেট-কীপার হাতের টর্চ ঘুরিয়ে আমাদের আশ্বস্ত করল। সে নিবাসক্ত কণ্ঠে বললে—অত ঘেবড়ে যাচ্ছেন কেন? এক্ষুনি ইণ্টারভ্যাল হবে, তখন ব্যাপারটা বাজিয়ে নেবেন।

ইয়েস, দারুণ যুক্তিপূর্ণ কথা, এটা তখন আমাদের কারো খেয়াল হয়নি।

ছবির সম্পাদক তরুণ দত্ত, আমাদের সঙ্গেই ছিল। এক নম্বরের ছটফটে মানুষ। সে বললে—আমি বরং হাউসের ভেতরটায় একবার ঘুরে আসি। দেখি ব্যাটা বাস্তবিক কি করছে—

বলে আমাদের মতামতের অপেক্ষা না করেই ও হুট করে ঢুকে পড়ল হলের মধ্যে। আবার পরক্ষণেই বেরিয়ে এল।—আচ্ছা, কোন রো-তে বসেছে দাদা, মানে কাব্‌লেটা?

গেট-কীপার বললে—ঢুকেই বাঁ দিকে থার্ড রো-তে চারটে চেয়ার ছেড়ে বসেছে। গিয়ে দেখুন আবার সটকে গেছে কিনা—

তরুণ কথাটা শুনেই ঢুকে পড়ল।

তারপর মিনিট পাঁচেক পরে ফিরে এল। উত্তেজনায় তার মুখটা থমথম করছে। বললে—হ্যাঁরে, বাস্তবিক একটা কাব্‌লে, বেশ পুরুষ্টু

সাইজের। বসে বসে ছবি দেখছে একমনে

ব্যস, আমাদের দফা নিকেশ।

—পার্থ, তুই কেলেঙ্কারী বাধিয়েছিস। বিমলমামাকে বলে ছবি এক্ষুনি আফগানিস্থানের জন্মে বুক করার ব্যবস্থা কর। যদ্দূর জানি কাবুলে তিন-চারটে ভাল সিনেমা-হল আছে। ওখানে রিলিজ হলে তোর ছবি এক্কেবারে গোল্ড মাইন হয়ে যাবে।

আমরা এইসব নিয়ে বিস্তর হৈ-চৈ করছি, এই সময় সেখানে রবি ঘোষ নগদ এসে হাজির। পার্থর সে-ছবিতে রবিদা একটা চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করেছিল। আর আমাদের সঙ্গে রবিদার রিলেশনটাও খুব গাঢ়। সেদিন রবিদার হাতে সম্ভবতঃ কোন কাজ ছিল না। তাই সন্ধ্যের ঝোঁকে ঝোঁকে হাউসে এসে হাজির। ভাবখানা, যাই এক পেট আড্ডা দিয়ে আসি। খুব একটা প্যাড়দারি (শব্দটা রবি ঘোষেরই সৃষ্টি। প্যাড়দার মানে প্রকাণ্ড বুদ্ধিজীবী। আঁতেল। আঁতেল টু দ্য ইনফিনিটি। প্যাড়দার তাকেই বলা চলবে যিনি ভোর পাঁচটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত মানুষজন পশু-পক্ষী ঈশ্বর এবং শয়তানকে ক্রমাগত জ্ঞান দিয়ে বেড়াবে। অথচ ওই বস্তুটি ভুলেও কারো কাছ থেকে গ্রহণ করবে না) ভঙ্গীতে।

আমরা জটলা করছি দেখে রবিদা জানতে চাইলে—এখানে বিটোফেনের সেভেনথ সিম্ফনি বাজছে কেন ?

পার্থপ্রতিম দ্রুত বলল—রবিদা, একটা কাণ্ড হয়েছে—

—কী কাণ্ড ? প্রকাণ্ড না ছোট কাণ্ড ?

—না না, ঠাট্টা নয়। একটা কাবলীওলা টিকিট কেটে আমার ছবি দেখতে ঢুকেছে—

—যাঃ।

—সত্যি বলছি।

—কখন ?

—এই তো ইভনিং-শোতে—

শুনে রবিদা একটু চিন্তা করে বলল—এটা আমি জানতাম। বলে রবিদা একটু খুক খুক করে হাসল। তারপর বলল—এ-ছবিতে আমার আউটস্ট্যাণ্ডিং অভিনয়ের খ্যাতি এই কদিনে এত ছড়িয়েছে যে, কাবুলী-ওয়ালারা পর্যন্ত ছবি দেখতে ছুটে আসছে। এটা আমি গোড়াতেই জানতাম। এখন দেখবে, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, গুজরাটী, মারাঠী, তেলেগু, তামিলনাড়ুর দর্শকেরা ছুটে আসছে প্রতিদিন। এ তো সবে কলির সন্ধ্যে—

রবিদা এমন ভাবে বলল যে আমরা সবাই হেসে গড়াগড়ি। বাস্তবিক, কলকাতাব শ্রেষ্ঠ প্যাড়দার যে স্বয়ং রবি ঘোষ—এ-বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

ইতিমধ্যে ইণ্টারভ্যালের ঘণ্টা বাজল। দর্শকরা হুড়মুড় করে হল থেকে ফুটপাতের সব মালপত্র কেনবার জন্যে বেরিয়ে আসছে, এমন সময় লবির কোণার দিকে বেশ একটা হট্টগোল শোনা গেল। আমরা ছুটে গিয়ে দেখি, মাল ক্যাচ, একটি মাঝবয়সী লোককে একজন কাবলেওয়ালা ঠিকই চেপে ধরেছে, লোকটা কেঁউ কেঁউ করছে আর কাবলেটা তাকে যাচ্ছেতাই সব ডায়লাগ দিচ্ছে।

রবিদা তখন সবে অটোগ্রাফ দিচ্ছে দু-একটা। বলল—আমি ব্যাপারটা এই রকমই অনুমান করেছিলাম। ওই লোকটাকে ফলো করেই কাবলেটা হলে ঢুকেছে। নইলে মাথা-খারাপ, কাবলে কখনও বাংলা বায়োস্কোপ দেখে? হিন্দী বায়োস্কোপ ছেড়ে?

ক্রুদ্ধ কাবলে যা বলল তা হচ্ছে—মশাই, এই লোকটা থাকে বালিগঞ্জে, আঠারোশো টাকা নিয়েছে সেই বছর দুয়েক আগে। তারপর থেকে আর দেবার নাম-গন্ধ নেই, শুধু ল্যাজে খেলাচ্ছে। তা আজ বাছাধনকে ধরেছি। ভেবেছিল সিনেমা হলে ঢুকে নজর এড়িয়ে হাওয়া দেবে, কিন্তু আমি পেছু ছাড়িনি, আঁটার মত সেই তখন থেকে পেছনে লেগে আছি। দাও, টাকা দাও—

লোকটা বলল—এঃ, সর্বক্ষণ যেন তোমার জন্যে টাকার বাণ্ডিল সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে হবে। ঢের দিয়েছি। আর পারব না। নিয়েছিলাম

আঠারোশো, এই দু-বছরে দিয়েছি ছত্রিশশো, ব্যস—।

সঙ্গে সঙ্গে পক্ষে আর বিপক্ষে দু-দল লোক বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কাবলের পক্ষ-সমর্থনকারীরা হেঁকে বলল—টাকা না দিলে আজ ছাল ছাড়িয়ে নেব, আর লোকটির সমর্থকরা সাফ জানিয়ে দিল—একটা আধলাও আর নয়, তেমন চেষ্টা করলে চামড়া খুলে ট্যান করে তাতে আজ ঢুগঢুগি বাজিয়ে তবে বাড়ি যাব। দেখি কার ক্ষমতা টাকা আদায় করে—

দু-দলে তখনই কাজিয়া লেগে যায় আর কি! আমরা হাঁ হয়ে সব শুনছি। ভেরি ইণ্টারেস্টিং। এমন সময় হলের লাস্ট বেল বেজে উঠল। স্লাইড দেখানো শেষ, এবার মূল ছবি শুরু। দেখতে হল না, মুহূর্তে লবি ফাঁকা। মায় কাবলে সমেত। সে-ও হলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। নগদ পয়সা দিয়ে টিকিট কিনে সিনেমা দেখার ওই এক হ্যাঙ্গাম, ইচ্ছেয় হোক আর অনিচ্ছেয়—ছবির শেষ পর্যন্ত না দেখলে মন ওঠে না, তা ছবি সে যতই মন্দ হোক না কেন!

একবার প্রদীপ ওরফে মঞ্জু দাশগুপ্তর সঙ্গে আমাকে কেওড়াতলা শ্মশানে পর পর দুদিন রাত্রিবাস করতে হয়েছিল। না না, কোন সৎকার-টৎকার উপলক্ষে নয়, মঞ্জুদা প্রেম করে একটা মেয়েকে বিয়ে করতেই দুই বাড়িতে প্রচণ্ড হট্টগোল। মঞ্জুদার দাদা হচ্ছেন খ্যাতমামা চিত্র-পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্ত। এই বিয়েতে তাঁর বিন্দুমাত্র মত ছিল না। তিনি যাঁহা সংবাদ পেলেন ছোটভাই রেজিস্ট্রী ম্যারেজ করেছে, ব্যস, রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে স্ত্রীকে বললেন—তোমার আস্কারাতেই মঞ্জু এতদূর অধঃপাতে গেছে, দুম করে বিয়ে করেছে সে-ছেলে—

এমন সময় মঞ্জুদা হাসি-হাসি মুখে বাড়ি ঢুকছিল, পড়ল স্রেফ তোপের মুখে—গেট আউট গেট আউট—

মঞ্জুদা হতভম্ব।—কে? আমি?

—ইয়েস তুমি। আমার অমতে বিয়ে করেছ শুনলাম, ইজ ইট এ ফ্যাক্ট?

মঞ্জুদা ইতস্তত করে, ঘাড় চুলকে—মানে মতামতের কথা—

—অর্থাৎ আমার মতামতের কেয়ার না করেই বিয়ে করেছ। অতএব গেট আউট—

স্ত্রী যত বোঝান আরে ছি ছি কি করছ, সুকুমারদা তত ক্ষেপে যান—রেজিস্ট্রী করে বিয়ে! ছিঃ। মঞ্জু ইউ প্লিজ গেট আউট, আমার ব্ল্যাড প্রেশার চড়ে যাচ্ছে—

অতএব মঞ্জুদা আউট। সুকুমার দাশগুপ্ত তখন উত্তমকুমার আর মালা সিনহাকে নিয়ে 'সাথীহারা' ছবির শুটিং করছেন। আর মঞ্জু দাশগুপ্ত তখন 'অবাক পৃথিবী' ছবির সঙ্গে যুক্ত। ফিল্ম লাইনের সবাই এই উজ্জ্বল মেধাবী অক্লান্তকর্মী তরুণকুশলী মঞ্জু দাসগুপ্তকে ভালবাসত। সুচিত্রা সেন নিজের ছোটভাইয়ের মত স্নেহ করতেন মঞ্জুদাকে। উত্তমকুমার বিশেষ পছন্দ করতেন এই তরুণ যুবককে। তরুণকুমার ছিল মঞ্জুর অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। সবাই জানে—'অবাক পৃথিবী' ছবিটি তরুণকুমার নিজে প্রযোজনা করেছিল—শুধু মঞ্জুকে চলচ্চিত্র শিল্পে একটা প্রতিষ্ঠা দেবার জন্যে। মঞ্জু নিজের পায়ে দাঁড়াক, নাম করুক, বড় হোক, এটাই ছিল তার সদিচ্ছা।

এটা সবাই চেয়েছে কিন্তু মঞ্জুদা সেই সবাইকেই বোকা বানিয়ে, সবাইকেই বেদনায় মুহ্যমান করে একদিন পালিয়ে গেছে, সে স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ, বারান্তরে বলব।

একেবারে বোল্ড আউট মঞ্জুদা। আমাদের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু। বিয়ের প্রসঙ্গটা একদম চেপে গিয়েছিল। হঠাৎ তরুণকুমারের মুখে ফাঁস হয়ে গেল। উত্তমকুমার মঞ্জুকে বলে দিয়েছিলেন, বিয়ে করে বৌ নিয়ে সোজা আমার বাড়িতে চলে আসবি।

মঞ্জুদা তাই-ই করেছিল। রেজিস্ট্রী অফিস থেকে সোজা উত্তমকুমারের বাড়ি। গুরু দুজনকেই আশীর্বাদ করেছিলেন, গুরুপত্নী সোনার হার দিয়ে নতুন বৌয়ের মুখ দেখেছিলেন। তারপর হেভি থ্যাট। যাতে আমরা নাকি বাদ।

এসব খবর মঞ্জুদা বোল্ড আউট হওয়ার পর সব পাওয়া গেল। খোকন

আমাকে বললে—মঞ্জুদার মেজাজ খুব খারাপ, সাবধানে কথা বলবে খোকা নইলে কপালে তোমার দুঃখু আছে।

পরদিন আমার শুটিং নেই। মঞ্জুদারা 'অবাক পৃথিবীর' শুটিং শেষ করে ল্যাবরেটরীতে এল। উত্তমকুমার ওকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

আমায় দেখে মঞ্জুদা ইসারায় কাছে ডাকল—কিরে, কি কচ্ছিস ?

—স্রেফ আড্ডা।

—চল চা খাওয়া যাক।

চা খেতে খেতে আমি কিন্তু কিন্তু হয়ে প্রশ্ন করলাম—শুনলাম তুমি নাকি আলাদা হয়ে গেছ ?

মঞ্জুদা আমার দিকে চমকে ফিরে তাকাল। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল—বুড়ো (তরুণকুমার) তাই বললে বুঝি ?

আমি ইতঃস্তত করে বললাম—না, ঠিক বুড়োদা বলেনি, তবে এই রকম গুজব শুনছি। তা কোথায় আছ ? বৌদি কোথায় ?

—বৌদি ? সে তার বাপের বাড়িতে আপাতত ফিরে গেছে। আর আমি একটা ইন্টারেস্টিং জায়গায় আছি পরপর ক'রাত ?

—কোথায় ?

—শ্মশানে।

—যাঃ।

—বাস্তবিক। বিশ্বাস না হয় আমার সঙ্গে একরাত কাটিয়ে দেখ, তুই তো লেখার রসদ খুঁজিস, পেয়েও যেতে পারিস। ফার্স্টক্লাস জায়গা কিন্তু—

কাট টু-কাট আমরা রাসবিহারীর আড্ডা সেরে রাত সাড়ে এগারোটায় শ্মশানমুখো।

মঞ্জুদা বললে—দাঁড়া, আগে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক। বলে পশ্চিম দিকের একটা পাঞ্জাবী হোটেলে আমাকে নিয়ে ঢুকল। বেশ গর্মাগর্ম তড়কা আর রুটী হলো দু-প্লেট। সর্দারজী মঞ্জুদার মুখের দিকে তাকিয়ে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল—ভগবান তেরা ভালা করে মঞ্জু—

মঞ্জু সহাস্যে বলল—করবে করবে, সময় হলে ঠিকই করবে সর্দারজী, ঘাবড়াও মৎ।

সর্দারজী পয়সা নেবার পাত্তরই নয়। উল্টে সেদিনের গুরুমুখী খবরের কাগজটাই দিয়ে দিল। আর দিল দুটো নিমের দাঁতন। এটা পাঞ্জাবী হোটেলের রেওয়াজ। রাতের খাবার খেলে ওরা খদ্দেরকে একটা করে নিমের দাঁতন দেয়। এখন ব্যবস্থা কি-রকম আর জানি না।

স্টুডিওতে আমাদের একটা না একটা আড্ডা লেগেই আছে। আর্টিস্টরা, টেকনিশিয়ানরা প্রায়ই কাজের ফাঁকে একত্রিত হয়ে গল্প-গুজব করা, আসলে আড্ডার যেটা চরিত্র, ধরে রাখা হয়। আমি? আমি মশাই ভাল একটা আড্ডার জন্যে ইয়ে করতে পারি। মানে স্যাক্রিফাইস টু দ্য এক্সটেণ্ট অব্…এট্‌সেট্রা এট্‌সেট্রা।

ভবেশ দত্ত এবং তাঁর কন্যা রত্নার ঘটনা সেই আড্ডার অনেকেই জানেন। আমি গল্প বলছি বলে কেউ ইদানিং সন্দেহ করেন কিনা জানি না, তবে আমার ফিলিঙ্গসটা হচ্ছে---বলতে বলতে এখন ওটা গল্পের কাছাকাছিই পৌঁছে গেছে। এখন ওই ঘটনাটা আমি ডিটেলে বলে থাকি। প্রয়োজন মত টুইস্ট করি। শেষে খুব নাটকীয় গলায় উপসংহার টেনে একটা ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ার এফেক্ট দিয়ে তবে শেষ করি। বাস্তবে এগুলো হয়ত হয়নি, কিন্তু তাতেই বা কী এসে যায়। গল্প তো মানুষের জীবনেই থাকে। যিনি লেখক—তিনি প্রয়োজন মত সেটাকে টেনে বের করে শব্দের মালা গেঁথে যান মাত্র—তখন মোটামুটি ওটা সাহিত্যের এক্তিয়ারে পড়ে যায়।

দেখুন ব্যাপারটা।

রাত তখন গভীর। এটু আগে অনেকে ঘুমিয়েছেন, অনেকে ঘুমিয়েছেন রাতের প্রথম প্রহরে। পরদিন অনেক ভোরে উঠতে হবে। রেডি হতে হবে। তারপর যেতে হবে পাহাড়ে। যেখানে উদয়াস্ত শুটিং করে সন্ধ্যে নাগাদ ক্লান্ত পর্যুদস্ত শরীরে ক্যাম্পে ফিরতে হবে। যেন টানা একটা রুটিন-জব্।

হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। কেষ্ট আমায় ডাকছে—দাদা উঠুন, ম্যাডাম আপনাকে এট্টু ডাকছেন—

আমি ঘুমচোখে মোটামুটি বিরক্তই, কেষ্টাকে বললাম—হ্যাঁরে কেষ্ট, এত রাতে ম্যাডামের আবার আমাকে কী দরকার পড়ল জেনে এসেছিস?

কেষ্ট বলে—না তা জানি না। তবে আপনার যেমন তলব পড়েছে এবং ইতিমধ্যেই এই ডাক-বাংলার চৌকিদারের দু'দফা জিজ্ঞেসবাদ হয়ে গেছে। ম্যাডামের বক্তব্য—আপনারা আমায় নিয়ে চলুন ভবেশবাবুর বাড়িতে। আমি ওঁর মেয়েটাকে একবার চোখের দেখা দেখিয়ে দিয়েই চলে আসব—

পরিচালক দাঁড়িয়ে বিব্রতমুখে।

কে যেন অন্ধকারের মধ্যে বলে উঠল—লাইট নেই তো কী হয়েছে? হ্যারিকেন জ্বালাও। তারপর ম্যাডামকে ভবেশ দত্তর বাড়িতে নিয়ে যে-কেউ ঘুরিয়ে আনতে পারে।

এমন সময় আমি হাজির সেখানে। পরিচালক তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—এই যে রঞ্জন এস। তুমি চেন ভবেশ দত্ত বলে কোন মানুষ, ইয়ে ভদ্রলোককে?

—ভবেশ দত্ত? ভবেশ দত্ত? আমার তো আকাশ থেকে পড়ার মত অবস্থা—কোন ভবেশ দত্ত?

—আরে আমি তো ছাই কিছুই জানি না, এইমাত্র ম্যাডাম ডেকে বললেন, কে এক ভদ্রলোক এখানে নাকি রোজ ঘোরাঘুরি করছেন, তিনি তাঁর মেয়েকে দেখাবেন, মানে আমাদের ম্যাডামকে। মেয়েটি নাকি অসুস্থ—

বিদ্যুৎগতিতে আমার মনে পড়ে গেল, মধ্যবয়স্ক, অভিজাত দর্শন সেই মানুষটির কথা। উনিই ভবেশ দত্ত? উনি তো প্রথমে আমাকেই সেধেছিলেন এই বলে যে ছবির হিরোইনের সঙ্গে দেখা করে ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে যা বলবার বলবেন। আর এখন উনি অসুস্থ মেয়ে না কি যেন বলছেন···

আমরা উত্তরপ্রদেশের এক পাহাড়ী শহরে সেবার গেছি, একটা ছবির

আউটডোর শুটিং করতে। আমরা উঠেছি শহরের সীমানার মাইল চারেক বাইরে, পাহাড়ের গায়ে ছবির মত সাজানো কয়েকটি বেসরকারী বাংলোয়। আমাদের এই অস্থায়ী ক্যাম্পের অদূরে হচ্ছে একটা ফ্যাক্টরী। সেই ফ্যাক্টরীর কিছু নতুন তৈরি কোয়ার্টার্সে আমাদের ঠাঁই হয়েছে। বাঙালী ম্যানেজারই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বেশ মজলিশী হৃদয়বান মানুষ। দূর বিদেশে শুটিং করতে এসে আমরা যাতে কোনরকম অসুবিধায় না পড়ি সেজন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত নেই। ওই কোম্পানীর কিছু অফিসার আবার বাঙালী। তারা সহসা ওই পাণ্ডব-বর্জিত দেশে আমাদের পেয়ে খুব খুশী। ওঁরা সপরিবারে রোজই আসেন আমাদের ক্যাম্পে, বসে গল্প করে যান। আমাদেরও যেতে হয় ওঁদের দেওয়া চা-জলখাবারের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। এরই মধ্যে সবার সঙ্গেই বৌদি মাসীমা দাদা-র সম্পর্কে গড়ে উঠেছে, চারিদিকে একটা সুন্দর আত্মীয়তার পরিবেশ।

আমরা অবশ্য দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্প থেকে দূরের পাহাড়ের দিকে রওনা হয়ে যাই। সারাদিন লোকেশানে লোকেশানে কেটে যায়। দুপুরে কোন ঝর্ণার ধারে বসে ড্রাই লাঞ্চ খেয়ে নেয়া হয়, তারপর সামান্য বিরতি, আবার শুটিং। পাহাড়ে শুটিং করা মানে শরীরের হাড়গোড় যেন ভেঙে যাওয়া। পাহাড়ের অসমতল গায়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পা রেখে দাঁড়ানো এমনিতেই বেশ শক্ত, তার ওপর এত যন্ত্রপাতি নিয়ে ঘন ঘন ক্যামেরার লেন্স চেঞ্জ করে একটা স্পট থেকে আর একটা স্পটে যাওয়া বাস্তবিক দুরূহ কাজ।

যাই হোক, যতক্ষণ সূর্যের আলো ততক্ষণ আমাদের কাজ। তারপর প্যাক আপ—ক্যাম্পে ফেরা। ফিরে বেশ কিছুক্ষণ যেন জিভ বের করে দম নেওয়া, তারপর স্নানট্নান ইত্যাদি।

আমার ঘর থেকে বাংলোর গেটটা খুবই কাছে। চারিদিকে মরশুমি ফুলের বাগান। মোরাম বিছানো রাস্তা সোজা গিয়ে লোহার গেটে থমকে দাঁড়িয়েছে। বন্ধই থাকে সারাদিন।

একদিন লোকেশান থেকে ফিরে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে দম নিচ্ছি।

সেদিন ছিল প্রচণ্ড কাজের চাপ। ফলে গোটা শরীর—ময়ূর যেমন পাখনা মেলে দেয়, আমাদেরও যেন সেই দশা। গানের সঙ্গে ঠোঁট মেলাতে মেলাতে ছবির নায়িকাকে সেদিন সেই অসমতল পাহাড়ী পথে পথে বেশ দৌড়ঝাঁপ করতে হয়েছে—ফলে আমাদেরও। তাই ক্যাম্পে ফিরে এসে কেউ আর অন্যান্য দিনের মত চটপট তৈরি হয়ে আড্ডায় জমতে পারে নি। তখনও হাঁফাচ্ছে। দম নিচ্ছে, শরীরের ক্লান্তির ধকল সামলাচ্ছে।

কানে এলো গেটের সামনে কারা যেন কথা কাটাকাটি করছে। বাংলা হিন্দী মিলিয়ে ওখানকার ডায়লাগ বিনিময় হচ্ছে। কৌতূহল হল। তাড়াতাড়ি জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক গেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে, তাঁকে চৌকিদার আটকেছে, কিছুতেই ভেতরে আসতে দেবে না। অদূরে একদল কৌতূহলী মানুষের ভীড়। ওরা এসেছে ফিল্মের আর্টিস্ট ইত্যাদি দেখবার জন্যে। কিছুদিন যাবৎ এটা ওদের প্রায় নিত্যকর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেশীর ভাগ স্থানীয় মানুষই অ-বাঙালী। ফ্যাক্টরীর শ্রমিক। তারা রোজই উঁকি-ঝুঁকি দিত। ভাবলাম হয়ত ভদ্রলোক ওদেরই একজন কেউ।

কিন্তু সংলাপের রোটেশান ক্রমেই দ্রুত হচ্ছে, বাড়ছে আওয়াজের তীব্রতা, তীক্ষ্ণতা। ভাববার কথা। গেলাম তখন আসল ব্যাপারটা বোঝবার জন্যে। আমায় দেখে চৌকিদার বচসা থামিয়ে সরে দাঁড়াল। ভদ্রলোক আমার দিকে তাকালেন।

একজন বুদ্ধিমান মানুষের মুখ, বেশ ভদ্র চেহারা।

প্রশ্ন করলাম ইংরিজীতে।—কি ব্যাপার বলুন তো?

উনি বাংলায় জবাব দিলেন—আপনাদের এই ছবির হিরোইন শুনলাম অমুক, আমি কি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে পারি?

আমি অবাক—কেন বলুন তো?

ভদ্রলোক সামান্য চুপ করে থেকে বললেন—আমার একটু পার্সোন্যাল দরকার আছে তাঁর সঙ্গে।

—আমাকে বলা যাবে না বুঝি?

ইতঃস্তত করে উনি জবাব দিলেন—না।

—অ।···কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে উনি এই কিছুক্ষণ হলো সবে শুটিং শেষ করে ক্যাম্পে ফিরেছেন। এখন খুব সম্ভবত বিশ্রাম নিচ্ছেন। এখন তো ওঁর সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব নয়। আপনি বরং পরে কোন সময়—

—না। আমাকে থামিয়ে উনি হঠাৎ বললেন—আমি আজই একবার দেখা করতে চাই। ঠিক আছে আমি না-হয় খানিকক্ষণ অপেক্ষা করছি এখানে—

—লাভ নেই।

ভদ্রলোক যেন অবাকই হলেন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। —কেন বলুন তো?

—উনি অপরিচিত কারো সঙ্গে দেখা করতে রাজী হবেন না।

—কিন্তু আমার ব্যাপারটা যে খুব জরুরী—ভদ্রলোক অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলেন।

—সেই ব্যাপারটা যে কী আগে বলুন। ওঁকে বলা হোক। তারপর যদি উনি রাজী হন তো স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু আমি যদ্দুর জানি, উনি চট্ করে কারো সঙ্গে দেখা-টেখা করতে চান না এমনিতে···

আমার কথায় ভদ্রলোক যেন খুবই হতাশ হলেন। ছেলেমানুষের মত খানিকটা উস্‌খুস করে বললেন—তাহলে?

চৌকিদার এবার বলল, হিন্দীতেই—তখনই আপনাকে বললাম, আপনি বিশ্বাস করলেন না দত্তসাহাব—

—কিন্তু আমার যে ওঁর সঙ্গে একবার দেখা করতেই হবে, বিশেষ দরকার—

অথচ ভদ্রলোক তার দরকারের কথা আমাদের বলতে রাজী নন। আমার কেমন যেন হঠাৎ খটকা লেগে গেল। ইনি হিরোইনের পূর্ব-পরিচিত কেউ নন তো? কি জানি বাবা, কিছুই তো খোলসা করে বলছে না।

বললাম—আপনি তাহলে একটু অপেক্ষা করুন। আমি ম্যাডামকে

খবর পাঠাচ্ছি, দেখুন যদি দেখা করতে রাজী হন। কেষ্ট, এই কেষ্ট—

কেষ্ট আসতে বললাম—ম্যাডামকে বলো গিয়ে এক ভদ্রলোক দেখা করবার জন্যে গেটে অপেক্ষা করছেন। পার্সোন্যাল দরকার। দেখা করবেন কী ?

কেষ্ট গেল আর তখুনি ফিরে এল।

—না। ম্যাডাম এখন শুয়ে আছেন, কারো সঙ্গে দেখা করবেন না। উনি ভীষণ ক্লান্ত আজ—

—ও।···তাহলে ?

কি আর বলব।

দেখলাম উনি মাথা নীচু করে হাঁটছেন। অদূরে একটা গাড়ির দিকে এগোচ্ছেন। ড্রাইভার দরজা খুলে দিচ্ছে। গাড়িটা মৃদু শব্দ করে চলে গেল। এবার চৌকিদারের মন্তব্য—দেখলেন তো কারবারটা ?

—কে ইনি চৌকিদার ? তুমি চেন ?

—বিলক্ষণ। এঁকে কে না চেনে এ-অঞ্চলে। টাকার কুমীর এই দত্তবাবু লোকটা। কিন্তু মহা শয়তান। আসলে গভর্নমেণ্টের ঠিকাদার, দু'হাতে পয়সা লুটে বড়লোক হয়েছে, এখন হেন বিজনেস নেই যাতে এই দত্তবাবুর টাকা খাটে না। বাঙালী বলুন, হিন্দুস্থানী বলুন—সব ক্ষেত্রেই দত্তবাবুর টাকা, একেবারে আপাদমস্তক কিনে ফেলেছে। তারপর গলায় গামছা দিয়ে সুদে-আসলে একদিন সব কেড়ে নিচ্ছে, বেচে দিচ্ছে, ফের কিনে নিচ্ছে। গভর্নমেণ্টকে ও থোড়াই কেয়ার করে বাবুজী। খতরনাক আদমী। পুলিশ থেকে শুরু করে সবার সঙ্গে ওর ভাব, সবাই ওর হাতের মুঠোয়।

তারপর ব্যাপারটা ভুলে গেছি।

রাত কেটেছে, ভোর হয়েছে, আবার সেই জঙ্গল পাহাড়, ঝর্ণা, যন্ত্রপাতি, লোকলস্কর, হৈ-হাঙ্গামা, কাজের চাপে হাঁফিয়ে ওঠা এবং সন্ধ্যায় যথারীতি ক্যাম্পে ফিরে আসা।

দেখি দত্তবাবু গেটের পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছেন। কী মতলব ?

হিরোইন ?

দত্তবাবু আমায় দেখে ম্লান হাসলেন। —এই ফিরলেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বেশ টায়ার্ড মনে হচ্ছে।

—ওই আর কি। আপনি ভাল ?

—নাঃ—দত্তবাবু অকপটে বললেন—আমি ভাল নই। আমার শরীরটা গত ক-দিন ধরে বেশ খারাপ যাচ্ছে। প্রেশারটা দারুণ বেড়েছে—

—তা এই অবস্থায় এখানে আসছেনই বা কেন ?

ম্লান হাসি দত্তবাবুর ঠোঁটে।

—কেন যে আসছি···কপাল মশাই কপাল। পৃথিবীতে যে যেরকম ভাগ্য করে আসে—আচ্ছা ভাই আজ ওঁকে একটু ফ্রী পাওয়া যাবে ?

আমি কি বলব—ভদ্রলোককে কে বোঝায় যে নায়িকারা একমাত্র প্রোডিউস্যার ছাড়া অপরিচিত কাউকে হঠাৎ 'মিট' করতে চায় না। এ ভদ্রলোকটি কি শেষে ছবি প্রোডিউস করবার মতলব এঁটেছে ?

—বলা মুস্কিল···

—না, প্লীজ একটু বলুন। কাল ঘুরে গেছি। আজও আবার ঘুরে যাব ? দেখুন না একটু যদি রাজী করাতে পারেন—

—দত্তবাবু কিছু মনে করবেন না। বিনাকারণে উনি কারোর সঙ্গে দেখা করতে চান না চট্ করে। আপনি যদি আপনার কারণটা খুলে না বলেন তো মনে হয় না উনি রাজী হবেন—মানে দেখা করতে—।

শুনে ভদ্রলোক কিছুক্ষণ আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। কথাটা যেন তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল না। তারপর হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসলেন। আমার দুটো হাত চেপে ধরে প্রায় ধরা গলায় বললেন—দেখুন, আমি বড় বিপদে পড়ে এসেছি। আমাকে এই অঞ্চলের সকলেই চেনে-জানে। আমার কোন বাজে মতলব নেই। আমি শুধু ওঁকে একটা আবেদন জানাব বলে এসেছি। দয়া করে যদি ব্যবস্থা করে দেন তো

অশেষ উপকার হয়—

অপ্রস্তুত আমি, তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম—আচ্ছা আপনি একটু দাঁড়ান, দেখি আমি কি করতে পারি—

ম্যাডাম তখন চারমিস ক্রিম দিয়ে মুখের মেকআপ তুলছিলেন বারান্দায় বসে। সঙ্গে একজন চাইনীজ বিউটিশিয়ান। গিয়ে দাঁড়াতে উনি সপ্রশ্নে তাকালেন—কী সংবাদ ?

—জরুরী সংবাদ ম্যাডাম। আপনার সঙ্গে এক ভদ্রলোক একটু কথা বলতে চান। গতকাল ফিরে গেছেন। আজ আবার এসেছেন—

—কেন বলুন তো ? কে এই ভদ্রলোক ? কি চাইছেন উনি ?

—তা ঠিক বলতে পারব না। তবে ভদ্রলোক শুনলাম এ-অঞ্চলের নামজাদা একজন ধনী বিজনেসম্যান। উনি যা বলার আপনাকে পার্সোন্যালি বলতে চাইছেন—

ম্যাডাম অবাক হয়ে আমার দিকে কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—গুণ্ডা-ফুণ্ডা নয়ত ?

—না না সেরকম কিছু নয়। নিপাট ভদ্রলোক। মিডিল এজেড্। ডিগ্নিফায়েড। আমার মনে হয় আপনি স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারেন—

—বেশ তাহলে নিয়ে আসুন। তবে ওয়ান থিং, আপনি কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকবেন—মানে আমরা যখন কথা বলব—

—শিওর। কোনরকম চিন্তা করবেন না। আমরা এখানে সবাই আছি—

ভদ্রলোক আমার পেছন পেছন এসে বারান্দায় উঠলেন। তারপর জোড় হাতে নমস্কার করলেন—আমার নাম ভবেশ দত্ত। আমি এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে আছি। বিজনেস করে থাকি—

ম্যাডাম বললেন—বসুন।

ভবেশ দত্ত বসলেন।

—বলুন, কি দরকার আপনার ?

ভবেশ দত্ত যেন সামান্য ইতঃস্তত করলেন আমাকে লক্ষ্য করে।

ম্যাডাম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাফ বললেন—হ্যাঁ উনি এখানে থাকবেন। আপনি যা বলার বলতে পারেন।

ভবেশ দত্ত তখন মৃদু কেসে গলা সাফ করে বললেন—আমি একটা আর্জি নিয়ে এসেছি আপনার কাছে।

—বলুন।

—আমার মেয়ে আপনাকে একটিবার চোখের দেখা দেখতে চাইছে—

ম্যাডাম অবাক।—আপনার মেয়ে?

—হ্যাঁ, আমার মেয়ে।

—ও।···তা নিয়ে আসবেন তাকে, দেখে যাবে—

ভবেশ দত্তর মুখ সঙ্গে সঙ্গে বিষণ্ণ হয়ে গেল।

—তাহলে তো কোন ঝঞ্ঝাটই ছিল না। আসলে আমার মেয়ে অসুস্থ, বেডরিডিন, ও এখানে কিছুতেই আসতে পারবে না। তারচেয়ে আপনি যদি বরং একটিবারের জন্যে আমার বাড়িতে যেতেন—

ম্যাডাম তৎক্ষণাৎ দৃঢ়কণ্ঠে—ইমপসিবল। কারো বাড়ি বয়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। সে যদি দেখতে চায়, এখানে এসে দেখবে—ব্যস এর বেশী আমার পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব নয়। সরি—

ভবেশ দত্ত অসহিষ্ণু ছেলেমানুষের ভঙ্গীতে বললেন—কিন্তু রত্না যে এখানে কোনদিনই আসতে পারবে না। অথচ সে আপনাকে দেখার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে। কাঁদছে। ওষুধ-বিষুধ কিছুই খেতে চাইছে না। কারো কথা শুনছে না। বুঝছেও না। অথচ আমি যে কি করব বুঝে উঠতে পারছি না। আমার একমাত্র সন্তান। এই রকম আবদার ও আগে কখনও করেনি। সেই মেয়ে আজ মানে আপনাকে কি-যে বলব···

ভবেশ দত্তর গলা ধরে এল আবেগে।

ম্যাডাম, আমি হতভম্ব।

—আপনি দয়া করে একবার চলুন। আপনি বয়সে আমার বোন-ই হবেন, আমি আপনাকে জোড় হাতে অনুরোধ করছি দিদিভাই, আমার অসুস্থ মেয়েটার ওপর দয়া করে একটিবার চলুন। আমি কথা দিচ্ছি,

আপনার কোন অসুবিধা হতে দেব না। দশ মিনিটের মধ্যে আমি আপনাকে ছেড়ে দেব। আমার গাড়ি আপনাকে যত্ন করে নিয়ে যাবে—আবার ফেরৎ দিয়েও যাবে।

ম্যাডাম চুপ। সম্ভবত ভেবে পাচ্ছিলেন না—এক্ষেত্রে তাঁর কি বলা উচিত বা অনুচিত। আমার দিকে তাকালেন। তারপর তাকালেন ভবেশ দত্তর দিকে। মিনতির ভঙ্গীতে ভবেশ দত্ত তাকিয়ে আছেন।

—কি হয়েছে আপনার মেয়ের?

—এঁ্যা···হয়েছে যা তা আপনার না শোনাই ভাল। তবে ডাক্তার বলেছেন রত্না নাকি আর বেশীদিন বাঁচবে না। হেন স্পেশালিস্ট নেই যাঁকে আমি দেখাইনি, কিন্তু···কিন্তু···ভবেশ দত্ত নিজেকে সামলাবার আপ্রাণ চেষ্টা করলেন, এইসব আর কি, ভগবান আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন, জানি না কি অপরাধ করেছি···

কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল। কারো মুখে কোন কথা নেই। ভবেশ দত্ত পকেট থেকে দ্রুত রুমাল বের করে কপালের ঘাম মোছার অছিলায় তাড়াতাড়ি চোখ মুছে নিলেন। ম্যাডামের চারমিস্ মাখা মুখে বিব্রত ভঙ্গী, ভ্রূকুটি।

বললেন—দেখুন, আমি এখানে ছবির শুটিং করতে এসেছি। এখন আমি এঁদের ইউনিটের একজন শিল্পী, এঁরা যা প্রোগ্রাম দেবেন—আমাকে তাই করতে হবে। তাই এঁদের সঙ্গে পরামর্শ না করে আমি তো আপনাকে কিছু বলতে পারছি না। লোকেশান ছেড়ে বাইরে যাওয়া তাই আমার পক্ষে ইমপসিবল। পার্সোন্যাল কাজ করা তো আউট অফ কোশ্চেন। তাতে ডিসিপ্লিন ভাঙা হবে। অতএব বুঝতেই পারছেন—আপনি এ-ব্যাপারে এ-ছবির প্রোডিউস্যার, ডিরেকটার—এঁদের সঙ্গে পরামর্শ করুন, তারপর আমি যেতে পারব কি না পারব ভেবে বলব—

শুনতে শুনতে ভবেশ দত্তর মুখ ক্রমে করুণ হচ্ছিল, সানুনয়ে বললেন—সেসব করতে গেলে অনেক দেরী হয়ে যাবে। মেয়েটা আমার প্রায় না খেয়ে আছে ক'দিন। আপনি আমাকে বিশ্বাস করে চলুন, আপনার

কোন ক্ষতি হবে না। আমি হতে দেব না। এ-তল্লাটে আমাকে সবাই সমীহ করে চলে। সেসব না দেখলে আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন না, দয়া করে পাঁচ মিনিটের জন্যে হলেও একবার আপনি চলুন—

ম্যাডাম হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। —বার বার এভাবে রিকোয়েস্ট করবেন না, আমার খুব খারাপ লাগছে, আমি চলি—

—শুনুন শুনুন, একটা কথা বলি, আপনি টাকা চান? বলুন কত টাকা আপনার দরকার? আপনি তো পয়সা নিয়ে ছবিতে কাজ করেন আমি আপনাকে সেইরকম দিতে রাজী আছি—এনি অ্যামাউন্ট, ক্যাশ চেক হোয়াটএভার—ভবেশ দত্ত পকেটে হাত ঢোকালেন—শুধু একটিবার আমার মেয়ে, ডাক্তার বলছে ও নাকি বাঁচবে না। ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াবেন। বেশ, কাছে যাবারও দরকার নেই, দূরে দাঁড়াবেন। আমার মেয়ে শুধু আপনাকে দেখবে—চোখের দেখা, কথা বলারও দরকার নেই, রত্না তো আজকাল কথা কইতেই পারছে না, গলাটা চোকড্ হয়ে যাচ্ছে ওর। বলুন কত দিতে হবে আপনাকে? আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি আজ...

ম্যাডামের চোখে হঠাৎ যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ, দপ করে জ্বলে উঠে নিভে গেল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভবেশ দত্তর দিকে তাকিয়ে উনি দ্রুত ঘরে ঢুকে গেলেন।

বিরক্ত, উত্তেজিত এবং অপমানিত মুখে আমাদের ছবির নায়িকা তাড়াতাড়ি তাঁর ঘরে ঢুকে গেলেন। এই ভবেশ দত্ত যে হঠাৎ এ-রকম একটা কথা বলে বসবেন আমি কল্পনাও করতে পারিনি। ফলে আমিও রীতিমত বিব্রত। বোঝা গেল লোকটির রুচির কোন বালাই নেই। টাকার দম্ভে যা খুশী তাই করতে বা বলতে চায়। বারান্দায় স্বল্পান্ধকারে চাইনীজ বিউটিশিয়ান এদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাংলা কথা সে পরিষ্কার বুঝতে পারে। তার মুখ দেখে মনে হল—সে-ও অবাক হয়ে গেছে।

ভবেশ দত্তর হাত তখন পকেট থেকে নেমে গেছে। তার মুখ এখন

থমথম করছে। আসলে তিনি নিজেও অপমানিত। এটা তার নিজের এলাকা। এখানে দাঁড়িয়ে তাঁকে কেউ মুখের ওপর রিফিউজ করে চলে যেতে পারে, কখনও তিনি ভাবেননি। টাকা দিলে কি না পাওয়া যায়? তিনি ভেবেছিলেন—বায়োস্কোপের অভিনেত্রী টাকায় সহজে বশীভূত হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা যখন হলো না, তখন প্রথমে ভবেশ দত্ত অবাক হলেন তারপর গেলেন যাচ্ছেতাই রকম রেগে। সেটা তখন তাঁর মুখ দেখেই অনুমান করা যাচ্ছিল।

পৃথিবীতে আমি দু'ধরনের মানুষ বেশী দেখি। একদল আদেশ করতেই অভ্যস্ত। আর, আর একদল সেই আদেশ অনুগত ভঙ্গীতে তামিল করতে ব্যতিব্যস্ত। ভবেশ দত্ত হচ্ছে প্রথম দলের লোক। অজস্র টাকা আর ক্ষমতা ওর হাতের মুঠোয়। এ-অঞ্চলের সবাই তাকে সমীহ করে চলে। কেউ কেউ ভয়-ও করে।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটবার পর আমি শান্তভাবে বললাম—কাজটা কিন্তু মোটেও ভাল হল না। এসব আপনি কি করলেন?

ভবেশ দত্ত আমার দিকে তাকালেন। বোঝা গেল প্রাণপণে নিজেকে সামলে নিচ্ছেন ভদ্রলোক। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললেন—ঠিকই বলেছেন। কেমন সব যেন গণ্ডগোল হয়ে গেল আমার। অথচ এখানে বুঝতেই পারছেন, মেয়েটার কথা ভেবেই আসলে···যাই হোক উনি যদি একটি-বারের জন্যে যেতেন তো—

—অসম্ভব। এখুনি যা কাণ্ড করলেন এরপর ওই প্রশ্ন আর ওঠেই না। এখন আপনি চলুন—

ভবেশ দত্ত যেন আমার কথা শুনতে পেলেন না। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন ওখানে।

আমি আবার বললাম—চলুন। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর কি হবে? এখন ওঁকে একটু বিশ্রাম নিতে দিন। আপনি না গেলে উনি ঘর থেকে বেরোতে পারবেন না—

ভবেশ দত্ত তখন শেষবারের মত ঘরের দিকে তাকিয়ে বললেন—

আমার যদি অপরাধ হয়ে থাকে দয়া করে ক্ষমা করে দেবেন। মেয়ের মুখের দিকে চেয়েই আসলে বুঝতেই পারছেন সব, ওর একটা ইচ্ছে আমি বাবা হয়ে যদি পূরণ না করতে পারি তো কতখানি জ্বালা···দয়া করে পাঁচ মিনিটের জন্য হলেও চলুন—

—ভবেশবাবু, শুনুন—আমি ওঁকে বাধা দিয়ে একটু রুঢ় ভঙ্গীতে বললাম—আপনি এখন চলুন তো। বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে—

অগত্যা ভবেশ দত্ত একটু ইতঃস্তত করে আমাকে অনুসরণ করলেন।

গেটের কাছে এসে হঠাৎ খপ করে আমার হাত দুটি ধরে মিনতির সুরে বললেন—দয়া করে ওঁকে একটু বলুন যাতে উনি রাজী হন।

—অসম্ভব, আমি কিচ্ছু বলতে পারব না।

—কেন? কেন বলতে পারবেন না? একটা মেয়ে—সে মরতে বসেছে—তার একটা অন্তিম কামনা—এটা পূরণ হবে না কেন? আমি তার বাপ হয়ে বলছি—একটু অনুরোধ রাখলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়।

—অনুরোধ আর করলেন কোথায়? আপনি তো টাকার গরম দেখালেন। টাকা দিলে বুঝি সবকিছু পাওয়া যায়? ব্যাপারটা এখন সবার হাতের বাইরে। আর তার জন্যে আপনি নিজেই দায়ী। শুনুন আর বকতে পারছি না। সারাদিন পাহাড়ে জঙ্গলে শুটিং করে ডগ টায়ার্ড। কিছু মনে করবেন না। চলি—

যেতে যেতে দেখলুম, ভবেশ দত্ত অন্ধকারে তখনও গেটের ওপারে দাঁড়িয়ে। এরপর গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট হবার শব্দ ভেসে এল বাতাসে। অর্থাৎ ভবেশ দত্ত বিদায় হলেন। বাপস, কি লোক।

কেষ্ট বলে গেল, ম্যাডাম ডেকেছেন, ওঘরে একবার যাবেন।

আউটডোর শুটিং হলে ছবির প্রধান সহকারীর দায়িত্ব থাকে বোধকরি সকলের চেয়ে বেশী। ক্যাম্পে ফিরে সবাই যখন বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম করে তখন প্রধান সহকারীকে পড়তে হয় পরেরদিনের

প্রোগ্রাম তৈরি করার কাজ নিয়ে। এ-কাজটা তাকে প্রধানতঃ ছবির যিনি প্রোডাকশন কণ্ট্রোলার—তার সঙ্গে পরামর্শ করেই স্থির করতে হয়। পরদিন সকালে যে লোকেশান—সেটা কোথায়? সেখানে প্রথম ব্যাচে কে কে আর্টিস্ট? সেকেণ্ড ল'টে কে কে আর্টিস্ট? লোকেশনের কি কি রিকুইজিশান? সেগুলো ভোর ক-টায় লোকেশনে পৌঁছানো দরকার? ওখানে কত ফুট ফিল্ম লাগতে পারে? সাউণ্ড লাগবে কি না? প্লে-ব্যাক আছে কি না? লাঞ্চ কোন জায়গায় সার্ভ করা যায়? লোকেশানে মেয়েদের যদি কস্ট্যুম চেঞ্জ করতেই হয়—তাহলে কি ব্যবস্থা করা যায়? ধারে কাছে বাড়ি-টাড়ি আছে কি না? স্পেশাল রিকুইজিশান সব তৈরি আছে কি না?

কণ্ট্রোলারের সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে গেলে এবার যেতে হয় আর্টিস্টদের কাছে। পরদিন কার কোন্ সিন। কে ডায়লগ মুখস্থ করবেন। প্লে-ব্যাক থাকলে তার রিহার্সাল হচ্ছে কি না। নাচের দৃশ্য থাকলে তার অনুশীলন হচ্ছে কি না। কার কি পোষাক। ক'টা সিন। কখন ক্যাম্প থেকে বেরোতে হবে—সমস্ত ব্যাপারটা ঘুরে ঘুরে চেক রি-চেক করতে হবে। তারপর রিপোর্ট করতে হবে পরিচালকের কাছে। তিনি তখন সহকারীকে নিয়ে বসবেন শট ডিভিশন করতে। সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। প্রত্যেক প্রধান সহকারীকে এটা মাথায় রাখতে হবে। সান কণ্ডিসন বুঝে পরিচালককে এলার্ট করতে হবে। একটু এদিক বা ওদিক হলেই শিডিউল কিন্তু আপসেট হয়ে যাবার ভয় থাকে। সেই সঙ্গে আর্টিস্টদের তৈরি করবার দায়িত্বও প্রধান সহকারীর। পরিচালক শটের আগে যা যা চাইতে পারেন, সহকারীকে তা অনেক আগে থেকেই যোগাড় করে রাখতে হবে এবং উনি চাওয়া মাত্রই তা যোগান দিতে হবে। অন্যথায় সব গণ্ডগোল। প্রয়োজনীয় বস্তুটি যদি একটি সিগারেট লাইটার হয় সেটা যতক্ষণ না পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত শট আটকে থাকবে। সহকারী যদি ভুল করে ওটা ক্যাম্পে ফেলে আসে, তাহলে ওটি আনবার জন্যে তৎক্ষণাৎ গাড়ি ছোটাতে হবে। তাই সব ছবির প্রধান সহকারীকে

খুঁটিনাটি সব ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হয়, পরিচালকের ইচ্ছা এবং অনিচ্ছা তাঁর মুখ ফুটে বলার আগেই বুঝে নিতে হয়। বুঝে নিতে হয় শিল্পীর মেজাজ এবং মর্জি। সহকর্মীদের মনোভাব। এগুলো যিনি ভাল কো-অর্ডিনেট করতে পারবেন না, তার পক্ষে প্রধান সহকারীর কাজ চালিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে। এটা আমার সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি।

আর স্নান করা হল না।

মেজাজ এমনিতে খিঁচড়ে গেছে। ভবেশ দত্ত লোকটি এসে এমন একটা কাণ্ড করে গেল যে……তাড়াতাড়ি পোষাক বদলে নিয়ে ফাইল-পত্র নিয়ে যেতে হল প্রোডাকশন কণ্ট্রোলারের কাছে। তার সঙ্গে এখুনি কথা না বললেই নয়। সে আমার সঙ্গে ব্যবস্থা করে এখুনি স্টেশনে ছুটবে গাড়ি নিয়ে। কলকাতা থেকে দুজন আর্টিস্ট আসছেন। তাঁদের রিসিভ করতে হবে। ফেরবার পথে পরদিনের জন্যে আনাজ-পত্রের বাজার বয়ে আনতে হবে। আমাকে দেখে সে চেঁচিয়ে উঠল—এস তাড়াতাড়ি, তোমার জন্যে দেখছি আজ আমার চাকরী-ই নট হয়ে যাবে। পাহাড়ীদা (সান্যাল) ষ্টেশনে নেমে যদি আমাকে না দেখতে পায় তো—

—তো কি ? প্রাণদণ্ড ?

—প্রায় সেই রকম। যতসব ছিটিয়াল মানুষ। সবই তো জানো—

আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রোডাকশন কণ্ট্রোলার আমার রিকুইজিশান লিস্ট ব্যাগে পুরে ভো-কাট্টা হয়ে গেল। তখন আমি গেলাম ম্যাডামের কাছে।

উনি অন্ধকার বারান্দায় একটা চেয়ারে চুপচাপ বসেছিলেন। আমাকে দেখে ইঙ্গিতে বসতে বললেন। মুখোমুখি একটা চেয়ার। নিঃশব্দে বসলাম।

সামান্য চুপ করে থেকে বললেন—কি বিচ্ছিরি একটা ব্যাপার হয়ে গেল বলুন তো—

আমি চুপ করে রইলাম।

আবার কিছুক্ষণ নীরবে কেটে গেল।

ম্যাডাম আবার বললেন—এই মৃত্যু-টিত্যুর ব্যাপারে আমার কেমন যেন একটা আভারসান আছে। জানেন—আমি এ-পর্যন্ত চোখের ওপর কাউকে মরতে দেখিনি, মানে একজন লাস্ট ব্রেথ ফেলছে—এমন কাউকে। অবশ্য সে রকম অকেশান হয়ওনি। আমি তখন বোম্বেতে—কলকাতায় আমার বাবা হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন। বিকেলের ফ্লাইটে যখন কলকাতায় এলাম, তখন সব কাজ শেষ। ওরা সবাই শ্মশান থেকে বাড়ি ফিরল। আমি···আমি······

ম্যাডাম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। হঠাৎ বাতাস কেমন যেন ভারী হয়ে গেল। আমি তখন নিরুপায়। ম্যাডামের সঙ্গে কথা বলে আমাকে এক্ষুনি ছুটতে হবে অন্যান্য শিল্পীদের ঘরে। পরিচালকের কাছে। তিনি এতক্ষণ স্ক্রিপ্ট নিয়ে বসে গেছেন। আমি গেলে আমাকে আদ্যপান্ত সব বুঝিয়ে দিয়ে তবে বিশ্রাম নেবেন।

—নাঃ, আমি কাউকে মরতে দেখিনি। দেখতে চাইও না। আমার কেমন যেন ভয় করে।

ম্যাডাম হঠাৎ শব্দ করে হাসলেন—এমন কি কোন ছবিতে ডেথ সিন থাকলে আমি কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে যাই। অথচ অভিনয়-ই তো ! তবু ভীষণ নার্ভাস হয়ে যাই—

—বটেই তো—কথাটা আমি যেন অকারণেই যোগ করলাম।

—চা খাবেন ?

—এ্যা ?

—চা ?

—চা ?······নাঃ, এখন আর চা খাব না। তবে আপনার যদি ইচ্ছে হয় তো আনিয়ে দিচ্ছি—

ম্যাডাম আপত্তি করলেন—না না, দরকার নেই।···এবার বলুন, কাল কোন সিনটা করবেন আপনার ? আজকেরটা তো শেষ হল না। এটারই বা কি হবে ?

এই সুযোগটা খুঁজছিলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে বললাম—সেটা এখনও পর্যন্ত ঠিক হয়নি। এখনও দাদার (পরিচালকের) সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। দেখি উনি কি ভাবছেন—

ক্যাম্পের নানা ঘর থেকে গল্প-গুজব, গান-বাজনা এখন এই রাতের বাতাসে ভাসছে। কিচেন থেকে রান্নাকরা মাংসের গন্ধ। একদল উঠোনে বসে রামি খেলছে হৈ চৈ করতে করতে। সহকারী ক্যামেরাম্যান সেদিনের এক্সপোজড নেগেটিভ থেকে টেস্ট বের করে নিয়ে এখন কেমিক্যালে চুবিয়ে চুবিয়ে তার রেজাল্ট দেখছে। তার মুখে ক্রমে হাসি ঝিলিক দিচ্ছে। আর একদল বসেছে রাজনীতি নিয়ে। পৃথিবীর কোন দেশকেই তারা বাদ দিচ্ছে না। একেবারে চুলচেরা হিসাব-নিকাশ। গম্ভীর মুখ চোখ, ভাবখানা এরা শুটিং ক্যাম্পে নয়, খোদ ইউনাইটেড নেশান্সে বসে আছে যেন।

সম্বিত ফিরল নায়িকার কথায়।

উনি বলছেন—ভদ্রলোক এমন একটা স্ট্রেঞ্জ ব্যবহার করলেন—

—হ্যাঁ। রীতিমত শকিং।

—আমি মানে আপনারা তো সবাই জানেন, আমি লোকেশান শুটিং-এ এলে কোথাও যাই না। আমার একদম ভাল লাগে না। বিশেষ করে গৌহাটির ব্যাপারটার পর···

—ছেড়ে দিন ওকথা। কোথাকার কে একটা লোক। আমি হাটিয়ে দিয়েছি। ফরগেট।

ম্যাডাম বললেন—আচ্ছা একটা খোঁজ নিতে পারেন, ওর মেয়ে কি সত্যিই ডেথ বেডে ? মানে সত্যি সত্যিই যদি ব্যাপারটা তেমন হয়, তাহলে—

—তাহলে? তাহলে আপনি যাবেন নাকি দেখতে ?

ম্যাডাম জবাব দিলেন না।

বললাম—খোঁজ পাওয়াটা এমন কিছু শক্ত নয়। চৌকিদারকে জিগ্যেস করলেই সত্যি-মিথ্যে সব জানা যাবে।

ম্যাডাম মৃদু কণ্ঠে বললেন—তাহলে খবরটা একবার নিন। কথাটা

শোনা অব্দি মনের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বস্তি লাগছে। এটা ক্লিয়ার করতে না পারলে হয়ত আজ রাত্রে ভাল করে ঘুমোতেই পারব না। প্লীজ···

—হাঁ বাবুজী, দত্তো সাহাবের লেড়কীর বহুত বেমারী। চৌকিদার বলল—ভগোয়ান শাস্তি দিচ্ছেন বাবুজী। পাপী আছে কিনা। গরীব আদমীকে জুলুম করলে এহি হাল হোতা হ্যায় আদমীকা। দত্তো সাহেবের জরু মরে গেল, আভি লেড়কী যানেবালা হ্যায়। এইসাহাই হোতা হ্যায় ভগোয়ান-কি-বিচার, বাবুজী।

ম্যাডামের দিকে তাকাতে তিনি মুখ ফিরিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকালেন।

—আচ্ছা চৌকিদার তুমি যাও।

—ঠিক হ্যায় বাবুজী।

চৌকিদার সেলাম করে চলে গেল।

বললাম—তাহলে আমি এখন উঠি ম্যাডাম।

উনি নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লেন। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন। আমি ফাইল নিয়ে গেলাম পরিচালকের ঘরের দিকে।

কেষ্টর ডাকে ধড়মড় করে আমি উঠে বসেছি। শুনলাম, কেষ্ট বলছে—রঞ্জনদা উঠুন উঠুন, ম্যাডাম আপনাকে একটু ডাকছেন—

তখনও আমার দু'চোখে ঘুমের জড়তা। ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে কিছুক্ষণ সময় নিল।

—কি ব্যাপার কেষ্ট, এত রাতে আবার কি হলো ?

কেষ্ট বলল—জানি না। তবে ম্যাডাম বেরিয়ে এসে ঘরের বাইরে পায়চারী করছেন দেখলাম। সবাই ওখানে হাজির হয়েছেন। আপনি একবার যান।

শশব্যস্তে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম।

পরিচালক উদ্বিগ্ন মুখে চেয়ারে বসে আছেন। ক্যামেরাম্যান দিলীপ-রঞ্জনও উপস্থিত। পরিচালক ইঙ্গিতে আমায় কাছে ডাকলেন।

—ভবেশ দত্তর ব্যাপারটা কি বল তো ?

—কেন কি হল ?

পায়চারীরতা নায়িকাকে চোখের ইঙ্গিতে দেখিয়ে পরিচালক মৃদু কণ্ঠে বললেন— উনি এখন সেই ভদ্রলোকের বাড়িতে যাবেন বলছেন। কে একটা অসুস্থ মেয়েকে দেখতে। আমি তো এর কিছুই জানি না। ঘটনাটা কি বল তো ?

সংক্ষেপে খুলে বললাম।

শুনে পরিচালক মশায় নিঃশব্দে ভ্রূভঙ্গী করলেন।

—অ।...তা সে সকাল হলেও তো যাওয়া যেতে পারত। এই অন্ধকার রাত্রে অপরিচিত জায়গায়—তুমি কি বাড়িটা চেনো ?

—নাঃ।

—তাহলে ? উনি যে-রকম জেদ করছেন, যা-হোক একটা ব্যবস্থা করো—পরিচালক তাঁর কণ্ঠে বিরক্তি প্রকাশ করে ফেললেন—এই মাঝরাতে এসব কি কারো ভাল লাগে ! সারা দিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর ?

—চৌকিদার চেনে বাড়িটা। যদি বলেন তো একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি—

পায়চারীরতা নায়িকা সম্ভবত আমার কথা শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন—যদি আপনারা সঙ্গে কেউ না যেতে চান তো আমি একাই যাব। চৌকিদারকে সঙ্গে নিয়েই যাব—

শশব্যস্তে পরিচালক বলে উঠলেন—আপনি অনর্থক রেগে যাচ্ছেন কেন ? আপনার সঙ্গে আমরা সবাই যাব। এক্ষুনি সব ব্যবস্থা হচ্ছে।

চৌকিদার এসে সেলাম করে দাঁড়াল। বলল—হাঁ হুজুর, ভবেশ দত্তো সাহাবের বাড়ি হিঁয়াসে করিব দু-মিল রাস্তা হ্যায়। চলিয়ে, ম্যয় সাথ দেতা হুঁ।

উত্তরপ্রদেশের সেই ছোট্ট পাহাড়ী বাংলো থেকে হিমেল শীতের রাতে আমরা কজন বেরিয়ে পড়লাম ভবেশ দত্ত'র মোকানের উদ্দেশ্যে। আমাদের

পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল স্থানীয় চৌকিদার। তার হাতে একটি লণ্ঠন তাকে অনুসরণ করে প্রথমে পরিচালক। পরে ম্যাডাম আমি আর ক্যামেরাম্যান দিলীপরঞ্জন।

লণ্ঠনের অস্বচ্ছ আলোয় আমরা একটা মাঠের মধ্যে দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছি। উঁচু-নীচু জমি। সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে।

মাথার ওপর অন্ধকারের আকাশ। তাতে অজস্র তারা ফুটে আছে। অদূরের পাহাড় থেকে জন্তু জানোয়ারের ডাক ভেসে আসছে। বেশ শীত করছে। তাড়াতাড়ির ফলে শুধু মাত্র একটা সোয়েটার গায়ে দিয়েই বেরিয়ে পড়েছি। মনে হল, একটা চাদর আনলে বোধহয় ভাল হত। দিলীপরঞ্জন খুব চালাক মানুষ। বিছানার চাদরটা নিয়ে এসেছে। এখন সেটাই গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে ও।

—আর কদ্দুর চৌকিদার? পরিচালকের কণ্ঠ শোনা গেল।

—নজদিগ হ্যায় সাহাব। এই মাঠ পেরিয়ে বাঁ দিকে যে টিলা—ওর ঠিক ওপরেই দত্তো সাহাবের মোকান।

এরপর কিছুক্ষণ আমাদের নীরবে কাটল। ম্যাডাম একটাও কথা বলছেন না। মাথা নীচু করে হেঁটে চলেছেন শুধু।

বেশ খানিকটা হাঁটবার পর হঠাৎ চৌকিদার একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে উপরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল—ওই যে—দত্তো সাহাবের কোঠি—

—তা দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? চল এগিয়ে।

চৌকিদার একথায় সামান্য ইতস্তত করল। বলল—হুজুর আমার যাওয়া ঠিক হবে না। আমি এখানে অপেক্ষা করছি। আপনারা যান—

—কেন?

—দেখুন, এত রাত্রে আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি, উনি হয়ত রাগ করতে পারেন। আমি গরীব মানুষ—

পরিচালক তাড়াতাড়ি আমার কাছে জানতে চাইলেন—কী রঞ্জন, এত রাত্রে গেলে কেউ আবার বিরক্ত-টিরক্ত হবে না-তো?

তার আমি কি জানি? দত্তবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় তো মাত্র

কয়েক ঘণ্টার। ভদ্রলোকের কিসে রাগ কিসে অনুরাগ—কি করে বুঝব?

মুখে বললাম—কি জানি, বলতে পারছি না। তবে উনি নিজেই তো পর পর ক'দিন আমাদের ওখানে হাঁটাহাঁটি করেছেন। আর গরজটাও ওঁরই নিজের। দেখা করতে না চাইলে বা ফালতু কিছু উল্টোপাল্টা বললে আমরা তৎক্ষণাৎ চলে আসব। ব্যস!

চৌকিদার কিছুতেই সঙ্গে যেতে রাজী হল না। তখন আমি তার হাত থেকে লণ্ঠনটা নিয়ে নিলাম। এবার আমাদের পাহাড় ভেঙে খানিকটা উপরের দিকে উঠতে হবে। পথের দু' ধারে ঘন জঙ্গল। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকে অন্ধকারে অদৃশ্য প্রকৃতি মুখর।

দিলীপরঞ্জন একটু ভীতু স্বভাবের মানুষ। ফিসফিস করে বলল—কোনো জন্তু জানোয়ার অ্যাটাক করবে না তো?

উদাসীন ভঙ্গীতে বললাম—করলে করুক। বায়োস্কোপের লাইনে চাকরী কর অথচ এখনও জন্তুতে ভয়? ডরপুক কঁহিকা—

আঁকা-বাঁকা মেটালের রাস্তা বেয়ে শেষ পর্যন্ত আমরা একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম।

অন্ধকারের মধ্যে জেগে আছে এক আধুনিক স্থাপত্য। সামনেই গ্রীলের গেট। সমস্ত বাড়িটা এখন নিঝুম।

গেটের আশে-পাশে খুঁজলাম—যদি কলিং বেলের কোন ব্যবস্থা থেকে থাকে। নাঃ। এবার চেঁচিয়ে ডাকব কিনা ভাবছি এমন সময় বাড়ির বারান্দা থেকে একটি গম্ভীর পুরুষকণ্ঠ ভেসে এল—কোন হ্যায় উধার?

পরিষ্কার দত্তবাবুর গলা।

বললাম—মিঃ দত্ত, আমরা—

ও-পাশটা চুপ হয়ে গেল। তারপরই প্রশ্ন?

—আমরা মানে?

—আমরা হচ্ছি ফিল্মের ইউনিটের—মানে আপনি আজ যে আমাদের বাংলোয় গিয়েছিলেন মিঃ দত্ত, আমরা সেই বাংলো থেকেই আসছি—

অন্ধকারে সঙ্গে সঙ্গে চটির ফটফট শব্দ শোনা গেল। মোরাম আর

পাথরের নুড়ি বিছানো রাস্তায় পায়ের শব্দ আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। সেই সঙ্গে কণ্ঠস্বর—রামবিলাস, রামবিলাস হো—

বেশ খানিকটা দূর থেকে রামবিলাসের নিদ্রাবিজড়িত জবাব শোনা গেল—যাতা হৈ মালিক—

—গেট কি চাবি লে আ' করো, তুরন্ত—

—হৈ মালিক—

বিশালদেহী রামবিলাস প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে গেটের চাবি খুলে দিল। আমাদের দেখে সে অবাক চোখে তাকাল।

ইতিমধ্যে ভবেশ দত্ত এসে পড়েছেন। গায়ে বুশ সার্ট পরনে পাজামা। মুখে যুগপৎ বিস্ময় এবং আনন্দের অভিব্যক্তি। দুহাত জোড় করে বিনীত ভঙ্গিতে বললেন—আসুন আসুন। আমার কি সৌভাগ্য।

আমি পরিচালক ও ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দিলাম। নমস্কারের পর্ব শেষ হল।

সহাস্যে বললাম—ম্যাডাম শেষ অব্দি আপনার মেয়েকে দেখতে এলেন মিস্টার দত্ত—

ভবেশ দত্তের চোখ দুটি হঠাৎ চিকচিক করে উঠল। আবেগে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। সামান্য চুপ করে থেকে ভবেশ দত্ত বললেন—আপনাকে যে ধৃষ্টতা দেখিয়েছি তার জন্যে পারলে আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। আসলে তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না। কি বলতে গিয়ে কি বলে ফেলেছি। আপনার সঙ্গে আমার যে দেখা হয়েছে, রত্নাকে এখনও আমি সে-কথা বলিনি। শুধু বলেছি যে এখনও পর্যন্ত কোন দেখা সাক্ষাৎ হয়নি···আর বলেছি, একবার দেখা করে বললেই আপনি রাজী হয়ে যাবেন।···শেষ পর্যন্ত আপনি যে এই দয়া করে আমার বাড়ি পর্যন্ত এলেন—আমার মেয়েকে দেখতে—এর জন্যে আমি চিরদিন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব।

ম্যাডামের মুখে অস্বস্তির হাসি। বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন—ওসব কথা থাক। এখন চলুন—রত্নাকে দেখে আসি। এখন ঘুমোচ্ছে তো?

ভবেশ দত্ত মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন—উহুঁ, রত্না আজকাল আর বড় ঘুমোয় না। ওষুধ দিলেও না। ফলে আমার চোখেও ঘুম নেই। বাপ-বেটিতে আমরা জেগেই রাত পুইয়ে দিই এক একদিন—

রামবিলাস ততক্ষণে বাড়ির সামনের আলোটা জ্বেলে দিয়েছে। বারান্দায় ফ্লুরোসেণ্ট টিউব ল্যাম্পের একটা প্যানেল জ্বলে উঠেছে। অন্ধকারের মধ্যে বাড়িটা হঠাৎ যেন জেগে উঠেছে। মোজাইক করা ফ্লোর। আগাগোড়া ডিসটেম্পার। অজস্র অর্থব্যয় করে যে বাড়িটা তৈরি করা হয়েছে সেটা ভালই বোঝা গেল।

ভবেশ দত্ত আমাদের পথ দেখিয়ে বাড়ির ভেতরে নিয়ে চললেন। চারিদিকে দামী দামী আসবাবপত্র। আধুনিক গৃহসজ্জা। দরজায় ভারি ভারি পর্দা। ভবেশ দত্ত যে বেশ রুচিসম্পন্ন মানুষ, এটা বোঝা গেল।

বারান্দা থেকে একটা সিঁড়ি সোজা দোতলায় উঠে গেছে। সিঁড়ির ধাপ আছে কিন্তু রেলিং নেই। ভবেশ দত্ত আমাদের উপরে যেতে ইঙ্গিত করলেন।—রত্না উপরে থাকে। জানলা দিয়ে পুব দিকের হিল রেঞ্জটা দেখতে ও বড় ভালবাসে বলে আমি এই ব্যবস্থা করেছি।

দোতলার বারান্দায় খুব অল্প পাওয়ারের একটা নীল আলো জ্বলছে।

ভবেশ দত্ত একটা দরজার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর কান পেতে কি যেন শুনতে চেষ্টা করলেন ভেতরের। তারপর মৃদুকণ্ঠে ডাকলেন—সিস্টার—সিস্টার।

ঘরের ভেতরে সামান্য নড়াচড়ার আওয়াজ। তারপর চোখ কচলাতে কচলাতে একটি অল্পবয়সী নার্স বেরিয়ে এল। আমাদের দেখে তো সে রীতিমত অবাক।

—রত্না?

—শুয়ে আছে।

—ঘুমোচ্ছে?

নার্স মেয়েটি চট করে একবার ঘরের ভেতরটা দেখে নিয়ে বলল—মনে হচ্ছে না। এই তো কিছুক্ষণ আগেও আমরা কথা বলছিলাম। এত

শিগগির কি আর ঘুমোয়। দাঁড়ান দেখছি—

ভবেশ দত্ত বললেন—ওকে বল—যাকে দেখবার জন্যে ও ছটফট করছিল—তিনি নিজেই এসেছেন। বাইরে অপেক্ষা করছেন।

নার্স উজ্জ্বল চোখে ম্যাডামের দিকে একবার ভাল করে তাকাল। বাঙ্গালী মেয়ে সে। এবার সে ম্যাডামকে চিনতে পেরেছে। খুশী মুখে তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেল। ভবেশ দত্ত আনচান করছেন। আমাদের জন্যে উনি কি-যে করবেন যেন ভেবে স্থির করতে পারছেন না।

ভেতর থেকে নার্সের মৃদুকণ্ঠের আহ্বান শোনা গেল—আসুন আপনারা। রত্না জেগেই আছে।

সবার প্রথমে ঘরে ঢুকলেন ম্যাডাম।

তারপর তাঁকে অনুসরণ করে একে একে আমরা সবাই।

অদূরে একটি বড় ডিভান। তাতে যে মেয়েটি শুয়ে আছে, তার বয়স বড়জোর ষোল কি সতের। রুগ্নদেহ। কিন্তু কি আশ্চর্য তার দুটি চোখ। যেমন বিশাল তেমনি টানা টানা। পৃথিবীর সমস্ত বিস্ময় ওই দুটি বিশাল চোখের গভীরে হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। পরনে রাতের পোষাক। শীর্ণ হাত দুটি বাড়িয়ে রত্না প্রথমে নার্সকে ধরে উঠে বসতে চাইল। নার্স আপত্তি করল।

রত্না ধীরে ধীরে আবার শুয়ে পড়ল।

উত্তেজনায় তার শরীর কাঁপছে।

ভবেশ দত্ত সামান্য বিচলিত হলেন। বললেন—তুই শুয়ে থাক মা···এই তো উনি এসেছেন তোর কাছে। এবার কত ওঁকে দেখবি—দেখ—

রত্নার চোখ দুটি হঠাৎ জলে ভরে উঠল। আজ কয়েক বছর সে জগৎ-সংসার থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন। রোগের অকটোপাশ আক্রমণে তার কমনীয় কিশোরী দেহ জর্জরিত। তার সাধ-আহ্লাদ বলতে যেন আর অবশিষ্ট কিছুই নেই। দিনরাত ওষুধ খাওয়া আর শুয়ে শুয়ে বই পড়া—এই হচ্ছে তার প্রাত্যহিক জীবনের রুটিন।

এই রকম ভাবেই তার নিঃশেষিত হতে থাকা জীবনের মেয়াদ কেটে

যা ছিল। হঠাৎ নার্সের মুখে একদিন শুনল—তাদের এই শহরে কলকাতা থেকে সিনেমার কয়েকজন শিল্পী এসেছেন। কি একটা যেন ছবির শুটিং উপলক্ষ্যে। আর তার মধ্যে রয়েছে রত্নার সব চাইতে ফেভারিট শিল্পী। এত কাছে এসেছেন উনি; ওঁকে একবার চোখের সামনে দেখা যায় না?

নার্স বলেছিল—তা কি করে সম্ভব? তুমি তো অসুস্থ, শয্যাশায়ী। তুমি ওঁকে দেখতে যাবে কিভাবে?

তা বটে। রত্না প্রতিবাদ করেনি।

রত্না তখন বাবাকে বলেছিল—ওঁকে আমার কথা একটু বলবে? যে আমি অসুস্থ। বিছানায় শুয়ে থাকি। যদি দয়া করে আমাদের বাড়িতে একবার আসেন—

ভবেশ দত্ত কি বলবেন? মেয়ের কোন বাসনা তিনি অপূর্ণ রাখেননি। যখন যা বলেছে বা চেয়েছে—পূরণ করেছেন। কিন্তু এই ব্যাপারটা কিভাবে সম্ভব? ফিল্মের কারও সঙ্গে তো তাঁর চেনা-জানা নেই যে ইনফ্লুয়েন্স করে রাজী করাবেন? উপায়?

সাব-ডিভিশন্যাল অফিসার সব শুনে হেসে বলেছিলেন—অসম্ভব। আর তাছাড়া কিছু মনে করবেন না—আপনার যা রেপুটেশান মশাই রাজীই হবে না। ওরা ফিল্মের লোক। দে আর ভেরি ইন্টেলিজেন্ট পিপল। তা একটা কাজ করুন না। ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার মুখার্জিকে একবার বলে দেখুন না। ওঁদেরই তো গেস্ট। ওঁরা যদি রাজী করাতে পারেন বলে-কয়ে। ফর-এ সিক গার্ল।

ভবেশ দত্ত তারপর মুখার্জিকে বলেছিলেন। মুখার্জি যথারীতি পাত্তা দেয়নি। হেসে জবাব দিয়েছে—আরে ওরা ভীষণ ব্যস্ত। আমরা কত করে ডাকি তাই আসে না, আর আপনার বাড়ি যাচ্ছে! না-না, আমি বলতে পারব না। আপনি নিজে বরং চেষ্টা করে দেখুন—

তারপর পর-পর দুদিন বিফল হয়ে বাড়ি ফিরে এসেও ভবেশ দত্ত কিন্তু রত্নাকে কিছু বলেননি। শুধু একটা মাত্র কথা—দেখা হয়নি। তবে চিন্তা করিস না, বুঝিয়ে বললে রাজী উনি একবাক্যেই হয়ে যাবেন।

আমি কালই একবার যাচ্ছি—

অসুস্থ রত্না এই নায়িকার অনেক সিনেমা দেখেছে। তখন তো সে সুস্থ ছিল। কলকাতার সিনেমার কাগজে ওঁকে নিয়ে বিস্তর লেখাও সে পড়েছে। এই নায়িকাকে সে অসম্ভব শ্রদ্ধা করে। ওঁর অভিনয়ে রত্না বিস্মিত মুগ্ধ। এছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে। রত্না সেটা মনে মনে রেখেছে। কাউকে কখনও বলেনি।

রত্নার যখন নয় বছর বয়স তখন ওর মা হঠাৎ মারা যায়। মৃত্যুটা নাকি অস্বাভাবিক ছিল। ভবেশ দত্ত তখন টাকা রোজগারের নেশায় উন্মাদ। বেশীর ভাগ দিন তাকে শহরের বাইরে বাইরে থাকতে হয়—পাহাড়ে, জঙ্গলে, দূর দূর গ্রামঞ্চলে। এই এলাকার নাম্বার ওয়ান গভমেণ্ট কণ্টাক্টর। দুহাতে রোজগার। সে-সব ফেলে তখন তার ফ্যামিলির দিকে ফিরে তাকাবার সময় কোথায়? কর্তব্য তো সবই করছে। যখন যা দরকার—যুগিয়ে গিয়েছে। বাড়ি, গাড়ি, ঐশ্বর্য। ভবেশ দত্ত তার ফ্যামিলিকে তো অভাবে রাখেনি। কিন্তু স্ত্রী কেবল তাকে কাছে পেতে চায়। মেয়ে চায় তার বাবাকে। ভবেশ দত্ত প্র্যাকটিক্যাল মানুষ। ওসব নাকি বাজে সেণ্টিমেণ্ট। এখন ধনলক্ষ্মী সদয়, এখন যদি গুছিয়ে নিতে না পারা যায়—তো চিরদিন সেই সাবেক অভাবের মধ্যেই থাকতে হবে। আত্মীয়-স্বজন কেউ তো একটা ছ্যাঁদা পয়সা দিয়ে কখনও সাহায্য করেনি। আর করবেও না। স্ত্রীর গহনা বিক্রীর পয়সা দিয়ে যে ঠিকেদারী ব্যবসার সূত্রপাত, তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতেই হবে। এবং যে কোন উপায়ে। অসৎ পথে হলেও। সৎ পথে আজকাল ব্যবসা হয় না।

ঐশ্বর্য আসে। সেই সঙ্গে আসে দম্ভ। অহঙ্কার। তারপর অহঙ্কারের হাত ধরে আসে মত্ততা। মদ আর মেয়েমানুষ। ভবেশ দত্ত জীবনের সহজ সড়ক থেকে নেমে বাঁকা পথে পা রাখে। অসামাজিক কার্যকলাপ তখন পুরোদস্তুর তার আয়ত্তে।

একদিন কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হয়।

ভীনগর নামে একটা জায়গায় তখন বড় একটা কাজ চলছে। একটা

বাঁধা মেয়েমানুষ নিয়ে ভবেশ দত্ত সেখানে এক মাস পড়ে আছে। বাড়ির সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। সেদিন সকালে কাজে বেরুবে বলে সবে জিপে উঠেছে, হঠাৎ টেলিগ্রাম পিয়ন এসে হাজির। সরকারী কোন নির্দেশ নাকি? সই করে নিয়ে পড়তে গিয়েই ভবেশ দত্তর চোখের সামনের পৃথিবীটা হঠাৎ কেঁপে কেঁপে উঠল—গতরাত্রে ভবেশ দত্তর স্ত্রী মারা গেছেন। তার একবার এখুনি বাড়ি যাওয়া দরকার। সৎকারের আয়োজন সম্পূর্ণ···শুধু তিনি গিয়ে পৌঁছালেই···

ভবেশ দত্তর চোখ দিয়ে তখন টসটস করে জল পড়ছিল। ভাঙ্গা গলায় উনি বলছিলেন—মশাই এ আমারই পাপ। আর এই হচ্ছে পাপের শাস্তি। কে বলে পাপ নেই পুণ্য নেই—স্বর্গ নেই নরক নেই? আমাদের এই পৃথিবীটাই তো আস্ত একটা নরক। স্বামী হয়ে স্ত্রীকে ধরে রাখতে পারলাম না। সুখের মুখটা শুধু একপলক দেখেই সে চলে গেল। রেখে গেল মেয়েটাকে। কিন্তু ইদানিং তাকেও আবার হাতছানি দিচ্ছে। আর আমি অভিশপ্ত হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই শুধু দেখে যাচ্ছি। জানি না আর কতদিন আমার এই শাস্তি চলবে।

বুকভাঙা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন ভবেশ দত্ত। তারপর শার্টের খুঁটে চোখ মুছলেন। আমরা তখন বসে আছি বারান্দায়। ঘরের মধ্যে রত্নার পাশে গিয়ে বসেছেন আমাদের ম্যাডাম। নার্স অদূরে দাঁড়িয়ে।

রত্নার বিশাল দুটি চোখ জলে ভরে উঠেছে দেখে ম্যাডাম তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ওর পাশে দাঁড়িয়েছেন। সাগ্রহে ওর হাত দুটি নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। তারপর স্নেহকোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করেছেন—তোমার কষ্ট হচ্ছে?

রত্না ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে জানিয়েছে—না, তার কোন কষ্ট হচ্ছে না।

আসলে এ তার আনন্দাশ্রু। এভাবে এর আগে তার কোন কামনা এমন চরিতার্থ কখনও হয়নি।

ম্যাডাম ওর পাশে বসেছেন। নিজের হাতে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছেন। তবে তুমি কাঁদছ কেন? তুমি হাসো। আমি তোমার

হাসিমুখ দেখব বলেই যে এসেছি রত্না।

রত্না এবার হাসে। আর সেই হাসিটা ক্রমে ওর সমস্ত মুখে, সমস্ত দেহে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ম্যাডামের মুখেও হাসি। এই অনির্বচনীয় হাসি আমি আগে কারও মুখে দেখিনি। সিনেমায় ক্যামেরার সামনে তো জীবনের হরেক নাটকের অভিনয় দেখি—কিন্তু আজকের এই মুহূর্তটি—এর আগে কখনও দেখিনি রত্না কত স্বচ্ছন্দে হাসছে। ওর শীর্ণ হুটি হাত ম্যাডামের মুখে। ওখানে সে কি-যেন অনুভব করছে। ম্যাডাম ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। একটাও কথা নয়। নিঃশব্দ অপ্রতিরোধ্য নিখাদ সোনা ঝরা হাসি। সব গ্লানি এবং মালিন্য যেন ধুয়ে মুছে যাচ্ছে নির্বিশেষে। হা ঈশ্বর, জীবনের এ কোন নাটকের দর্শক করলে আমাকে? মৃত্যুপথযাত্রিনী কিশোরী আর গ্লামারের জগতের পুড়তে পুড়তে ছাই হতে যাওয়া এক তারকা—কার নির্দেশে হঠাৎই বা আজ মুখোমুখি?

কখন যেন ওদের মাঝখানের ব্যবধান ঘুচে গেছে। ওরা হুজনে একে অপরের মনের কাছাকাছি এসে পড়েছে। রত্না মৃদুকণ্ঠে এক সময় প্রশ্ন করেছে—আপনাকে একটা কথা বললে আপনি রাগ করবেন না তো?

ম্যাডামের মুখে প্রশ্রয়ের স্মিত হাসি।···কেন, রাগ করব কেন? কি জানতে চাও বলো—

রত্না জানতে চায় না, জানাতে চায়। একটু ইতঃস্তত করে মৃহ কণ্ঠে সে বলে—আপনাকে দেখতে অবিকল আমার মায়ের মত—

হাসি বিহ্যতের মত ঝিলিক হানে নায়িকার ঠোঁটে।—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।···আমার মায়ের মুখের সঙ্গে অনেকটা আদল আছে আপনার। সেজন্যেই লজ্জায় জড়িয়ে যেতে থাকে রত্নার রোগ-হুর্বল কণ্ঠ।···সেজন্যেই তো আপনার অনেক ছবি আমি জমিয়ে রেখে দিয়েছি। কেউ এটা জানে না। কি অবাক কাণ্ড, শেষ পর্যন্ত আপনি এখানে এলেন। আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না···

ম্যাডাম আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। কেন জানি না—আপনি

কখনও চাননি—এ ব্যাপারটা নিয়ে আমি কখনও কিছু লিখি। বা কিছু বলি। কিন্তু সেদিনের যে আপনাকে আমি চোখের সামনে দেখেছি, তা আমি ভুলতে পারিনি। এটা আমার জীবনে একটা মূল্যবান অভিজ্ঞতা। কিছুদিন আগে আপনাকে কেন্দ্র করে আপনার পারিবারিক একটা ঘটনা নিয়ে বেশ সোরগোল পড়ে গিয়েছিল। আমি সব শুনেছিলাম। কিন্তু কোন মন্তব্য করিনি। কারণ যারা আপনাকে ভাল করে চেনে, আমি মনে করি আমি তাদেরই একজন। আপনি একাধারে নায়িকা জায়া এবং জননী। আপনি আপনার নিজস্ব পটভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিতা। এ কাহিনীতে আপনার পরিচয় উদ্ধার করার দায়িত্ব পাঠকের। আমি কোন ইঙ্গিতও দিইনি। অতএব এটাকে আপনি একটা নিছক গল্প হিসাবে নেবেন আশা করি। তার বেশি কিছু নয়। ম্যাডাম সেবার দিল্লীতে শুটিং করতে গিয়ে আমার সঙ্গে ভবেশ দত্তর হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল। ওঁকে আমি পালাম এয়ারপোর্টে আবিষ্কার করেছিলাম। আমরা তখন খুব ব্যস্ত। হল্যাণ্ড থেকে একটা জাম্বো জেট প্লেন তখন টারম্যাকে পৌঁছে গেছে। সেই প্লেনের ভেতরে আমাদের শুটিং করার কথা। উত্তমকুমার আর অর্পণা সেন আমাদের আর্টিস্ট। আমরা তখন উর্ধ্বশ্বাসে কাস্টমস এনক্লোজার পার হয়ে প্লেনের দিকে ছুটছি। আমাদের সঙ্গে আর্টিস্টরাও রয়েছেন। হঠাৎ নজরে পড়ল লাউঞ্জের বাঁদিকে, যেখানে এয়ার ইণ্ডিয়ার কাউণ্টার, সেখানে একজন আমার দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে রয়েছেন। ইনি সন্ন্যাসী। পরনে তার গৈরিক বসন। আমি চমকে উঠেছি। এঁকে কোথায় যেন দেখেছি? হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত স্মরণ হল—এই তো সেই ভবেশ দত্ত। —আপনি কোথায় চলেছেন? চেঁচিয়ে প্রশ্ন করেছি—আপনি আমায় চিনতে পারছেন? সন্ন্যাসী শান্ত হেসে কোমল কণ্ঠে বলেছেন—চিনেছি। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

প্রশ্ন করেছি—রত্না? রত্না কেমন আছে?

উত্তর এসেছে—সে ভাল আছে। সে এখন তার মায়ের কাছে। বড় আনন্দে আছে।

হঠাৎ পেছন থেকে ধাক্কা। প্লীজ ক্লিয়ার, ক্লিয়ার দ্য প্যাসেজ…জাম্বো জেটের ভারতীয় যাত্রীরা নেমে আসছে কাস্টমস এনক্লোজারে। সিকিউ-রিটির লোকেরা আমায় এগিয়ে যেতে বলছে। ওদিকে শুটিং-এর তাড়া। আসলে ভবেশ দত্ত নেই তো ওখানে। ওখানে একজন সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে। আমি হাত নাড়লাম। জবাবে তাঁর প্রশান্ত হাসি পেলাম। শেষবারের মত দেখে নিয়ে আমি ভেতরে পা বাড়ালাম। জেনে গেলাম, আপনার স্নেহের রত্না এখন তার নিজের মায়ের কাছেই নিরাপদে আছে। এটা আপনি কি ইতিমধ্যেই জেনে গেছেন ?…

ভবেশ দত্তর আদেশে রামবিলাস আমাদের জন্যে কফি তৈরি করে এনে দিয়েছে। দামী সিগারেটের টিন খুলে ধরেছে। গ্যাস লাইটার জ্বেলে দাঁড়িয়েছে।

রাত্রি এখন তৃতীয় যামে।

ভেতরে খুট করে আওয়াজ হল। দেখি, ম্যাডাম বেরিয়ে আসছেন স্মিত হাসি মুখে। তারপর ভবেশ দত্তকে বললেন—মেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি এখন চলি।

ভবেশ দত্ত শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালেন। জোড় হাতে।

ম্যাডাম বললেন—এভাবে আর অপরাধী করবেন না মিঃ দত্ত। আপনি রত্না ঘুম থেকে উঠলে বলবেন, আমি কাল সন্ধ্যায় আবার আসব। এবার হাতে সময় নিয়েই আসব। ওকে আমার অনেক গল্প বলার আছে।

কৃতজ্ঞতায় ভবেশ দত্তর চোখ আবার ছলছল করে উঠল। অস্ফুটে বললেন—ভগবান আপকি কৃপায়া করে…

আমরা এবার আমাদের ক্যাম্পে ফিরছি। ভবেশ দত্ত এগিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমরা নিষেধ করলাম। এবার রামবিলাস দুটো টর্চ নিয়ে আগে আগে চলেছে। লণ্ঠনের আলো ঝাপসা হয়ে এসেছে।

পরিচালক যেতে যেতে মন্তব্য করলেন—এ একেবারে সিনেমার গল্প হয়ে গেল। রঞ্জন, একবার চেষ্টা করে দেখবে নাকি ?

অথচ আমি কেন ভাবলাম—এতে সিনেমা হয় না। হওয়া সম্ভও নয়।

ভারত সীমান্তের সেই শহরে আমরা আছি ক্যাম্পে। থাকি শুধু রাতটা। আর দিনের বেলাটা কাটে নদীতে। যাতায়াতের পথে শহরের দেয়ালে হঠাৎ একদিন সবার চোখে পড়ল কিছু ছাপানো পোস্টার। অবাক বিস্ময়ে আমরা পড়লাম তাতে লেখা বিরাট বিচিত্রানুষ্ঠান। অমুক দিন অমুক মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। গান গাইবেন শ্যামল মিত্র, মাধবী মুখার্জি, অনুপকুমার, তরুণকুমার, জ্ঞানেশ মুখার্জি প্রভৃতি শিল্পী। তারপর টিকিটের মূল্য লেখা।

অনুপকুমারের চক্ষুস্থির।—আমি গান গাইব। সে কি ভাই! জ্ঞানেশ মুখার্জিরও তথৈবচ অবস্থা। জীবনে কখনও কোথাও গান গাইনি হঠাৎ এখানে ফাংশনে গান গাইব, তার মানে? এ নিশ্চয় বদলোকের কাজ।

কিন্তু এসব পোস্টার দিল কারা? কি তাদের উদ্দেশ্য। লঞ্চ-ঘাটায় প্রশ্ন করতে একজন সবিনয়ে জানাল—আপনারা সেদিন গান গাইবেন বলে কথা দিয়েছিলেন, তাই পাড়ার ছেলেরা একটা ফাংশন করবে বলে স্থির করেছে—

শ্যামল মিত্র সব শুনে মহা বিরক্ত।—এ কি ধরনের অসভ্যতা, এঁ্যা? আমি বলেছিলাম একটা ঘরোয়া আসরে কিছু গান গেয়ে শোনাব। কখনও বলিনি, ফাংশনে গান গাইব। তারপর অনুপ জ্ঞানেশ আর তরুণ—এরা গান গাইবে পোস্টারে দেখলাম। হোয়াট ইজ দিস?

জ্ঞানেশ মুখার্জি তো হেসেই অস্থির। আমায় বললে—ঠিক আছে, আমায় যদি গান গাইতে একান্তই পীড়াপীড়ি করে তো তোমরা প্লে-ব্যাক মেসিন চালু করবে, আমি ডায়াসে উঠে শুধু শ্যামলের গানের সঙ্গে লিপ মিলিয়ে যাব—

অনুপকুমার সঙ্গে সঙ্গে তাকে সমর্থন করে বলল—আমি সম্পূর্ণ একমত। এ ছবিতে হেমন্তবাবুর যে গানের সঙ্গে আমি লিপ মেলাচ্ছি, সেই গানটাই

তাহলে গাইব। তবে প্লে-ব্যাক সিস্টেমে সে-সব ব্যবস্থা যেন আগে থেকে করা থাকে রঞ্জন।

ভাবখানা যেন আমিই এই ফাংশনের ব্যবস্থা করছি। সারাদিন শুটিং করে সেদিন ক্যাম্পে ফিরে দেখি মাধবীদেবী খুব হাসছেন। কি ব্যাপার ?

প্রোডাকশন ম্যানেজার শান্তিবাবু বললে—আর বলবেন না, কারা যেন দেয়ালে পোস্টার দিয়েছে মাধবীদেবী এখানকার কোন একটা ফাংশনে নাকি গান গাইছেন। সেটা পড়ে উনি তো হেসেই অস্থির।

মাধবীদেবী আমায় বললেন—পড়েছেন পোস্টার ? আমি তো অবাক। আমি গান গাইব কেন বুঝতে পারলাম না।

তরুণকুমার অর্থাৎ বুড়োদা একমাত্র মানুষ, গম্ভীর কণ্ঠে বলল—তা এ নিয়ে এত চিন্তা কি ? গেয়ে দিলেই হবে একখানা মালকোষ।

অনুপকুমার সহাস্যে জানতে চাইল—বুড়ো বুঝি আজকাল ক্ল্যাসিক্যাল গানের চর্চা করছো ?

—হ্যাঁ করছি। গানের আর্টিস্টদের অনেক বেশী খাতির। টাকাও ভাল মজন পাওয়া যায়। তাই ইদানিং ক্ল্যাসিকাল নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করছি। শুনে আবার জেলাস হয়ে পড়ো না যেন।

আগে অনুপকুমারের সঙ্গে আমার প্রায়ই বচসা হতো—কেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে আর্টিস্টদের সাক্ষাৎ কোন যোগাযোগ থাকবে না ?

শুনে অনুপকুমার শুধু মুচকি হাসত, বড় জবাব দিত না। পাবলিকের সঙ্গে যোগসূত্র না থাকলে শিল্পীরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে—এটাই ছিল আমার তখনকার ধ্যান-ধারণা।

এ-সম্পর্কে বেশী খোঁচাখুঁচি করলে অনুপকুমার হয়ত বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করেছে—তুমি পাবলিক বলতে কি বোঝো ?

আমি অনুপকুমারের প্রশ্নে হতবাক হয়েছি।—তার মানে ? পাবলিক ইজ পাবলিক। মানে দর্শক। যারা ট্যাকের নগদ পয়সা খরচ করে তোমাদের ছবি দেখে তারাই পাবলিক—

—অ। তা দর্শকদের সঙ্গে আমার তো সব সময়ই যোগাযোগ রয়েছে, কোন ঝগড়াঝাটি নেই—

—আঃ আমি সে কথা বলছি না। ঝগড়াঝাটি হতে যাবে কোন দুঃখে। আমি বলছি আর্টিস্টস রিলেশানাশিপ উইথ দি পাবলিক—

—আমিও তো সেই কথাই বলছি—রয়েছে। খুব ভালভাবে রয়েছে।

—কি করে থাকবে? যাতায়াত করো গাড়িতে করে। যেতে যদি ট্রামে-বাসে আমাদের মত বাদুড়ঝোলা হয়ে তাহলে পাঁচজনের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি হতো রিলেশানটা থাকত, লোকে একজন আর্টিস্টের কাছ থেকে কি চায় আর না চায় সহজেই বুঝতে পারতে—

অনুপকুমার হেসে আমায় বলেছে, তোমাকে একদিন বুঝিয়ে দেব রঞ্জন, চিন্তা করার কিছু নেই।

এখানে প্রতিদিন লোকেশানে যাতায়াতের ফাঁকে আমাদের পাবলিকের সঙ্গে যেটুকু রিলেশান হয় তাতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত। এক একদিন গাড়িতে অনুপকুমার থাকলে শ্লেষের হাসি হেসে জানতে চেয়েছে —কি রকম বুঝছো রঞ্জন? এই রকম রিলেশান হলে চলবে?

রিলেশানগুলো কি রকম ভাবুন; ধাঁই করে একখানা ডাবের খোলা এসে পড়ল চলন্ত গাড়িতে। আর মেক-আপম্যান বুনো হালদার তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী। এট্টু ব্রেক কষেছে গাড়ী, অমনি দু চাট্টে অশ্লীল মন্তব্য হঠাৎ কানে এসে বাজল। রাস্তায় প্রতিদিনই ব্যারিকেড। গাড়ি থামিয়ে নেমে গরুর গাড়ি ঠেলে রাস্তা পরিষ্কার করে তবে আমাদের যাতায়াত করতে হয়েছে। উহুঁ, এ-রকম রিলেশানের কথা আমি কখনও ভাবিনি।

—তাহলে কি ভেবেছো? কপালে চন্দনের ফোঁটা আর গলায় ফুলের মালা দিয়ে অভ্যর্থনা করে যে রিলেশান তৈরী হয়—সেটার কথা বলছ? অনুপদার সহাস্য প্রশ্ন।

—রঞ্জন, তোমার চাইতে বয়সে আমি বড়। আমি সেই ছোট্টবেলা থেকে পাবলিক স্টেজে অভিনয় করছি। আমি যত পাবলিক চিনি আর পাবলিক আমায় যত চেনে—বাংলাদেশে বোধ হয় তেমন আর কাউকে

চেনে না। আজ আমার না হয় গাড়ি হয়েছে, কিন্তু জীবনের অনেকগুলো বছর আমি ট্রামে-বাসে ঝুলে স্টেজ করেছি, সিনেমা করেছি। পাবলিক আর আমায় চিনিও না। আমি ওটা হাড়ে হাড়ে চিনি—

কথাটা ঠিক। কারণ আমরা সবাই জানি—অনুপকুমারের মত পুরোনো আর্টিস্ট আর কেউ নেই। কি ফিল্মে—কি স্টেজে!

একটা ঘটনা আমার স্মরণ আছে। পশ্চিমবাংলা বিহার সীমান্তে একটা পাহাড়ী জায়গায় আমরা শুটিং করছি। কি একটা যেন কারণে সেখানে হঠাৎ একদিন বিশ্রাম পাওয়া গেল। আমরা তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে বেরিয়ে পড়লাম একদল—সিউড়ী শহরের পথে। অনুপকুমার, দিলীপ রায়, মাধবী দেবী, পদ্মা দেবী, আর হারাধন বাঁড়ুজ্যে। সকাল তখন দশটা হবে। আমরা টাউনে ঢুকে সকলের অলক্ষ্যে কেনা-কাটা করছি। অনুপদা মাধবী দেবী আর পদ্মাদিকে নিয়ে গেছে—একটা ওষুধের দোকানে, ওঁরা কি যেন একটা দরকারী ওষুধ কিনবেন। এই ফাঁকে আমি আর দিলীপ গেলাম সিগারেট কিনতে। গাড়ীগুলো রয়ে গেল শহরের কিনারায় একটা পেট্রল পাম্পে।

যাবার আগে হারাধনদাকে বললাম—কি মশায়, আপনি কি করবেন?

হারাধনদা মাথার ওপর দু হাত তুলে একটা হতাশ ভঙ্গী করে বললেন—নাঃ, আমি বরং এখানে থাকি। তোমরা ঘুরে এসো।

আমি আর দিলীপ গল্প করতে করতে চলে এলাম বাজারের কাছে। পাইকারী দামে কার্টুন ধরে সিগারেট কিনতে হবে আমাদের। কোথায় পাওয়া যাবে?

দিলীপ বলল—যে কোনও পানের দোকানে জিগ্যেস করলেই ওরা বলে দেবে।

তাই বটে। গেলাম একটা পানের দোকানে। রাস্তা তখন জনপ্লাবিত। লোকে রীতিমত বাজার-হাট নিয়ে ব্যস্ত। দিলীপ পানের দোকানের আয়নায় নিজের উস্কো-খুস্কো অবস্থা দেখে বিপন্ন বোধ করে আমায় বললে—চিরুনি আছে তোর কাছে?

দিলাম। দিলীপ বেশ মোলায়েম করে নিজের চুল আঁচড়ে নিতে লাগল। সেই ফাঁকে আমি একটা পান খেয়ে দোকানদারের কাছে আমার জিজ্ঞাসাবাদ সেরে নিতে থাকলাম।

পানের দোকানের পাশে একদল ছেলে আড্ডা দিচ্ছিল। তারা প্রথমে আমাদের দিকে খেয়াল করেনি। আর আমাকে করার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু দিলীপ বেশ পপুলার ফিল্ম আর্টিস্ট। আমার ভয় হচ্ছিল, ওকে হঠাৎ যদি চিনে ফেলে তো কপালে আজ আমাদের দুঃখ্যু আছে।

এমন সময় দুটি ছেলে সাইকেল চালিয়ে এসে পানের দোকানের সামনে নামল। তাদেরই একজন আবার পকেট থেকে চিরুনি বের করে আয়নার দিকে এগিয়ে এলো, চুল ফিরিয়ে নিতে। দিলীপ ওদিকে তখনও আঁচড়ে যাচ্ছে।

ছেলেটি চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে দিলীপকে এক নজর দেখে নিয়ে তার সঙ্গীকে উদ্দেশ্য করে খাটোগলায় বললে—শ্ল্যাকে দেখতে মাইরি একদম দিলীপ রায়ের মত—

সঙ্গী ছেলেটি চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে দিলীপকে এক নজর দেখে নিল। তারপর একগাল হেসে বলল—ঠিক বলেছিস মাইরি—একেবারে দিলীপ রায়। আশ্চর্য মিল আছে কিন্তু—

শুনে দিলীপের তো অবস্থা শোচনীয়। আর আমি মনে মনে প্রমাদ গুনতে আরম্ভ করেছি।

এবার প্রথম ছেলেটি গলা খাঁকারি দিয়ে দিলীপকে উদ্দেশ্য করে বলল —দাদা যেন একেবারে বসানো দিলীপ—

দিলীপ আর কি বলবে, শুধু হেঁ হেঁ করে দেঁতো হাসি হেসে কোন গতিকে তার সরে পড়বার ধান্দা তখন।

এই সময় পাশের সেই দঙ্গলটি এসে পড়ল। তারাও অবাক।

—আরে এ-যে মাইরি দিলীপ রায়—

দিলীপ খেঁকিয়ে উঠে বলল—কোন শালা বলছে আমি দিলীপ রায়? আমি দিলীপ না—আমি ইয়ে—

আর না বললে কি ওরা শোনে? পেছনে আঁঠার মত সেঁটে গেল ওরা। আমরা ততক্ষণে দ্রুত পা চালাতে আরম্ভ করেছি পেট্রোল পাম্পের দিকে। ছেলেগুলো হো-হো হি-হি করতে করতে আমাদের পেছনে পেছনে চলেছে। হঠাৎ বাজারের দিকে হৈ-চৈ শোনা গেল। দেখি অনুপদা ফুলফোর্সে পা চালিয়ে আসছে, পেছনে এক দঙ্গল মানুষ। অনুপদা যেন এই মাত্তর পাঁচন গিলেছে—তার মুখভঙ্গীটা খানিকটা সেইরকম।

এদিকে দিলীপকে ওরা কষে ল্যাংগুয়েজ দিচ্ছে। আমাকে যা-তা বলছে! আমরা যত বলি—এবার ক্ষ্যামা দাও দাদা—কিন্তু কে কার কথা শোনে!

অনুপদা কাছে এসে বললে—কেলেঙ্কারী, সেই তখন থেকে পিছনে লেগে রয়েছে। বলে পলাতকের গান শোনাতে হবে। যাচ্ছেতাই কাণ্ড।

পেট্রোল পাম্পে এসে হারাধন বাড়ুজ্যের দেখা পাওয়া গেল না। উঃ, তিনি আবার কোথায় গেলেন? অনুপদা একজন ড্রাইভারকে ডেকে বলে দিল—ওমুক ওষুধের দোকানের মধ্যে মাধবী আর পদ্মাদি গা ঢাকা দিয়ে আছে। কায়দা করে গাড়ী নিয়ে গিয়ে এখন তাদের উদ্ধার করে আনো গে যাও—

আমাদের স্টুডিও লাইনের ড্রাইভার, নাম বুড়ো, বললে—তাহলে আর আমি এদিকে আসব না। ওঁদের নিয়ে সোজা লোকেশানে চলে যাব—

বলে বুড়ো ফুলস্পীডে গাড়ি চালিয়ে চলে গেল। কয়েকজন পিছনে দৌড়ে গেল, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে তারা ফিরে এল।

আমরা যাব এই গাড়িটায়, কিন্তু হারাধনদা না এলে কি করে যাই! তিনি আবার কোথায়—এইসব বলতে না বলতে দেখি উল্টো দিকের রাস্তা ধরে হারাধনদা অলিম্পিক স্টাইলে দৌড়ে দৌড়ে আসছে। তাঁর পেছনেও একদল মানুষ; তারাও ছুটছে।

গাড়ী স্টার্ট দেওয়া হল। হারাধনদা কাছে আসতেই তাকে ঝট করে

তুলে নিয়ে ল্যাজ গুটিয়ে দে-দৌড়। তারপর মাইল তিনেক অগ্রসর হতে বুড়োর গাড়ি পাওয়া গেল। নাঃ, মাধবী দেবী আর পদ্মাদি নিরাপদেই আছেন। হারাধনদা বলল, আমি ভাই প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ একদল ছোকরা আমার পেছনে এমন লাগল যে কি বলব। ছ্যাঃ—

অনুপদার প্রশ্ন—তোকে কেউ চিমটি কাটিনি তো হারাধন ?

হারাধনদা খুব রসিক প্রকৃতির মানুষ। বললেন, কেটেছে বৈকি। তবে তোদের যেমন হুলোরা কেটেছে—আমার ক্ষেত্রে কিন্তু পরীরা।

নদীতে রোজ শুটিং হচ্ছে। অবশ্য বেশ নির্বিঘ্নেই। লোকাল মস্তানরা কথা দিয়েছে—কেউ বেগড়বাই করলে অমনি তার লাশ নামিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু ওই সাংঘাতিক পোস্টারটা ? ওটার কি হবে ?

শ্যামল মিত্তির সেদিন একজনকে ডেকে বলে দিলেন—বাপু, ফাংশন করতে পারব না। এমনি গান শুনতে চেয়েছো, যাবার আগে একদিন তা বরং শুনিয়ে দিতে পারি। আর তাছাড়া এখনও এত কাজ আমাদের হাতে রয়েছে যে হয়ত এই লোকেশানেই আমাদের আরও একবার আসতে হবে। তাই এবার যদি নাও শোনাতে পারি, পরের বার এসে নিশ্চয়ই শুনিয়ে দেব—

ব্যস, অমনি মুখ ব্যাজার ওদের।

তাই দেখে শশব্যস্তে অনুপকুমার বললে—ঠিক আছে ঠিক আছে, এবারই শুনবে—

কিন্তু বিধি বাম।

পরদিন থেকে শুরু হল মেঘলা আকাশ।

ফলে শুটিং-এর দফা গয়া। মাঝে মাঝে যদি বা রোদ্দুর বেরোয়, তার স্থায়িত্ব খুব অল্প সময়ের। আমাদের সাজগোজের পালা মিটতে না মিটতেই রোদ পালিয়ে যায়। ফলে আবার হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হয়।

এইভাবে পর পর তিন দিন কাটল।

তৃতীয় দিন রাত্রে আমরা কনফারেন্সে বসলাম—নাঃ, এভাবে লোকেশানে বসে থাকার কোন অর্থ হয় না। টাকার শ্রাদ্ধ। তার চেয়ে আপাততঃ কলকাতায় ফিরে যাওয়া হোক। এই লোকেশানে আর একবার তো আসবারই কথা। তখন এসে বরং সব কাজটা তুলে নেবার চেষ্টা করলেই হবে।

শ্যামল মিত্তির 'তোমরা যা ভাল বোঝো করো' বলে গাড়ি হাঁকিয়ে কলকাতায় চলে গেলেন। প্রোডাকশন ম্যানেজারকে বলে গেলেন, কালই লোকেশান প্যাক-আপ, দেনা-পাওনা মিটিয়ে সবাইকে নিয়ে চলে এসো।

তখন স্থির হলো, সকালে ব্রেকফাস্ট করে কলকাতায় ফেরা হবে। প্রোডাকশন ম্যানেজার টাকা নিয়ে বাজারে গেলেন, এ-কদিনের দেনা-পাওনা মেটাতে। আর আমরা বসলাম আড্ডায়।

পরদিন সকালেই আমাদের সকলের কলকাতার পথে পাড়ি দেবার কথা, কিন্তু এসব ক্ষেত্রে যা-হয় অর্থাৎ গড়িমসি করতে করতে বেলা দশটা এমনিতেই বেজে গেল। দিনটা আবার বেস্পতিবার। অনুপকুমারের স্টেজ-এর দিন। উনি তখন স্টারের আর্টিস্ট। বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, এই ছবির শুটিং করতে করতে উনি সপ্তাহের তিনটি দিন নিয়মিত স্টেজ-শো চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বেস্পতিবার সন্ধ্যায় একটা শো, শনি আর রবিবার দুটো করে শো। কিছু মুস্কিল নয়, বেলা বারোটা নাগাদ লোকেশান থেকে বেরিয়ে সোজা কলকাতায় গিয়ে স্টেজ-শো ধরেছেন, তারপর রাত্রে আবার লোকেশানে ফিরে এসেছেন গাড়িতে। আমাদের শুটিং সিডিউলও ঠিক সেইভাবে করা হয়েছিল যাতে ছবির কোন আর্টিস্ট যদি রেগুলার স্টেজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তাঁর কোন অসুবিধা না হয়। এখানকার সব ছবিতে এই ব্যবস্থা মেনে নেওয়া হয়েছে। অবশ্য কলকাতার কাছাকাছি লোকেশান হলে শিল্পীরা এইভাবে স্টেজ-শো করে থাকেন। এখন লোকেশান যদি দিল্লীতে বা কলকাতা থেকে বহু

দূরে হয়, শিল্পীকে সেক্ষেত্রে স্টেজ থেকে শুটিং-এর ক-দিন ছুটি নিতে হয়। বড় দরের আর্টিস্ট হলে তাঁর স্ট্যাণ্ড-বাই যিনি থাকেন, তাঁকেই সে-কদিন চালিয়ে নিতে হয়।

দশটা বেজে গেছে দেখে প্রোডাকশন ম্যানেজার শান্তিবাবু বলল—তাহলে চাট্টি খেয়েই না হয় কলকাতায় ফেরা যাক।

প্রস্তাবটা তৎক্ষণাৎ সকলের সমর্থন লাভ করল। বাস্তবিক, এখন যাত্রা শুরু করলে দেড়টা দুটোর আগে কেউ বাড়ি পৌঁছাতে পারবে না। আর তখন কেউ ভাত বেড়ে বসে থাকবে—এমন আশা করা অন্যায়। অতএব চাট্টি ঝোল-ভাত খেয়ে বেরুনোই বুদ্ধিমানের কাজ।

শান্তিবাবু বলল, খুব ভাল পার্শে মাছ এনেছি, নদী থেকে সদ্য সদ্য ধরা—

ক্যামেরাম্যান দিলীপরঞ্জন বরাবরই পেটুক। শুনে সুটকেশ গোছানো স্থগিত রেখে বলল—এত করে বলছ যখন···

সঙ্গে সঙ্গে এক রাউণ্ড চা এসে গেল। অনুপকুমার শান্তিবাবুকে ডেকে বললেন—শান্তি, আমি কিন্তু আর আধঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে পড়ব, সেই মত ব্যবস্থা কর। আর আমাকে কোন্ গাড়িটা দিচ্ছ?

—গোপালের গাড়িটা। ফুল ট্যাঙ্ক পেট্রোল ভরে দিয়েছি দাদা, আপনার কোন চিন্তা নেই। ঠিক সময়ে আপনাকে স্টারের সামনে নামিয়ে দেবে।

—ঠিক আছে।

আমি বললাম, যাব তোমার গাড়িতে?

অনুপকুমার বললেন, চল। তাহলে তুমি রেডি হয়ে নাও—

—কিন্তু তোমার শো তো সেই বেলা পাঁচটা সাড়ে-পাঁচটায়। এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে কি করবে?

অনুপকুমার হেসে বললেন, বায়োস্কোপ কোম্পানীর ব্যাপার। আধ-ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট বলেছি, এখন খেয়ে-দেয়ে বেরুতে বেরুতে আসলে

সেই একটা দেড়টাই হবে বৎস—

ইতিমধ্যে লক্ষ্য করলাম আমাদের ক্যাম্পের সামনে একটু একটু করে ভীড় জমছে। এমন কিছু নয়। হয়ত খবর পেয়েছে আমরা চলে যাব তাই চোখের দেখা দেখতে এসেছে। প্রত্যেক লোকেশানেই এই একই ব্যাপার ঘটে। মাত্র কয়েকদিনের আলাপ পরিচয়ে এক ধরনের হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। যাবার সময় হয় মুস্কিল। সবাই ভীড় করে আসে, আরও কয়েকটা দিন থেকে যেতে অনুরোধ করে, কিন্তু সে-সব আবেগ ঝেড়ে ফেলেই বায়োস্কোপের লোকদের চলে আসতে হয়। কষ্ট হয়, কিন্তু কোন উপায় থাকে না।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। বোম্বের এখনকার একজন প্রথম সারির অভিনেত্রী ফিল্মে এসেছিলেন ঠিক এই একইভাবে।

রাণাঘাটের কাছে একটা জায়গায় কোন একটা ছবির লোকেশান শুটিং হচ্ছে। ছবির নায়ক এবং নায়িকা—দুজনেই খুব প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। ওঁরা ক্যাম্পেই থাকেন। ওঁদের সঙ্গে আশপাশের সকলের খুব হৃদ্য সম্পর্ক হয়েছে। পাড়ার মেয়েরা বিকেলবেলায় নায়িকাকে ঘিরে বসেন। প্রতিদিনই নানা গল্প-স্বল্প হয়। এখন একটা বাচ্চা মেয়ে, ভারি চমৎকার তাকে দেখতে, সে হঠাৎ খুব ন্যাওটা হয়ে পড়ল ওই নায়িকার। সব সময় পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করে। যেখানে শুটিং হয়, মেয়েটি নায়িকার আঁচল ধরে সেখানেই গিয়ে উপস্থিত হয়। দুপুরবেলায় আর তাকে বাড়িও যেতে হয় না, নায়িকা নিজের লাঞ্চ থেকে তাকে খাইয়ে দেন, যেন নিজেরই ছোট্ট একটি বোন। এদিকে ইউনিটের সবাই সেই মেয়েটিকে বেশ ভালবেসে ফেলেছে। পরিচালক নিজেও খুব আদর করছেন মেয়েটিকে। ফলে মেয়েটিও খুব খুশী। রাতের বেলায় ঘুমোবার সময়টুকু বাদ দিয়ে সে সারাক্ষণই এই বায়োস্কোপের দলের সঙ্গে ঘুরছে ফিরছে। মেয়েটির বাড়ির সবাই খুব খুশী। কারণ মেয়েকে উপলক্ষ্য করে শিল্পীদের সঙ্গে মেলামেশা করার একটা সুযোগ পাওয়া গেছে। ওর মা-দিদিরা আসে, নায়িকার সঙ্গে বসে গল্প করে। হঠাৎ সেই ছোট্ট

মেয়েটি একদিন আবদার ধরে বসল—আমি দিদির সঙ্গে কলকাতায় যাব—

দিদি অর্থে সেই নায়িকা।

মা অবাক। —সেকি রে, তোকে কেন নিয়ে যাবে?

মেয়েটি বলে—হ্যাঁ আমায় বলেছে দিদি—তুই যদি যেতে চাস তো আমার সঙ্গে যেতে পাবিস। আমি দিদির সঙ্গে কলকাতায় চলে যাব।

কথাটা উনি বাস্তবিকই বলেছিলেন। অমন ফুটফুটে সুন্দরী মেয়ে, বড় সখ হয়েছিল, ওর বাড়ির লোকেরা যদি ছেড়ে দেয় তো ওকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে কাছে রেখে মানুষ করবেন।

—কিরে তুই যাবি আমার সঙ্গে?

শুনে মেয়ে তো তৎক্ষণাৎ এক পায়ে খাড়া। —হ্যাঁ যাব।

—মায়ের জন্য মন খারাপ করবে না তো?

মাত্র এক লহমারই যা বিরতি, তারপরই মেয়ে বলেছে—নাঃ।

শুটিং-এর পর মা এসেছেন ব্যাপারটা বোঝবার জন্যে—হ্যাঁ দিদি, খুকুকে আপনি নাকি সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছেন?

নায়িকা হেসে বলছেন—মানে এমনি বলেছিলাম, আবদার করছিল—

—সে তো আমায় এখন পাগল করে দিচ্ছে, সারাক্ষণ মুখে এক ওই বুলি, কলকাতায় যাব আর কলকাতায় যাব, তা নিয়েই যান ওকে—

নায়িকা সামান্য ইতস্তত করে বললেন—গিয়ে থাকতে পারবে? শেষে হয়ত কান্নাকাটিই জুড়ে বসবে—

মা হেসে বললেন—সেদিক দিয়ে মেয়ে আমার খুব শক্ত, সহজে ভেঙ্গে পড়ার পাত্রী নয়। আর সে রকম যদি কিছু করে তো পাঠিয়ে দেবেন কাউকে সঙ্গে দিয়ে—

—বেশ, তাহলে আমার আপত্তি নেই।

মেয়ে খুব খুশী, আহ্লাদে ডগমগ। সমবয়সীদের শুনিয়ে শুনিয়ে কি তার নাচ আর গান। বন্ধুদের মুখ হাঁড়ি।

তারপর নির্ধারিত দিনে ছবির লোকেশান শুটিং প্যাক-আপ হয়ে

গেল। স্থানীয় মানুষজনের কাছে বিদায় নিয়ে সবাই কলকাতায় ফিরে এলেন।

আর শেষ পর্যন্ত নায়িকার সঙ্গে কলকাতায় এল সেই মেয়েটিও। তখন বারো কি তের বছর তার বয়স। ফ্রকপরা সপ্রতিভ সুন্দরী মেয়ে। নায়িকা তাকে সে-বছরই কলকাতার একটি স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। কয়েক মাসের মধ্যেই মেয়ের পোষাক-আশাক আদব-কায়দা যেন সবই বদলে গেল। বোঝার আর কোন উপায়ই রইল না যে মাত্র কয়েক মাস আগে সে ছিল সুদূর মফঃস্বলে, এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের কিশোরী কন্যা!

নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে আমরা একটা ছবির শুটিং করছি। সেই নায়িকাই আমাদের ছবির হিরোইন, উনি স্টুডিওতে এলেন, সঙ্গে সেই মেয়েটিও। কলবল করছে সারাক্ষণ। তখনই ওর সম্পর্কে সব জানা গেল।

কালক্রমে মেয়েটি বড় হল। ফিল্মেরই একজনের সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে করল। ছবিতে নামল। বোম্বে গেল। এখন সে অবশ্য তার স্বামী বদলে ফেলেছে, সন্তান-এর জননী হয়েছে, হিন্দী চলচ্চিত্রের প্রথম সারির নায়িকা। দেখুন, কোথাকার জল কোথায় গড়াচ্ছে।

সেদিন আমাদের ক্যাম্পের সামনে ভীড় দেখে প্রথমে যা ভাববার তাই ভেবেছিলাম। তারপর স্নান সেরে আমি আর অনুপকুমার দোতলার বারান্দায় সবে খেতে বসেছি, হঠাৎ খানিকটা চীৎকার চেঁচামেচি শোনা গেল। রাস্তায় কারা যেন গণ্ডগোল করছে। আরে ধুত্তোর। দেখি ড্রাইভার গোপাল ছুটতে ছুটতে আসছে আমাদের দিকে।

—কি হয়েছে রে গোপাল?

গোপাল কাছে এসে ভ্যাঁক করে কেঁদে বলল—ওই শালারা আমায় পিটছে দাদা—

অনুপকুমার চট করে উঠে দাঁড়িয়ে—কেন, কি হয়েছে কি—

বলা শেষ হলো না, দড়াম করে আস্ত একখানা থান ইঁট এসে পড়ল আমাদের মাঝে। আমরা লাফিয়ে সরে গেলাম, বাপরে, লাগলে আজ আজ আর রক্ষে ছিল না। আর তারপরই শুরু হলো মুষলধারায় ইস্টক

বর্ষণ। বাইরের একদল লোক আমাদের ক্যাম্পের দিকে তাগ্ করে ছুঁড়ছে।

চারিদিক হৈ চৈ পড়ে গেল। আচমকা এই আক্রমণের জন্যে আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না।

গোপাল বলল—সবে আমি গাড়ি বের করেছি, হঠাৎ একদল বদমাস ছোঁড়া এসে আমার গাড়ি থামিয়ে, বুয়েচেন দাদা—আমায় হঠাৎ ধোলাই দিতে আরম্ভ করল। যত বলি এই মারছিস কেন, কোন জবাব নেই। সব গাড়ির টায়ারের পাম্প খুলে দিয়েছে, বলে কাউকে যেতে দেব না এখান থেকে—

শান্তিবাবু বগচটা টাইপের লোক। চেঁচিয়ে বলল—ইঃ, মগের মুল্লুক নাকি যে যেতে দেবে না, কে বলেছে ওদের ফাংশন করে দেবে?

• জানা গেল, যারা ফাংশন করবে বলে শহরে পোস্টার সেঁটেছিল, আজকের এই গণ্ডগোলের নায়ক আসলে তারা-ই। ফাংশন-এর নাম করে প্রচুর টাকা তুলে প্রথমেই চোট্ করে বসে আছে, হঠাৎ যেই শুনেছে যে বায়োস্কোপের লোকেরা চলে যাচ্ছে, ব্যস, ওদের মাথায় সাক্ষাৎ বজ্রাঘাত! টাকা তো সব ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গেছে, এখন সেই ফাংশন যদি না হয় তো দেনেওয়ালারা পিটিয়ে নির্ঘাৎ ছাল-চামড়া তুলবে। অতএব যে কোনও উপায়ে বায়োস্কোপের লোকদের আটকাতে হবে, সমস্ত দোষটা ওদের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজের নিজের চামড়া বাঁচাতে হবে। তাই সকালে ওরা প্ল্যান করে এসে এই হুজ্জোত লাগিয়ে দিয়েছে।

আমাদের ছেলেরা সঙ্গে সঙ্গে তৈরী। লাইটের মোটা মোটা লোহার স্ট্যাণ্ড হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, খবদ্দার, এদিকে এগোলে মেরে ঠাণ্ডা করে দেব।

ওরা সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে গেল খানিকটা। তারপর শুরু হলো বচসা। ওরা বলে—আমাদের এখানে ফাংশন করে দিয়ে যেতে হবে। আর আমরা বলি, কে তোমাদের ফাংশন করতে বলেছে? যে বলেছে তার কাছে যাও। ওরা বলে—এখান থেকে যেতে দেব না। আমরা বলি—

দেখি কেমন তোমরা আমাদের যাওয়া বন্ধ করো!

ক্যাম্পের সামনে বেজায় ভীড়।

অনুপকুমার এগিয়ে গেলেন, ভালভাবে বুঝিয়ে বললেন, দেখ ভাই, এটা তোমরা খুব অন্যায় করছ। তোমাদের জায়গায় এসেছি, কোথায় সহযোগিতা করবে, তা না উল্টে ইট ছুঁড়ছো! তা ভাই আমাদের অপরাধটা কোথায়?

তখন ওদের মুখপাত্র বললে—শ্যামলদা আমাদের এখানে ফাংশন করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন, সেটা না করলে আমরা কাউকে ছাড়ব না।

অনুপকুমার দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করলেন। —উঁহু, শ্যামল তোমাদের এখানে ফাংশন করে দেবে—একথা কখনো বলেনি। আমি নিজের কানে শুনেছি। সে আসলে ব'লছিল যদি নির্বিঘ্নে শুটিং করতে দাও তো একদিন গান শুনিয়ে দেব, তাও কোন ঘরোয়া আসরে—ফাংশন করবে তো বলেনি—

কিন্তু ওরা গোঁ ধরে রইল —আমাদের অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে, তার কি হবে?

—সে তোমরা যদি খরচ করে আমাদের ওপর গায়ের জোরে চাপিয়ে দাও, সেটা অন্যায় জুলুম করা হবে। কেউ তোমাদের খরচ করতে বলেনি। তোমরা পোস্টার দিয়েছ, টিকিট বিক্রী করেছ, এখন তোমরাই বোঝো—

এই এক-কথায় দু-কথায় বেধে গেল তুমুল কাণ্ড। একজন মস্তান অনুপকুমারকে ঠেলা দিয়েছিল, ব্যস, আর যায় কোথায়, আমাদের ছেলেরা তাকে টেনে নিয়ে এসে কিঞ্চিৎ দাওয়াই দিতে তবে সে ধাতস্থ হলো।

অনুপকুমার আবার সবাইকে ধমক-টমক দিয়ে শান্ত করলেন।

এদিকে যাবার আর কোন উপায় ওরা রাখেনি। গাড়ির টায়ার চুপষে গেছে। অনুপকুমারের পক্ষে আর থাকা সম্ভব নয়। হাতে যা সময় আছে, তাতে সময়মত কলকাতায় পৌঁছানোই দায়। ইতিমধ্যে একটা রফা হলো। ওরা বলল—পাঁচশো টাকা দিলে আমরা সামলে নিতে পারি।

শ্যামল মিত্রের ভাই সলিল ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। সে বিরক্ত হয়ে বলল—আচ্ছা তাই দেব। এখন আপনারা বিদায় হন।

ইতিমধ্যে শহরের একদল ছেলে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত। বুদ্ধিমান বিচক্ষণ প্রকৃতির শিক্ষিত ছেলে তারা। খবর পেয়ে তারা ছুটতে ছুটতে এসেছে। এসে আর কোন কথা নয়, ফাংশন পার্টিকে চাঁদা করে ধোলাই দিতে আরম্ভ করল।

মার খেয়ে ওরা পরিত্রাহি ছুটে পালাল। পাঁচশো টাকা আর জুলুম করে আদায় হলো না। পালাবার পর এই ছেলের দল অনুপকুমারকে বলল—দাদা কিছু মনে করবেন না। গুণ্ডা বদমাইশ তো আপনি যেখানে থাকেন সেখানেও আছে, সেই কথা ভেবে এবারের মত মার্জনা করে দিন।

তারপর ওরাই সব ব্যবস্থা করে দিল। গাড়িগুলো ঠেলেঠুলে নিয়ে গিয়ে টায়ারে বাতাস ভরে দিল। নিজেরা ধরাধরি করে আমাদের জিনিসপত্র গাড়িতে তুলতে সাহায্য করল। অনুপকুমারের দেরী হয়ে যাচ্ছে জেনে ওরা কলকাতাগামী একটা বাস দাঁড় করিয়ে বলল—দাদা, এতে আপনি যতটা পারেন এগিয়ে যান, পথে ট্যাকসি ধরে নেবেন—

অনুপকুমার বললেন—যাচ্ছি, কিন্তু মনে রেখ ভাই, এদের যেন কোন বিপদ না ঘটে। এদের নিরাপদে কলকাতার দিকে রওনা করে দিলে বুঝব আমাদের দেশের ছেলেরা এখনও পশু-শক্তির কাছে মাথা নীচু করেনি, এখনও তাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার নৈতিক মনোবল অটুট আছে—

স্থানীয় কলেজের ছেলে ওরা। অনুপকুমারের কথায় ওরা নীরবে শুধু ঘাড় নাড়ল। অনুপকুমার পাবলিক বাসে চলে গেল। আর—

আর আমরা ঘণ্টাখানেক পরে রওনা হলাম। ওরা আমাদের পাহারা দিয়ে মাইল পাঁচেক এগিয়ে দিল। তারপর নেমে গেল। যাবার সময় ওদের নেতৃস্থানীয় সেই ছেলেটি, কি-যেন তার নাম, আমাকে বলল—দাদা, তিক্ততা নিয়ে যাবেন না, আবার একবার আসুন, সত্যিকারের মানুষ যারা আছে এবার তাদের দেখতে পাবেন···আমরা কথা দিলাম।

অনুপদাকেও বলে দেবেন—

ফিল্মের ভাল-মন্দ অনেক ঘটনার সাক্ষী আমি, সব কথা হয়ত মনে থাকবে না—কিন্তু এই ঘটনা কোনদিনও বিস্মৃত হব না।

লঞ্চটা জলে থাকতে থাকতে আর একটা ব্যাপার বলে নেবার তাগিদ অনুভব করছি। সেদিন স্টুডিও থেকে ফিরছি, বাস থেকে দেখলাম টালীগঞ্জ ট্রাম ডিপোর সামনে একদল লোক একটা পকেটমারকে ধরে বেদম ঠ্যাঙ্গাচ্ছে। আর লোকটা পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার পটলের কথা মনে পড়ে গেল।

আমাদের এই পটল ছিল মৃণাল সেনের গুটিকতক ছবির প্রোডাকশন ম্যানেজার। ইন্দর সেন তখন মৃণাল সেনের সহকারী। ইন্দরই প্রথম বুঝতে পারে যে পটলের আর কাজ-কর্মে তেমন উৎসাহ নেই। সব সময়ই কেমন একটা আড়ো আড়ো ছাড়ো ছাড়ো ভাব। অথচ পটল সব সময়ই করিৎ-কর্মা মানুষ, যখন যা বলা হয় সুচারুভাবে তা তো করেই, বরং ক্ষেত্রবিশেষে এট্টু বেশী বেশীই করে ফেলে। পটলকুমার বরাবরই সৌখীন এবং মেজাজী মানুষ। পোশাকে-আশাকে টিপটাপ। প্রায়ই পমেটম মেখে স্টুডিওতে আসে। চোখে সুদৃশ্য লাইব্রেরী ফ্রেমের চশমা। সুন্দরী মেয়ে দেখলে পটল অল্পেই কাতর হয়ে পড়ে। আর এহেন পটলের সহসা এমন নিরাসক্তি দেখে বন্ধুবর চাঁদু ওরফে ইন্দর একদিন ওকে প্রশ্ন করল—হ্যাঁরে পটল, তোর কি হয়েছে বল তো?

—কই কিছু না—পটলের নিরাসক্ত উত্তর।

—উহুঁ, নিশ্চয় কিছু হয়েছে। খুলে বল। যদি প্রেমে পড়ে গিয়ে থাকিস, গোপন করিসনে, আমি তোকে তোলবার ব্যবস্থা করব। ডাক্তারের কাছে কিচ্ছুটি গোপন করতে নেই ভাই পটল—

পটল ঘাঁৎ ঘাঁৎ করে শেষে বলল—প্রেমে আমার ঘেন্না ধরে গেছে, ওটা নয়, আসলে—

—আসলে ?

—মানে দেখ চাঁদু, আমি অ্যাদ্দিন ফিল্ম লাইনে রয়েছি অথচ একটা ছবিতে পার্ট করারও সুযোগ পেলাম না। আমি তো এখানে শুধু প্রোডাকশন ম্যানেজারী করতে আসিনি, আমি আর্টিস্টও হতে চাই।

চাঁদু মুচকি হাসল।—অ, তাহলে এই ব্যাপার। তা সে কথা তো আগে বলবি। আমি এক্ষুনি মৃণালদাকে বলে সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। তুই ছবিতে পার্ট করবি এতো খুব সামান্য কথা—

তখন পটল অভিমান-ভরা কণ্ঠে বললে—না না ভাই, মৃণালদাকে আর বলতে হবে না। আমি বলে বলে হদ্দ হয়ে গেছি। শুনে মৃণালদা শুধু মুচকি মুচকি হাসে—

চাঁদু ওকে আশ্বস্ত করে বলল—সে তোকে চিন্তা করতে হবে না। আমি ঠিক রাজী করিয়ে নেব। এখন তুই বল পার্টের ব্যবস্থা করলে তোর মনের দুঃখু সব ঘুচে যাবে তো ?

—হ্যাঁঃ।

এর দিন কতক পরে চাঁদু পটলকে ডেকে বলল—পটল, তুই তো ক্যারেকটার অ্যাকটিং করতে ভালবাসিস ?

পটল অবাক। বলল—কে বলল রে ?

—ধর আমিই বলছি।

—ঠিক ধরেছিস মাইরি—পটল গদগদ কণ্ঠে বলল—ঠিক ছবিদার মত। আমি রোজ রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ছবিদার মত পার্ট করি, তুই ঠিক ধরেছিস কিন্তু। তা হ্যাঁ, কি পার্ট দিবি আমাকে ?

—ধর একটা পকেটমারের চরিত্র ?

শুনে পটলের মুখের চেহারা ফিউজ হয়ে যাওয়া ডুমের মত দাঁড়াল। —পকেটমার ? ফার্স্ট অ্যাপিয়ারেন্সেই পকেটমার হওয়াটা কি ভাল দেখাবে চাঁদু ? মানে বাড়ির লোকজন দেখবে তো, তাই বলছিলাম আর কি।

চাঁদু ওকে প্রবল উৎসাহ দিল—ধুস, তুই মিথ্যেই চিন্তা করছিস,

মৃণালদার ছবিতে একটা পকেটমারের চরিত্রেও কিছু না কিছু করবা
থাকে। আমি অনেক কষ্টে রাজী করিয়েছি, তুই আর 'না' করিসনে—

অগত্যা, নেহাৎ চাঁদুকেই যেন বাঁচিয়ে দিচ্ছে—এমন একটা ভঙ্গী ক
পটল বলল—ঠিক আছে, তুই যখন অত সাধাসাধি করছিস তখন না হ
করেই দেব পার্টটা। ইয়ে, ডায়লাগ-ফায়লাগ আছে তো?

—আলবৎ, তুই করবি অথচ ডায়লাগ থাকবে না, এ কখনও হতে
পারে। মৃণালদা বলেছে তোর মুখে চমৎকার চমৎকার সব ডায়লাগ
দেবে। আফটার অল পটলকুমার বলে এটা কথা।

পটল তৎক্ষণাৎ এক প্যাকেট গোল্ডফ্লেক এনে চাঁদুকে দিয়ে বলল—
আপাততঃ এটা রেখে দে, তোকে আমি একটিন ফাইভ ফিপ্‌টি
ফাইভ প্রেজেন্ট করব বলে মনস্থ করেছি। ইয়ে, মৃণালদাকে এট্
গুছিয়ে—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তোকে কিচ্ছু চিন্তা করতে হবে না, ফার্স্ট ক্লাশ পার্ট, ওটা
করলে স্বয়ং ছবি বিশ্বাসও তোকে খাতির করে কথা বলবে—

পটল বলল—চাঁদু তোকে প্রমিজ করছি, একদিন চ্যাঙওয়াতে
ভরপেট্টা চাইনীজ খাওয়াবো—

এলগিন রোডের মুখে একটা বিরাট বাড়ির ছাদে ক্যামেরা তোলা
হয়েছে, ক্যামেরার মুখ ট্রাম স্টপেজের দিকে। মৃণাল সেন চাঁদুকে বলে
দিয়েছেন, হাজরা থেকে গুনে গুনে চারখানা ট্রাম ছেড়ে ফিফথ ট্রামে তুমি
পটলকে নিয়ে উঠবে। ভেতরে যাবে না, পাদানিতে দাঁড়াবে। তারপর
এই এলগিন স্টপেজে ট্রাম যেই থামবে, তুমি যেন হঠাৎ পাকড়াও করেছ
এমন একটা ভঙ্গী করে 'পকেটমার পকেটমার' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে
পটলের কলার ধরে নামাবে। ব্যস, শটটা আমরা ওখানেই কেটে দেব।
অন্যান্য শটগুলো পরে নেওয়া হবে, অন্য লোকেশানে—

চাঁদু পটলকে নিয়ে সোজা হাজরায় চলে গেছে। গুনে গুনে ট্রাম
ছাড়ছে। এমন সময় উদ্বিগ্ন পটল চাঁদুকে জিগ্যেস করল—হ্যাঁরে চাঁদু

ক্যামেরা চড়েছে তো বাড়ির ছাদে, ওখান থেকে শট নিলে আমাদের চেনা যাবে তো ?

চাঁদু আশ্বস্ত করল—জুম ক্যামেরা, ইয়াব্বড় বিগ ক্লোজে তোর শট নেওয়া হবে। খবদ্দার ক্যামেরার দিকে তাকাবি না, তুই শুধু পকেটমারের মত অ্যাকশান দিয়ে যাবি, নইলে কিন্তু সব বরবাদ হয়ে যাবে—

—আরে সে তোকে ভাবতে হবে না—পটল তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বলল—সে আমি যা অ্যাকশান দেব—আসল পকেটমাররাও পর্যন্ত চমকে যাবে। ওসব আমার ভাল জানা আছে। তুই কিন্তু বেশ কষে আমার কলার চেপে ধরবি, তারপর দেখনা আমি কি লঙ্কাকাণ্ড আজ করি—

তখন অফিস টাইম। ট্রাম বাসে মানুষ বাদুড়ঝোলা হয়ে যাচ্ছে ডালহৌসির দিকে। পঞ্চম ট্রামে ওরা দুজনে কোন গতিকে ঝুলে পড়ল। উঠেই পটল একজনের পা মাড়িয়ে দিলো। সে ভদ্রলোক তো খ্যাঁক করে উঠলেন। তার সঙ্গে পটলের খানিকটা বচসা হলো। চাঁদু ইঙ্গিতে থামাল। আসলে পটল অ্যাকশান দেবার জন্যে খানিকটা জায়গা খুঁজছিল। তাছাড়া উল্টোদিক হয়ে পড়ায় তার আশঙ্কা হচ্ছিল যে ক্যামেরায় ওর মুখ ভালভাবে উঠবে না। যাই হোক, বেশ ঠেলেঠুলে পটল শেষ পর্যন্ত কিছু জায়গা দখল করে চাঁদুকে ডাকল—চাঁদু, এদিকে সরে আয়, নইলে তুই ব্যাক-টু-ক্যামেরা হয়ে যাবি—। আব ইয়ে, বেশ ভালভাবে নামাবি—

চাঁদু ইঙ্গিতে ওকে যত থামতে বলে—ও ততই বেড়ে যায়। চাঁদুর আশঙ্কা, এই বুঝি সব মাঠে মারা যায়।

এরপর এল সেই এলগিন স্টপেজ।

ক্যামেরা গোপন, কেউ বুঝতেই পারছে না যে ছবির শুটিং হচ্ছে। ট্রাম যাহাতক দাঁড়িয়েছে, চাঁদু আর তিলার্ধ অপেক্ষা না করে হঠাৎ—ব্যাটা পকেটমার, চল'—বলেই পটলের জামার কলার ধরে এক হ্যাঁচকা টানে নামিয়ে ফেলল ফুটপাতে।

তারপর একটা যা মুহূর্তেরই ব্যাপার, দেখা গেল নিমেষে ট্রাম খালি

করে লোক নেমে এসে পটলকে দমাদ্দম পিটতে আরম্ভ করেছে। বিশেষ করে সেই লোকটা, পটল যার পা মাড়িয়ে দিয়েছিল। 'মার শালাকে, মেরে পাট-পাট করে ফেল' রবে চতুর্দিক মুখর। পটল এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে ভ্যাবাচাকা খেয়ে অস্থির। দু-হাতে আত্মরক্ষা করতে করতে ও যত বলে—'আরে মারছেন কেন ? আমি আসল পকেটমার নই'—লোকে তত ক্ষিপ্ত হয়, বেদম ঠ্যাঙ্গায় এবং বলে—শালা তুমি নকল পকেটমার, এয়ার্কি মারবার জায়গা পাওনি ? মার শালাকে।

চাঁদু প্রথমে ওকে বাঁচাবার জন্যে রীতিমত চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ওই ফিউরিয়াস মুবের সামনে আর একা কতক্ষণ দাঁড়াবে ? সে রণেভঙ্গ দিয়ে ছুটল মৃণালদাকে খবরটা দিতে !

মৃণাল সেন তখন ছাতের ওপর ক্যামেরা রেখে চিত্রগ্রহণ করছিলেন, তিনি এসব ঘটনার বিন্দু-বিসর্গ টের পান নি। এসব তাঁর চোখের আড়ালেই ঘটছিল। চাঁদু হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে তাঁকে 'পটল ফিনিশ' বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নেমে এলেন নীচেয়। কিন্তু ততক্ষণে ড্যামেজ যা হবার বেশ ভাল রকমই হয়ে গেছে।

ট্রাম বহুক্ষণ আগে চলে গেছে, ক্রুদ্ধ জনতা পটলের শরীরের প্রতি সেন্টিমিটারে যে যার মনের ঝাল মিটিয়ে হাতের সুখ করে গেছে, পটলের চশমা ভেঙ্গেছে, নাকের ডগা বেঁকে গেছে, শার্ট ছিঁড়েছে, প্যান্ট ছিঁড়েছে, চটি জুতোর এক পাটির কোন হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না, একদল কৌতূহলী নিরীহ দর্শক তখনও পটলকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছে—গুরু, ব্যাগটা তাহলে কোথায় সরালে ? কারও হাতে 'পাস' করে দিয়েছ তো ? দেখো সে ব্যাটা আবার তোমায় বিট্রে করে কিনা !

মৃণাল সেনকে দেখেই সম্ভবতঃ পটলের সংযমের যেন বাঁধ ভাঙ্গলো। সটান ভ্যাঁক করে কেঁদে উঠে বলল—শালারা আমায় বিনা নোটিশে পিটে গেছে দাদা। আর চাঁদু আমায় ওদের হাতে গুঁজে দিয়ে কেটে গেছে দাদা, এ-পার্ট আমি আর করব না। আপনি আর কাউকে দিয়ে দিন···

এরপর বহুবার পটলের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে স্টুডিওতে। এই

প্রসঙ্গে কথা উঠলেই পটল গম্ভীর কণ্ঠে বলেছে—ওটা থাক, তারচেয়ে যেটা চাইছ এই নাও—বলে একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়েছে বেশ ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে।

এবার আইনতঃ কিন্তু আমার লঞ্চে ফিরে যাবার কথা, কারণ টাইম অ্যাণ্ড স্পেস অনুযায়ী এতক্ষণ লঞ্চের ডাঙ্গায় ফিরে আসারই কথা, কিন্তু তার আগে দুম করে একখানা গৌরীপ্রসন্ন উপাখ্যান এসে পড়বে, বুঝতে পারিনি।

সেদিন, প্রতিদিন যেমন যাই, গেছি স্টুডিওতে, টালীগঞ্জের শনিবারের রেসকোর্সে তখনও ঘোড়ারা দুদ্দাড় দৌড়াচ্ছে, অধিকাংশ রেসুড়ের মুখ গভীর উত্তেজনায় থমথম করছে অথবা হাত-পা ছুঁড়ে কিছু-না-কিছু বলছে, তখন আমি সটান স্টুডিওর গোল-ঘরে। পাঁয়তাড়া করে গেছি যে রেসের এহেন অবস্থায় একটা বায়োস্কোপিক ধারাবিবরণ ছাড়ব, কিন্তু তার আগেই দেখি গীতিকার গৌরীপ্রসন্নকে সবাই ঘিরে ধরেছে, বেশী ধরেছে আমাদেরই ফিচেল সহকর্মী কালী বাঁড়ুজ্যে, গৌরীপ্রসন্ন'র মুখ ভীষণ অপ্রসন্ন, কালী তাঁকে বিব্রত মুখে কি-যেন বোঝাবার চেষ্টা করছে, গৌরীপ্রসন্ন কেবল ধুস্ ধুস্ করে যেন মাছি তাড়াচ্ছেন, ব্যাপারটাকে তমনি ভাবে এড়াবার চেষ্টা করছেন, তক্ষুনি আমি নগদ হাজির হয়ে গেলাম।

কালী আমায় দেখেই বলল—এই যে, তুমি যথাসময়ে এসে পড়েছ। গৌরীদা কিছুতেই বিশ্বাস করছে না—

কি বিশ্বাস, কি অবিশ্বাস, ঘটনার আগু পিছু কিছুই জানি না, বোকার মত হেসে কি বলব ভাবছি, হঠাৎ গৌরীপ্রসন্ন বললেন—কালীটা ইদানীং মহা ফাজিল হয়ে উঠেছে, ট্যাকসি থেকে নেমেছি কি নামিনি, হঠাৎ দৌড়ে এসে বলল—

কালী তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বত্রিশপাটি হেসে বলল—না না দাদা, সত্যি সত্যিই আপনাকে আবগারীর অফিসাররা খুঁজছে—

গৌরীপ্রসন্ন আবারো খচিতং।—খুঁজছে না ঢেঁড়শ, যত্তো সব বাজে কথা।

—আরেঃ, এই নিয়ে আবগারীর লোকেরা আজ দু-স্কেপ স্টুডিওতে এসেছে, ওদের নাকি কি বিশেষ একটা দরকার আছে আপনার সঙ্গে—

—গৌরীপ্রসন্ন অমনি কালীকে—ধুস্ ধুস্, এয়ার্কি আর মেরো না কালী, পারতো অন্য কাউকে লেগপুল করোগে যাও—

ঘটনা বিস্তারিত হতে, মানে কালীকে আমরা একটা বেঞ্চিতে বসিয়ে যখন প্রেসার দিলাম, তখন বলল—ইটস্ এ গ্রেট অনার দাদা। আপনি গান লিখেছেন 'বিপিনবাবুর কারণ-সুধা মিটায় জ্বালা মিটায় ক্ষুধা'—দাদা বিলকুল সুপ্যার হিট গান, বাংলা মালের বিক্রী ডবল হয়ে গেছে, যত বাজছে রেকর্ড তত বাড়ছে সেল, ফ্যান্টাস্টিক, তাই আবগারী ডিপার্টমেণ্ট ভয়ঙ্কর প্রীত হয় আপনাকে একখণ্ড অভিনন্দন জানাবার জন্যে স্রেফ হন্যে হয়ে উঠেছে। খুঁজছে—

ওঃ, শুনে গৌরীপ্রসন্নর কি অসাধারণ রি-অ্যাকশান। প্রায় সাতফুট লম্বা মানুষটা খানিকক্ষণ গুম মেরে দাঁড়িয়ে থেকে একসময় বললেন—হ্যাঁরে, তোরা কি আমায় কেউ এক গেলাস জল খাওয়াতে পারিস?

কালী অপরাধীর মত মুখ করে বললে—দাদা আমার ওপর কুপিত হলেন? আমি না। আসলে মনীশের সঙ্গেই আবগারীর মিটিং হয়েছে। ওরিজিন্যাল প্রস্তাবটা ব্যাটা মনীশই ওদের দিয়েছে মনে হচ্ছে।

গৌরীপ্রসন্ন গম্ভীর মুখে বললেন—আমি তোদের এই বেঞ্চিতে একটু বসব?

সবাই তৎক্ষণাৎ বেঞ্চির ধুলো ঝেড়ে দিয়ে মিনতি করে গৌরীপ্রসন্নকে বললে—আমাদের কৃতার্থ করুন। সিগ্রেট? চা? কফি?

গৌরীপ্রসন্ন কি-যেন একটা কথা অস্ফুট কণ্ঠে বললেন। কথাটা অবশ্য আমাদের কানে পৌছাল না। শুধু কালী অপ্রাতিভ ভঙ্গীতে বলল—না দাদা, কুপিত হবেন না।

জল এল।

গৌরীপ্রসন্ন বেঞ্চিতে বেশ জমিয়ে বসে বললেন—তোরা আর আমার পেছনে কতটুকু লেগেছিস, ওরে আমি যে এর চেয়েও মারাত্মক বিপদে

পড়ে হেঁচ্‌কি তুলছি। ওঃ, কি কুক্ষণে যে এই গান লিখেছিলাম…

গৌরীপ্রসন্ন ফোঁস করে একখানা ইয়ে ছাড়লেন অর্থাৎ দীর্ঘশ্বাস। তারপর আমরা আরও কিঞ্চিৎ তৈল দিতে উনি বলতে আরম্ভ করলেন—

…গৌরীপ্রসন্ন সেদিন সকালে বেশ প্রসন্ন মেজাজে তাঁর লেখার টেবিলে বসেছেন, ইচ্ছে, জম্পেশ করে একখানা বায়োস্কোপের গপ্পো লিখে ফেলবেন। বোম্বেতে ইদানীং ওঁর গপ্পের বেশ চাহিদা হয়েছে, পার্টিকুলারলি শক্তি অব দি সামন্তস্‌ তাঁর একখানা গপ্পো ক্রয় করে তুঙ্গে বেস্পতি করে ছেড়েছেন, হেনকালে দরজায় আঘাত, উহুঁ, নকিং সাউণ্ড নয়, কিলিং সাউণ্ড (অর্থাৎ দরজায় কিল্‌ মারা)। গৌরীপ্রসন্ন ভীষণ অপ্রসন্ন হলেন। চাকরকে পই পই করে বলা আছে—সকালবেলায় নো ভিজিটার, মেল তো নয়-ই, ফিমেল হলে মাত্র এক আধজন। তাও সে-ফিমেল বিউটিফুল হলে। তা সে ব্যাটা কি করছে? গ্যাঁজায় দম দিয়ে কোথাও আড্ডা দিচ্ছে নাকি?

আবার কিলিং সাউণ্ড।

এবার সদর দরজা যেন কেঁপে উঠল।

গৌরীপ্রসন্ন বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। গল্পের আইডিয়াটা সবে মাথায় এসেছে, এখনও পর্যন্ত যার একটা ছত্তর-ও লেখা হয়নি, এর মধ্যে উৎপাত।

গেলেন। গিয়ে বেশ গম্ভীর মুখে দরজা খুললেন।

দেখেন এক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে, পরণে ধুতি-পাঞ্জাবী, বেশ শক্ত-সমর্থ-চেহারা, কিন্তু বেশ ক্রুদ্ধ বে-পরোয়া ভাব-ভঙ্গী।

গৌরীপ্রসন্ন হঠাৎ কেমন যেন বিব্রত বোধ করলেন।—কাকে চাই?

—আপনাকে। ভদ্রলোক হেঁড়ে খরখরে গলায় ঘোষণা করলেন—আপনার নাম কি গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার?

—এ্যাঁ…ইয়ে, হ্যাঁ আমারই নাম। কেন বলুন তো?

—বলছি। সেকথা বলার জন্যেই তো আমি কদিন হন্যে হয়ে আপনার পশ্চাতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। মাত্তর গতকাল রাত্রে আপনার বাড়ির ঠিকানাটা

পেলাম, আর এই ভোরবেলায় ছুটে এলাম—

গৌরীপ্রসন্ন সবিনয়ে বললেন—আসুন আসুন, ভেতরে আসুন—

—না আর ভেত্রে যাবো না, বাইরে দাঁড়িয়েই যা বলার বলব।

—বলুন।

—আচ্ছা মোশাই, আপনি আমার নাম নিয়ে এই কেচ্ছা ছড়াচ্ছেন কেন? আমি আপনার কি ক্ষতি করেছি? অ্যাঁ?

গৌরীপ্রসন্ন হতভম্ব।—আপনার নামে আমি কেচ্ছা করছি? কি বলছেন আপনি, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না—

—পারবেন, ভাল করে বুঝিয়ে দিলে ক্রেমে ক্রেমে সবই বুঝতে পারবেন। আমি মোশাই আমার বয়স যখন আঠারো তখন থেকে বেঙ্গল খাই, আজ আমার চুয়ান্ন, ব্যায়লায় বেহালায় হেন লোক নেই যে আমায় চেনে না, কিন্তু কেউ বলতে পারবে না যে মাতলেমো করেছি বা উত্তম কুমারের মত কোমর বেঁকিয়ে এক চক্কর কখনও নেচেছি। এসেছি; বসেছি, এক পাঁট বেঙ্গল টেনেছি, ব্যস্ ভদ্দরলোকের মত হেঁটে বাড়ি গিয়ে ভরপেট্টা খেয়ে শয্যা নিয়েছি। কিন্তু এদাস্তে আপনি আমার তেইশটা বাজিয়ে দিয়েছেন। ঘরে নিস্তার নেই, বাইরে নিস্তার নেই, মালের দোকানে নিস্তার নেই, যেখানে যাই সেখানেই আমার ইয়েতে লোকে আঠার মত সেঁটে থাকে। বলি এটা কি ব্যাপার অ্যাঁ?

গৌরীপ্রসন্ন কি যে বলবেন স্থির করতে পারছিলেন না। শুধু বিনয়ের সঙ্গে একবার যাঁহাতক বলবার উদ্যোগ করেছেন, লোকটা প্রায় ধমকে উঠে বলল—হ্যাঁ মশাই আমার নামই বিপিন হোড়, আপনি বেছে-বুছে শেষ পর্যন্ত আমার নামটাই লাগিয়ে দিলেন কোন আক্কেলে মোশাই? পাড়ার ছোঁড়ারা এখন আমায় নিয়ে যা কাণ্ড করছে, বলার নয়—

বলতে বলতে বিপিন হোড় হঠাৎ ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেললেন।

—আরে করেন কি করেন কি—শশব্যস্তে গৌরীপ্রসন্ন তাকে সামলাতে সচেষ্ট হলেন, কিন্তু বিপিন হোড় থামবার পাত্র নয়, শ্লেষ্মা বিজড়িত কণ্ঠে বলল—আপনি যখন আমার জীবন মরুভূমি করেছেন তখন আমিও

আপনাকে ছাড়ছি না। আমি খুব শিগ্রি আপনার নামে একখানা গান বাঁধবো, বড় একজন কাউকে দিয়ে গাওয়াবো এবং মাইরি বলছি সেই রেকর্ড ফ্রী হরির লুট করব চতুর্দিকে। বলি আপনি ভেবেছেন কি?

গৌরীপ্রসন্ন বললেন—ভাই সেই ভয়ে আছি। বেহালার একজনকে খবর করতে বলেছিলাম, সে বলেছে বিপিন হোড় বাস্তবিকই কলকাতার গীতিকারদের দিয়ে নাকি গান লেখতে আরম্ভ করেছে, ব্যাটা ছাড়বে না। অথচ বিশ্বাস করো ভাই সেই বিপিন হোড়কে কত বুঝিয়ে বললাম, আরে মশাই আপনি আমায় খুব ভুল বুঝেছেন, আমি আপনার নামও কখনো শুনিনি, দেখার কথা তো অবান্তর। আসলে গানটা আমি ছবির নায়কের নাম বিপিন বলে বাধ্য হয়ে লিখেছি। আপনি শক্তি সামন্তকে গিয়ে বলুন। আমার কি দোষ। ওটা আপনার নাম নয়, আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না, তা সে বিপিন হোড় আমার কোন কথাই শুনল না, হড়বড় করে চলে গেল, এখন দেখ আমার কোন অ্যান্টি পার্টি দুম্ করে একটা গান রেকর্ড করে বসে......

নাঃ, এরপর লঞ্চে অনিবার্য।

তাহলে আরও কিছুক্ষণ লঞ্চটা জলেই থাকুক কারণ পিনাকী মুখার্জির এই ঘটনাটা পরে হয়ত বিস্মরণ হতে পারি, সুতরাং টাটকা-টাটকা বলে ফেলতে চাই।

পানুদা 'মহাশ্বেতা' ছবির আউটডোরে শুটিং করতে গেছে সেই বসির-হাটের দিকে না কোথায় যেন। সঙ্গে আর্টিস্ট আর টেকনিশিয়ান মিলিয়ে তিরিশ পঁয়ত্রিশজন মানুষ। আর সেই অনুপাতে লটবহর। সেখানে নাগাড়ে ক'দিন শুটিং চলবে, তাই কলকাতা থেকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে যাওয়া হয়েছে। এখন ছবির বিভিন্ন রিকুইজিশানের মধ্যে ছিল একটা কাক—

—কাক? ছবির প্রোডাকশন ম্যানেজারের বিস্মিত প্রশ্ন।

—হ্যাঁ, কাক। কা-কা কাগ। বুঝতে পেরেছেন? ওটা আমার চাই—পানুদার হুঙ্কার—একটা শটে লাগবে, মনে থাকে যেন—

—আর?

—আর ইয়ে লাগবে মানে একজন মানে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সাহেব, তাকেও লোকেশানে নিয়ে যাবেন—

বলে পান্নুদা বেরিয়ে গেলেন।

এখন এই পান্নুদার ক্যারক্টার না বুঝলে এই গল্প ঠিক বোঝা যাবে না। পান্নুদা এমনিতে মানুষ দারুণ ভাল, সকলের সঙ্গে ভীষণ মাইডিয়ার, কিন্তু কাজের সময় একেবারে ভিন্ন মানুষ। পান থেকে চুন খসলে আর রক্ষে নেই। ভীষণ মেথোডিক্যাল, ফাঁকি-জুকির কোন ব্যাপারই নেই ওঁর চরিত্রে। ফলে ওঁর সঙ্গে কাজ করা অনেকের ক্ষেত্রেই অসম্ভব, সে কিবা শিল্পী আর কিবা টেকনিশিয়ান। পান্নুদা যখন ছবির শুটিং করতে নামে তখন স্রেফ উন্মাদের মত কাজ করে যায়, অন্য কোনদিকে তখন তার আর নজর থাকে না। আর এই সময় কেউ যদি সামান্য একটু ভুলভ্রান্তি করে বসে তো তার আর সেদিন রক্ষা নেই। পান্নুদা এমন কষে তাকে দেয় যে নাহ্‌ সে আর বলা যাবে না। ধরুন না আমি, আমিই কতদিন যে পান্নুদার ধাতানি খেয়েছি তার আর লেখাজোকা নেই। প্রথম প্রথম আমার খুবই রাগ হতো কিন্তু পরে যখন দেখলাম মানুষটাই ওই রকম, অত হম্বিতম্বি করার পরমুহূর্তেই আবার গলে জল—তখন আর কি! পান্নুদা প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে আর যাকে উদ্দেশ করে সেটা হচ্ছে সে হয়ত মুখ ফিরিয়ে ফিকফিক করে হাসছে। অথচ হাসিটা যে সব সময় পান্নুদার নজর এড়িয়ে যায়—তা-নয়, সেক্ষেত্রে পান্নুদার সরব এবং হতাশ মন্তব্য—ছোঁড়াটা একেবারে নিলজ্জ, বেহায়া। এত অপমানেও দেখ ওর কিছু হচ্ছে না—

আর সহকারী প্রোডাকশন ম্যানেজার শৈলেন সেটা ভাল করেই জানত। তাই পান্নুদার অমন বিদ্‌ঘুটে রিকুইজিশান শুনে ওর মনে আতঙ্ক হল—এইরে এখন শালা কাগ্‌ কোথায় পাই? অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নিয়ে কোন চিন্তা নেই, ফিরিঙ্গী পাড়ায় গিয়ে একজনকে ধরে নিলেই চলবে, কিন্তু হোয়াট অ্যাবাউট কাগ্‌?

সব শুনে একজন শৈলেনকে আশ্বস্ত করল—তুই ওর জন্যে চিন্তা

করিসনে, ও ঠিক জোগাড় হয়ে যাবে—

—কি করে? আকাশের কাগ্ তুই ধরবি কি করে শুনি?

—আরে ধুস্? তুই পাণ্ডেকে ডেকে একটা কাগের অর্ডার দিয়ে দে, ও ঠিক জোগাড় করে দেবে। পাণ্ডের অসাধ্য কোন কাজ নেই।

অতএব সেই ভাল। শৈলেন পাণ্ডেকে খুঁজে পেতে বলল—পাণ্ডে, একটা কাগ্ সাপ্লাই দিতে পারবে?

—জ্যান্ত?

—হ্যাঁ, ধর দাঁড়-কাগ্, এই রকম একটা সাইজের—

—পেয়ে যাবেন তবে খর্চাটা এট্টু বেশী পড়বে। আকাশের কাগ্ তো, পট্ ছাপা আছে—পাণ্ডে নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল—টাকা পনের লাগবে।

—ভ্যাট্—শুনে শৈলেন ক্ষেপে অস্থির—গোটা পাঁচেক দেব, যদি পার তো কাল সকালে মালটা পৌঁছে দিয়ে যেও, আমরা বিকেলে আউটডোরে বেরিয়ে যাব। আর একটা সাহেব লাগবে—

পাণ্ডে এক মিনিট চুপ করে থেকে বলল—কাগের রেটটা আর এট্টু বিবেচনা করে দেবেন স্যার নইলে দুধে হাত পড়ে যাবে···। ঠিক আছে সকালে পৌঁছে দেব—

সবাই জানে পাণ্ডের কথার বড় নডচড হয় না।

পরদিন সকালে বাস্তবিক একটা দাঁড়-কাগ্ নিয়ে এসে হাজির। বলল—উঃ, শালা ঠুকরে ঠুকরে আমার তেইশটা বাজিয়ে দিয়েছে, বললে তো আপনারা বিশ্বাস করেন না। গোটা সাতেক টাকা ধরে দেবেন স্যার।

শৈলেন কাগ্টাকে দুপায়ে দড়ি বেঁধে চিৎ করে ফেলে রাখল এবং অস্ফুটে মন্তব্য করল—বাপরে, পানুদার যত্তোসব বিটকেল রিকুইজিশন। শোন পাণ্ডে, সাহেবকে নিয়ে তুমি কাল রাত্রে লোকেশানে পৌঁছে দিয়ে আসবে এবং সেদিনই বিকেলে ফেরৎ নিয়ে আসবে, পানুবাবুর হুকুম।

বলে শৈলেন তাকে লোকেশানের ঠিকানা ইত্যাদি বেশ ভালভাবে বুঝিয়ে দিল। পাণ্ডে দাঁত দেখিয়ে চলে গেল।

প্রথম দিনই লোকেশানে এক তুমুল কাণ্ড। এখন হয়েছে কি একটা দৃশ্য ছিল, রৌদ্রে বসে বসে মামা তেল মাখবে, মাখিয়ে দেবে ভাগ্নে। জহর রায় মামা আর ভাগ্নে হচ্ছে সুখেন দাস। রিকুইজিশান অনুযায়ী প্রোডাকশনের একজন এক বাটি সরষের তেল লোকেশানে এনে দিয়েছিল সেই কোন্ সাতসকালে, কেউ খেয়ালও করেনি, বারান্দার একপাশে চড়া রোদের মধ্যে বাটিটি পড়ে পড়ে গর্মাগর্ম হচ্ছিল। এখন সেই তেল মাখার দৃশ্য শ্যুট্ করবার জন্যে পানুদা যখন প্রস্তুত সূর্যদেব তখন মধ্য গগনে।

শটের কম্পোজিশান হল।

জহর রায় খালি গায়ে বসে, গুণধর ভাগ্নে এসে তাকে আহ্লাদের সঙ্গে তেল মাখিয়ে দিচ্ছে, শরীর মর্দন করে দিচ্ছে, আরামে মাতুল উঃ আঃ শব্দ করতে করতে কিছু কিছু ভাষণ দিচ্ছে।

শুটিং জোনের মধ্যে শিল্পীরা গিয়ে বসে যেতেই পানুদা হুঙ্কার দিল—তেল কই তেল?

তখন একজনের স্মরণ হলো—এইরে, তেলের বাটি যে বলে দেওয়া হয়েছিল, এনেছে তো?

শৈলেন তাকে আশ্বস্ত করে বলল—আনা হয়েছে বাপু আনা হয়েছে, ওই তো বারান্দায় পড়ে আছে। সুনীল এনে দে তো বাটি-টা।

সুনীল দৌড়ে গিয়ে বাটিটা এনে শটের মধ্যে বসিয়ে দিয়ে চলে এল, কেমন যেন কিন্তু কিন্তু মুখে। শৈলেনকে যে কিছু বলবার উদ্যোগ করেছিল এমন সময় পানুদা হেঁকে বলল—অ্যাই শৈলেন কাগ এনেছিস তো? এর পরই কিন্তু কাগের শট। মনে থাকে যেন।

শুনে শৈলেন দৌড়ল সেই কাগ্টা আনতে।

স্বচক্ষে কাগ্ দেখে পানুদা নিশ্চিন্ত—ভেরি গুড। দাঁড়া, আগে এই স্নানের শটটা নিই, তাপর তোরটা নেব।

শৈলেন ভাবল শটের এখনও তো বেশ দেরী আছে তাহলে একটা কাজ করা যাক, কাগটার পায়ে লম্বা একটা দড়ি বেঁধে এটাকে আপাততঃ ছেড়ে দেওয়া যাক, ব্যাটা এট্টু চরে বেড়াক—বলে মস্ত লম্বা এক কাতার

দড়ি পায়ে বেঁধে কাগটাকে উড়িয়ে দিল শৈলেন। আর তার একটা প্রান্ত ধরে রাখল হাতে। কাগটা ছাড়া পেয়ে হুস করে উড়ে বসল একটা উঁচু গাছের মগডালে। পালাবার উপায় নেই, পায়ে কষে দড়ি বাঁধা। শৈলেন টেনেটুনে দেখল—নাঃ ঠিক আছে।

ওদিকে শট হচ্ছে। মনিটারের সময় সুখেন তেল মাখাবার ফলস্ অ্যাকশান করল, জহর রায় তেড়ে ডায়লাগ দিলেন, ব্যস, মনিটার—ও,কে, এবার টেকিং, পানুদা বলল— তাহলে জহরদা শট-টা নিয়ে নিই—

—নাও ভাই তাড়াতাড়ি নাও। এই তেল মেখে শটের পর আবার পুকুরে নাইতে যেতে হবে। সুখেন, এট্টু ভাল করে মাখিয়ে দিস্ বাবা—

সুখেন আশ্বস্ত করল—ঠিক আছে জহরদা ও আমি ফাসকেলাশ করে মাখিয়ে দেব। তারপর চলুন দুজনে মিলে স্নান করতে যাব। এই শটটার জন্যে আমি আজ সকালে স্নানই করিনি—

• শুরু হল টেকিং। ক্যামেরা-সাউণ্ড চালু হতেই পানুদা হেঁকে বলল—অ্যাকশান—

দাঁত বের করে আহ্লাদিত ভাগ্নে এসে তেলের বাটি তুলে নিল হাতে, তুলেই সে চমকে উঠল, আরিপ্বাপ এ-যে আগুন হয়ে আছে বাটি, কিন্তু তখন আর উপায় নেই, ক্যামেরার পেছন থেকে পানুদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে—এখন শট কেটে দিলে একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড বেধে যাবে,. ধেত্তেরি, আবার কি ভেবে ভাগ্নে ডবল দাঁত বের করে এগিয়ে গেল। মামা পিঠ এগিয়ে দিয়ে বসে আছে—দেরে, তেলটা মাখিয়ে দে—তার ভাবখানা, ভাগ্নে আর কি, হাতের চেটোয় পোটেক তেল মানে চড়া রোদ্দুরের তাপে যেটা ইতিমধ্যেই টগবগে গরম হয়ে উঠেছে—ঢেলে নিয়ে চোখ বুঁজে মামার পিঠে বসিয়ে দিল সাপ্টে—

মাত্র এক লহমার বিরতি—তারপরই মাতুল তীব্র আর্তনাদ করে লাফিয়ে উঠে—পানুদা দেখল জহরদা 'মরে গেলাম মরে গেলাম' করতে করতে শটের বাইরে আসার উপক্রম করছে—পানুদা বোঁ করে ঘুরে জহরদাকে ঠেলে দিল শটের মধ্যে, ভাগ্নে ততক্ষণে বিকৃত মুখে আর এক

খামচা তেল তুলে নিয়েছে হাতে—মামাকে মর্দন করার অভিপ্রায়ে, জহর রায়ের প্রাণ যায় আর কি, একদিকে ডিরেকটর শুটিং জোন থেকে তাঁকে বেরুতে দিচ্ছে না অন্যদিকে ন্যাকা ভাগ্নে তাকে ওই তেল মাখাবার জন্যে হন্যে হয়ে আছে, এই রকম একটা পরিস্থিতিতে কোন গতিকে উনি শট্‌টা উৎরে দিলেন, বাপ!

শটের পর 'আনো বার্নাল, আনো এটা আনো সেটা' ধ্বনিতে বেশ কিছুক্ষণ মুখর হয়ে রইল লোকেশান। জহর রায় কাতর কণ্ঠে বললেন—পানু, পিঠে ফোস্কা ফেলে দিলে শেষ পর্যন্ত, তোমার ভাই জবাব নেই—পানুদা ভীষণ ক্ষিপ্ত, তেল গরম হবার জন্যে যারা দায়ী তাদের খুব একচোট নিল, তারপর আবার যে-কে-সেই।

নেক্সট শট্—কাগ্।

হল্লা শুনে শৈলেন স্লাইট নার্ভাস বোধ করছিল, এবার সে উৎসাহের সঙ্গে বলল—পানুদা, কাগ্ রেডি আছে, আপনি শট্ নিতে পারেন।

ক্যামেরা বসে গেল—কাগ্ শটের মধ্যে কিসব যেন করবে। ক্যামেরা-ম্যানকে পানুদা সব ভালভাবে বুঝিয়ে দিল—এক টেকেই ও-কে করা চাই কিন্তু, একটাই কাগ্, উড়ে বেরিয়ে গেলে আর দ্বিতীয়বার হবে না মশাই। ক্যামেরাম্যান বিজয় ঘোষ শান্তশিষ্ট মানুষ। বললেন, ঠিক আছে, তাই হবে পানুবাবু।

শৈলেন ঘন ঘন গাছের মগডাল দেখছে, হাতের দড়ি জাব্দা করে ধরা, কাগ্ বাবাজীর আজ পালাবার পথ নেই, এখন হুকুম করলে এক হ্যাঁচকা টানে কাগকে মাটিতে নামিয়ে এনে শটের মধ্যে ছেড়ে দিলেই শৈলেনের দায়িত্ব খালাস।

—শৈলেন, কাগ্ আছে তো?

—আছে পানুদা।

—বেশ। ধরে রাখ। বলা মাত্তর যোগান দিবি কিন্তু। কেমন?

—আচ্ছা পানুদা।

ওদিকে হয়েছে কি, ধূর্ত কাগ বাবাজী কখন যে তলে তলে ঠুকরে তার

পায়ের বাঁধন ছিন্ন করে ফেলেছে, শৈলেন তা বুঝতেই পারেনি। তার হাতে দড়ি ; সে মহানন্দে আছে যে কাগ যথাস্থানেই, চিন্তার কোন কারণ নেই। ওদিকে সে ব্যাটা তো পগার পার।

কিছুক্ষণ পর পানুদার হুঙ্কার।—শৈলেন ?

—দাদা।

—কাগ।

—আনছি। বলেই দড়িতে হ্যাঁচকা টান। শুধু দাড়টাই খসে এল। কাগ কোথায় ?

ব্যস, শৈলেনের রক্ত যেন স্রেফ হিমক্রিম। সত্যনাশ। খচরাটা পালিয়েছে। এখন শৈলেন কোথায় পলায়ন করে ? পানুদা তো আজ রক্ষে দেবে না। বলা যায় না, রাগের চোটে হাতফাত না চালিয়ে দেয়। এট্টু আগে সরষের তেল নিয়ে একটা লঙ্কাকাণ্ড হয়ে গেছে। এখন উপায় ? শৈলেনের মন বলল, যদি বাঁচতে চাস তো সটান গাছে উঠে গা-ঢাকা দে। নইলে তোকে প্যাঁদাবে। শৈলেন অতএব আর দেরী না করে ধাঁ করে গাছে উঠে ঘন ডালের আড়ালে ভ্যোম হয়ে বসে পড়ল।

—শৈলেন, অ্যাই শৈলেন, কাগটা নিয়ে আয়—

—কিরে, কানে শুনতে পাচ্ছিস না নাকি ? শৈলেন—

তক্ষুনি একজন দে'ড়ে গেল শৈলেনের খোঁজে। অদূরে একটা বড় আম্র বৃক্ষের তলায় সে ছিল, তাজ্জব কাণ্ড, গেল কোথায় ?

সেখান থেকেই সে চেঁচিয়ে বলল—ও পানুবাবু, শৈলেন যে হাওয়া।

—অ্যাঁ ? হাওয়া মানে ? কাগ কোথায় ?

শৈলেন মগডাল থেকে এবার আর্তনাদ করল—কাগ-ও হাওয়া।

তারপর সে এক কুরুক্ষেত্তর। পানুদা গাছের তলায় এসে—অ্যাই নেমে আয়, আজ তোর একদিন কি আমারই একদিন···একটা কাগ রাখতে দিলাম আর উনি অনুগ্রহ করে সেটিকে ছেড়ে দিলেন ? নাম, নেমে আয়, ওই—

শৈলেন সভয়ে আরও দু'ডাল ওপরে—পানুদা বিশ্বাস করুন, ব্যাটা

পায়ের দড়ি কেটে পালিয়ে গেছে, আমি দড়ি টেনে দেখি সে নেই, এবারের মত মার্জনা করে দিন দাদা, কথা দিচ্ছি আর কোনদিন আমার হাত থেকে কাগ পালাতে পারবে না। দাদা এখন আমাকে নামতে অনুমতি দিন। দাদা ভীষণ পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে এখানে, টিকতে পারা যাচ্ছে না পানুদা।

ঘোড়া?…

হ্যাঁ, মনে পড়ে যাচ্ছে 'রাজদ্রোহী' ছবির কথা। নীরেন (বেণু) লাহিড়ী ছিলেন সে ছবির পরিচালক। ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে 'রাজদ্রোহী'র শুটিং হচ্ছিল, তখন আমারও কি-যেন একটা ছবির কাজ চলছিল ওই স্টুডিওতে। একদিন স্টুডিওর চাতালে বসে আমরা আড্ডা মারছি, হঠাৎ দেখি বুবু গাঙ্গুলী নেংচে নেংচে আসছে। জয়ন্ত বলল, কি ব্যাপার, বুবু'র হলো কি?

একজন হেসে বলল—নিশ্চয় কোথাও হুজ্জুত করতে গিয়েছিল, ধরে ঠেঙ্গিয়ে দিয়েছে।

বুবু, উঃ একটা ক্যারেকটার, এমন ডাঁহা গুলবাজ মানুষ কদাচিৎ চোখে পড়ে। তবে বিশেষ ক্ষতিকারক নয়, ঝেড়ে দিল একখানা, লাগল তো ভাল আর না লাগল তো বয়েই গেল। ফিল্মে আসা অব্দি একজন নামজাদা অভিনেতার শ্যালক বলে পরিচয় দিয়ে আসছে। অথচ তার ফলে যে ও খুব সুযোগ-সুবিধা কখনও পেয়েছে—জানা নেই। বরং কিছু কিছু জায়গায় উল্টো ফলই হয়েছে। তবুও বুবু অমুকের শ্যালক—এই পরিচয় দিতে ভুল করে না।

জয়ন্ত বলল—কি বুবু পায়ে কি হলো?

যন্ত্রণায় মুখ বিকৃতি করে বুবু বলল—যা হবার তাই হয়েছে। আমরা রাঁচী আউট-ডোরে গিয়েছিলাম, সেখানে গিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে এই হয়েছে।

পরে সব জানা গেল। 'রাজদ্রোহী' ছবিতে কিছু অ্যাকশন ছিল—ঘোড়ার পিঠে চড়ে ছোটাছুটি দৌড়াদৌড়ি। বেণুদা কলকাতার ঘোড়া

ভাড়া করে এনে সেই সব দৃশ্য গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু কলকাতার ঘোড়ার সাধ্য কি ওই সব রোমহর্ষক দৃশ্যের শট দেয়? স্বভাবতই ট্রায়াল শো দেখে কেউ খুশী হননি। তখন স্থির হয়েছিল, পরবর্তী রাঁচী আউটডোরে মিলিটারী ঘোড়ার সাহায্যে ওই সব দৃশ্য গ্রহণ করা হবে। ঘোড়-সওয়ার-দের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং উত্তমকুমার, কমল মিত্র এবং অন্যান্যরা। বুবু-ও একজন ঘোড়সওয়ার।

বেণুদা একদিন জানতে চেয়েছিলেন—কিহে বুবু, ঘোড়ার ব্যাপারে তোমার এলার্জি নেই তো?

ব্যস, বুবুর সেকি লেকচার। বেণুদা, ঘোড়া দিয়েই তো আমার দিনের শুরু এবং শেষ। ঘোড়া চিনতে চিনতে আমার একখানা বাড়ি গেছে যাক। তবুও আমি চিনে যাব। আমাকে আবিষ্কার করতেই হবে যে কোন ঘোড়া বিট্রেয়ার আর কোন ঘোড়া আমার ফ্রেণ্ড। আমায় ঠাট্টা করতে পারেন কিন্তু মাই হর্স ইজ অলওয়েজ মাই হর্স—

বলতে বলতে সহসা বুবুর চোখ ছলছল করে উঠল। তারপর কিঞ্চিৎ আত্মসম্বরণ করে বলল—হঠাৎ ঘোড়ার কথা কেন দাদা?

বেণুদা স্বভাবসুলভ হেসে বললেন -বাবারে তুমি দেখছি ঘোড়ার ব্যাপারে খুব স্পর্শকাতর। যাই হোক, ঘোড়ায় চড়তে জান? জানলে একটা ভাল পার্ট তোমায় দিতে পারতাম।

পার্টের কথা শুনে বুবু এক লাফ।—বিলক্ষণ জানি, ওই ঘোড়া চড়তে গিয়েই তো ইয়ে হল আরকি, মানে ল্যাণ্ডস্লাইড। আগে নিজে চড়তাম, এখন অন্যকে চড়াই—এই যা ডিফারেন্স।

কমল মিত্তির সম্ভবতঃ অত ন্যাড়া করে জানতেন না যে তাঁকে রাঁচী আউটডোরে অত ঘন ঘন ঘোড়া মানে মিলিটারী ঘোড়ায় চড়তে হবে। লোকেশানে পৌঁছে তাঁর কেমন যেন সন্দেহ হলো। ইউনিটের সবাই কথায় কথায় ঘোড়ার কথা উল্লেখ করছে, কি ভাবে চালাবে তার পাঁয়তাড়া কষছে দেখে কমল মিত্তির স্লাইট দমে গেলেন। শুধু বুবু গাঙ্গুলীরই যা উৎসাহ। যেন কতদিন পরে একটা প্রকৃত সুযোগের

সম্মুখীন হয়েছে সে।

কমল মিত্তিরকে বলল—দাদা, একেবারে মিলিট্রি ঘোড়া, চড়বেন যখন তখন বুঝবেন, স্রেফ তুলো যেমন বাতাসে উড়ে যায়—তেমনি করে উড়িয়ে নিয়ে যাবে—

—তোরা চড়ছিস নাকি ?

—আলবৎ। সেইজন্যেই তো এখানে আসা। রাঁচীর মিলিট্রি ক্যান্টনমেন্ট থেকে ছ' ডজন ট্রেণ্ড হর্স আনা হচ্ছে। উত্তমকুমার, আপনি, আমি সর্বদাই চড়ব।

কমল মিত্তির বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বেণু লাহিড়ীর সুযোগ্য সহকারী মানু সেনকে ডেকে জিগ্যেস করলেন—কিহে মানু, বুবু যা বলছে সব সত্যি নাকি ? আমি কিন্তু একবার চড়ব, দ্বিতীয়বার নয়, হাজার অনুরোধ করলেও নয়—

মানু সেন বললেন—বুবুর কথা ছাড়ুন তো কমলদা…

কমল মিত্তির তখনকার মত থামলেন বটে কিন্তু মনে তাঁর ভয় ঢুকে গেল। কলকাতার ঘোড়াগুলো মোটামুটি নির্ভরযোগ্য। কিন্তু রাঁচীর মিলিটারী ঘোড়া ? সেগুলো কি রকম বিহেভ করবে কে জানে !

আচ্ছা দাঁড়ান দাঁড়ান, একটু যেন গুলিয়ে যাচ্ছে গল্পটা, বলছি সব পরে—তার আগে…

এখন গরম পড়তে আরম্ভ করেছে ফলে চারিদিকে ভজকট ব্যাপারও শুরু হয়েছে। গরমে ঘেমে-নেয়ে আপনি যদি-বা টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওর গেট পার হতে পারলেন ফ্লোরে ঢোকার আর উপায় নেই। কারণ গরম। এবং উত্তমকুমার। উত্তমকুমার সাফ বলে দিয়েছেন বাইরের গেস্ট থাকলে তাঁর পক্ষে শুটিং করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে এ-ছবিতে। অনাদি বাঁড়ুজ্যে আমায় বলল। ভাই এই এক হয়েছে ভ্যালো ডিউটি। সকাল থেকে লোকের পর লোক আসছে আর শুটিং দেখতে চাইছে।

কেন শুটিং দেখে কি হবে ? ছবি রিলিজ হলে ট্যাঁকের নগদ পয়সা খরচা করে যত খুশী দেখুন। আমরা বরং খুশীই হবো। কিন্তু এখন নাথিং ড্যুয়িং, ফ্লোরে বাইরের লোক যেতে দেওয়ায় নিষেধ আছে।

একদল মেয়ে সেজেগুজে এসেছিল, এখন বসন্তকাল তাই সাজের কি ঘটা, অনাদি বাঁড়ুজ্যের ডায়লগ শুনে তাদের মুখ শুকিয়ে গেল। তারপর কত কাকুতি-মিনতি। কিন্তু অনাদি যেন পাষাণ, না না অসম্ভব, ফ্লোরের মধ্যে এখন কাজের ঠ্যালায় সব্বাই চোখে অন্ধকার দেখছে, এখন আপনারা ওখানে গিয়ে দাঁড়ালে আমার চাকরী সঙ্গে সঙ্গে নট হয়ে যাবে। এখন বাড়ি যান। অন্য দিন আসবেন। অন্য কোনো সেটে দেখিয়ে দেব শুটিং।

ইদানিং অনাদি বাঁড়ুজ্যে এইসব নিয়ে বড়ই তিতবিরক্ত হয়ে আছে। আড্ডা আজকাল আর তেমন হচ্ছে না। হাজারটা কাজের ঝঞ্ঝাট, অনাদির এখন আড্ডায় বসবার তেমন সুযোগই নেই। নিজে 'মোমবাতি' নামে একটা ছবি প্রোডিউস করছে। আর প্রোডাকশন ম্যানেজারী করছে কমসে-কম তিনখানা ছবিতে। তারপর এর ওর পেছনে কাঠি করছে। আর টুপি পরাতে তো মাষ্টার লোক। দেখুনগে হয়ত এর টুপি ওর মাথায় চাপিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে।

ভাবুন এই অনাদিই একদা নর্থ ক্যালকাটার মস্তান ছিল। তখন লোকে তাকে মস্তানদের রংবাজ বলে ডাকত। শেষ পর্যন্ত প্রকাণ্ড ধোলাই খেয়ে একদিন নর্থ ছেড়ে সাউথে দে-চম্পট। তারপর থেকে রংবাজির রোগটা ওর বেমালুম সেরে গেছে। এখন শুধু ফিচলেমো নিয়ে আছে। বাংলা ছবিতে মাঝে-মধ্যে ওকে পার্ট করতে দেখা যায়। হাসির পার্টে বাস্তবিক ও বেশ জমিয়ে রাখে। আচ্ছা, অনাদির আর এক বন্ধু ছিল নর্থে, আমাদের সরকারী বিল্বমঙ্গল মামা প্রভাত দাস, এখন নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর ম্যানেজার মানুষ হিসেবে তারও জবাব নেই। এই অনাদি আর প্রভাতকে চেনে না হেন মানুষ আজ আর ফিল্ম লাইনে নেই। দুজনেই খুব উঁচু দরের প্রোডাকশন ম্যানেজার। কানন দেবীর প্রোডাকশন বলুন বা নরেশ মিত্তিরের—ওরা দুজন ঠিক লেগে-পড়ে ছিল, লোকে বিস্তর খাতিরও করত

ওদের। পরিচালক এবং কলাকুশলীরাও ওদের যথেষ্ট ভালবাসত। এখনও বাসে, মতামতের মূল্য দেয়—তা এর ভেতর আবার অনাদির খচড়ামো বুদ্ধিটা এট্টু প্রবল ছিল।

টালীগঞ্জে এসে অনাদি সেবার ফিল্ম লাইনে সবে পাকাপোক্ত হয়েছে। বাড়ির লোকেরা সেই সুযোগ বুঝে দড়াম করে ওর বিয়েটা দিয়ে দিল। অনাদির অবশ্য এক্কেবারে ইচ্ছে ছিল না। কোথায় নতুন পাড়ায় এসে এট্টু ইয়ে-টিয়ে করবে তা না অভিভাবকেরা পত্রপাঠ ছাঁদনা-তলায় বসিয়ে দিল! কোন মানে হয়?

তারপর দেখুন কি কাণ্ড!

অনাদি তো পয়লা নম্বর আড্ডাবাজ। সে সব সেরে বাড়ি ফিরতে তার রোজ রাত এগার বারোটা বেজে যায়। নতুন বৌ ঘুম কাতুরে মানুষ, ভাত আগলে বসে বসে হাই তুলে তার সময় কাটতে চায় না। একদিন না পেরে রাগ করে ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত তখন যথেষ্ট হয়েছে। এমন সময় অনাদি ঘুট ঘুট করে এসে হাজির। টালীগঞ্জে ওর বাসায় তখনও ইলেকট্রিক আসেনি, হ্যারিকেন জ্বালাতে হয়। অনাদি এসে দরজার কড়া নেড়ে নেড়ে হদ্দ। খুলবে কে? বৌ যে ওদিকে ঘুমিয়ে কাদা!

অনাদি তখন দমাদম দরজা পিটতে আরম্ভ করল। পাড়ার লোকের ঘুম ভাঙ্গে আর কি। যাই হোক এক সময় বৌয়ের ঘুম ভাঙ্গল। বেচারি মহা অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দিল।

অনাদি তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে পড়ে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর এদিক-ওদিক চেয়ে লণ্ঠনের পল্‌তে উসকে কাকে যেন গম্ভীর মুখে খুঁজতে আরম্ভ করল। বৌ তো অবাক ওর কাণ্ড দেখে।

অনাদি একবার খাটের তলা দেখে, আলমারি খুলে দেখে, আলমারির পেছনটা দেখে, রান্নাঘর দেখে, বাথরুম দেখে, এটা দেখে—সেটা দেখে। বৌয়ের ভয় ধরে গেল—এত দেখছে কি মানুষটা? জিজ্ঞেস করলে জবাব দেয় না। তারপর তন্ন তন্ন করে খুঁজে এক সময় বিস্ময়সূচক একটা শব্দ করে অনাদি স্বগতোক্তি করল—তাহলে মালটা গেল কোথায়?

—কোন মালটা? বৌ বেচারি বিস্ময়ে একখানা হয়ে প্রশ্ন করল—কি বলছ কিছুই বুঝতে পারছিনে আমি—

অনাদি পোশাক পরিবর্তন করতে করতে বলল—হাতে-নাতে যখন ধরতে পারলাম না তখন আর বলি কি করে।...আচ্ছা লোকটাকে কোন রাস্তা দিয়ে বের করে দিলে বলত? আমি তো তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি—

এর পর আর না বোঝার কি থাকে। বৌ রেগে এক নিমেষে সাক্ষাৎ যেন টাটার ফার্নেস। রেগে চোখ-মুখ লাল করে বলল—ছি ছি, একথা মুখে আনতে তোমার লজ্জা করল না? ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বলে দরজা খুলতে দু মিনিট না-হয় দেরী হয়েছে, তা বলে তুমি—

বলা আর শেষ হয় না, বেচারি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে আর কি। অনাদি তখন মিটিমিটি হাসছে—আহা চটে যাচ্ছ কেন। শোন আমার কথাটা শোন—

—ছোটলোক ইতর, তোমার সঙ্গে আর কোন কথা নয়, আমি এক্ষুণি বাপের বাড়ি চলে যাব—

যেতে অবশ্য তাকে শেষ পর্যন্ত হয় নি, অনাদি যেতে দিলে তো, তবে ওই ঘটনার পর দরজায় একবারের বেশী দুবার আর কড়া নাড়তে হয় নি অনাদিকে।

এমন রসিক প্রাণোচ্ছল মানুষ আমি কদাচিৎ দেখতে পাই। অনাদি, প্রভাত দাস—এরা ফিল্ম লাইনের সত্যিকারের অ্যাসেট। এদের কীর্তি কাহিনী সোনার অক্ষরে লিখে রাখবার মত। বিশ্বাস না হয় ফিল্মের যে কাউকে প্রশ্ন করুন। সঠিক জবাবই পাবেন।

ওরা প্রোডাকশন ম্যানেজারী করে একের পর এক ছবিতে; আর সেসব ছবি কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা রোজগার করছে দেখে এক সময় ওদেরও বেশ লোভ ধরে গেল। দুই বন্ধুতে পরামর্শ করল, মাইরি আমরা খেটে চিচিং ফাঁক হয়ে যাচ্ছি আর দারোগায় ডিম খেয়ে যায়? নাঃ, এবার নিজেদের আখের গুছিয়ে নেবার ব্যবস্থা করতে হবে। জম্পেশ করে ছবি তৈরী করে

বড়লোক হতে হবে। বল ভাই? অনাদি ভ্রু-কুঁচকে বলল—কিন্তু আমাদের পয়সা কোথায়? কাজ শুরু করতে হলে তো কমপক্ষে দশ-বিশ হাজার ক্যাশ দরকার—

প্রভাতের বক্তব্য—ওর জন্যে চিন্তা করতে হবে না। লাগে টাকা জোগাবে গৌরী সেন। এখন মাথা ঠাণ্ডা করে বল যে নামবে কি না।

অনেক চিন্তা-ভাবনা করে শেষ পর্যন্ত অনাদি বলল—ঠিক আছে চল মায়ের নাম করে ঝাঁপিয়ে পড়ি—

বলে মশাই বিশ্বাস করবেন না ওই ভর দুপুর বেলায় ওখানে হাঁটু গেঁড়ে বসে ওরা মাতৃস্তব করল। একজন পাশে দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত চোখে ওদের এই কাণ্ড-কারখানা দেখছিল। সে অবাক কণ্ঠে প্রশ্ন করল—কি ব্যাপারটা বলত ভাই? কিছু ঠাহর করতে পারছিনে—

অনাদি গম্ভীর মুখে ঘোষণা করল—আমরা ছবি প্রোডিউস করব বলে ঠিক করে ফেললাম।

ব্যস, আর যায় কোথা, এই ভয়ঙ্কর বার্তা রটে যেতে ফিল্ম লাইনে সামাল সামাল রব উঠে গেল। এই দুই দুঁদে প্রোডাকশন ম্যানেজার যদি ছবি আরম্ভ করে তো কেউ একটি পয়সা পাবে না, বিলকুল টুপি পরিয়ে কাজ সারবে ওরা। যা তিকড়মবাজ লোক অনাদি আর প্রভাত, নয়কে হয় করতে ওস্তাদ।

ওদিকে ছবি করছে বলে নিজেরাই আহ্লাদে আটখানা। অল্প কিছুদিনের মধ্যে গল্প চিত্রনাট্য তৈরী হয়ে গেল। ঠিকঠাক হয়ে গেল পরিচালক, কলাকুশলী আর শিল্পিবৃন্দ। সিদ্ধান্ত হলো গান, রেকর্ডিং-এর মাধ্যমে ওরা ওদের এই ছবির শুভ মহরৎ করবে। ভাল কথা।

নির্ধারিত দিনে রেকর্ডিং শুরু হল ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে। সন্ধ্যা মুখার্জি গান গাইছেন। তারই রিহার্সাল চলছে। তবলা বাজাচ্ছিল বিখ্যাত রাধাকান্ত নন্দী। এক ফাঁকে আমায় দেখে চোখের ইসারায় ডেকে খাটো গলায় বলল—হ্যাঁরে, ছবিটা শুনছি অনাদি আর প্রভাতের। তা শেষ পর্যন্ত মাল পাওয়া যাবে তো?

আমি হেসে জবাব দিলাম—না না পয়সা মারবার লোক নয় ওরা। তোমায় বাজনার মুজুরী ঠিকই দিয়ে দেবে—

শুনে হাত ঘুরিয়ে রাধা নন্দী সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলল—কি জানি রে ভাই, ওদের ভাব-গতিক যা দেখছি—শেষ পর্যন্ত ট্যাকসি ভাড়াটা দেয় কিনা কে জানে—

বলে তবলায় মনোনিবেশ করল রাধা নন্দী।

তেড়ে গান রেকর্ডিং হচ্ছে কিন্তু বুঝতে পারছি মিউজিশিয়ানদের মনে ভয় ঢুকে গেছে যে পয়সা হয়ত পাওয়া যাবে না। চাইলেও ওরা হয়ত বলবে—বারে সারা বছর তোমরা আমাদেরই কোন-না-কোন প্রোডাকশনের সঙ্গে বাজিয়ে বেশ টু-পাইস রোজগার করছ—আর এটা হচ্ছে আমাদের ছবি, কষ্ট করে কোন গতিকে দাঁড় করাচ্ছি, এখানে ভাই আমরা দিতে পারব না—

ঝোঁকটা অনাদির-ই সেই দিকে বেশী অর্থাৎ মাগনায় বাজিয়ে নেওয়া। এখন হয়েছে কি কালীবাবু একজন নিরীহ মানুষ, ভদ্রলোক ডবল ভাস্ বাজিয়ে সংসার চালান, কারও সাতে-পাঁচে থাকেন না। ভদ্রলোক সেদিন ওদের রেকর্ডিং-এ তাঁর সেই ঢাউস যন্ত্রটি এনে আপন মনে বাজাচ্ছিলেন। সুরের রিদম্-এর জন্যে ডবল-ভাস্ অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্র। যন্ত্রটিকে দেখতে অনেকটা বেহালার মত। তবে সাইজে এত পেল্লায় যে একটা গোটা ট্যাকসি লাগে ওটিকে কোথাও নিয়ে যেতে। তাও ধরে না। ট্যাকসির জানলা দিয়ে মাল খানিকটা বাইরে বেরিয়ে থাকে। যন্ত্রটি ফ্লোরের ওপর দাঁড় করিয়ে যন্ত্রীকে একটা টুলের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে তবে বাজাতে হয়। ভং-ভং-ভং গম্ভীর আওয়াজে।

কালীবাবু স্বরলিপির দিকে চোখ রেখে একাগ্র চিত্তে তাঁর যন্ত্র ছেড়ে যাচ্ছিলেন হঠাৎ খেয়াল হল—তাঁর দু' পাশে দুই মাল দাঁড়িয়ে—অনাদি আর প্রভাত। ওরা যন্ত্রটি গভীর মনোনিবেশ সহকারে দেখছে।

কালীবাবু তো অবাক—একি ওরা এভাবে যন্ত্রটা দেখছে কেন? তার-ফার খুলে গেল নাকি? কই না তো! তাহলে?

অনাদি দেখছিল যন্তরের কাঠের তৈরী খোলটা। সম্ভবত মেহগনী কাঠ। বেশ পালিশ করা।

কালীবাবু বিস্ফারিত চোখে দেখলেন অনাদি তাঁর যন্তরের কাঠে টোকা দিচ্ছে আর অভিজ্ঞ টিম্বার মার্চেন্টের মত ঘাড় নাড়ছে। বারকতক এ-রকম করার পর অনাদি গম্ভীর গলায় প্রভাতকে উদ্দেশ্য করে বলল—ফাসক্লাস কাঠ, ভাল জানলা হয় এই কাঠে—

শুনে কালীবাবুর আক্কেল গুড়ুম। রিদম বাজানো তাঁর তখন প্রায় মাথায় উঠে গেছে—জানলার কাঠ-ফাঠ কি বলছে ওরা এ্যাঁ? কোথায় গান রেকর্ডিং আর কোথায় জানলা?

কালীবাবু আর স্থির থাকতে না পেরে যন্তর রেখে ছুটলেন টোপাদার (অমর দত্ত) কাছে—অ্যাঁ, টোপাবাবু শুনেছেন ইয়েদের কথা? বলে কিনা আমার যন্তরের কাঠ ফাটিয়ে ওরা কি-সব দরজা-জানলা করবে। না না, এ-আমার মোটেও ভাল ঠেকছে না। আপনি মোশাই এক্ষুণি এর এট্টা পিতিকার করুন। তা না হলে আমি রিদম বাজাতে পারব না—

টোপাদা বাজাচ্ছিল খঞ্জনী। কালীবাবুর কথা শুনে বাজনা তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে গেল—বুঝেছি ওরা ক্যাশ দেবে না। ও রাধু, এক্ষুণি কষে বেতালা বাজা, আগে ফয়শালা হোক, তবে রেকর্ডিং। কি অন্যায় কথা, ওরা নাকি বলছে আমাদের কালীবাবুর যন্তর ভেঙ্গে জানলার কাঠ তৈরী করবে। এ-সব কি ধরনের মাস্তানী?

অমনি চোখে চোখে ইসারা। বাজনা হঠাৎ বেতালা আরম্ভ হয়ে গেল। মিউজিক ডিরেকটার লাফিয়ে উঠে বললেন—স্টপ স্টপ, বেতালা বাজছে কেন?

রাধা নন্দী বলল—আগে পেমেন্টের ব্যাপারটা, জানলার কাঠের ব্যাপারটার এট্টা নিষ্পত্তি হোক তবে তালের বাদ্যি···

হৈ হৈ কাণ্ড।

সব শুনে অনাদি গম্ভীর মুখে বলল—পেমেণ্ট রেডি আর কাঠ? সে তো শুধু মুখে বলেছি। নিয়ে তো আর নিইনি। তাহলে এ-সব কলরব কেন?

বটেই তো খুব ন্যায্য কথা। টোপাদা সরেজমিন তদন্ত করে এসে রিপোর্ট দিল—না হে ক্যাশ ওদের রেডি। নামে নামে ভাউচার লিখে ক্যাশ গেঁথে রেখেছে। অতএব সবাই দম দিয়ে বাজাও ভাই, বেশ সুর দিয়ে দিয়ে···

যাই হোক, ধুমধামের সঙ্গে তো অনাদি বাঁড়ুজ্যে আর প্রভাত দাসের ছবির শুটিং আরম্ভ হল। আমার ওপর ওদের গোড়াগুড়ি কেমন যেন একটা দুর্বলতা ছিল, আমাকে ওরা ছাড়ল না, ওদের ছবির সঙ্গে কায়দা করে যুক্ত করে নিল ছবির সহকারী পরিচালক হিসাবে। তাবড় সব শিল্পীরা ছবিতে অভিনয় করতে লাগলেন। তখন অনাদি আর প্রভাতের সে কি হেঁকড় ; তাদের এতদিনের স্বপ্ন আজ সার্থক হতে চলেছে। এ আনন্দ কি আর সহজে চেপে রাখা যায় ? সঙ্গে সঙ্গে কিছু লোক চোট হয়ে গেল। তারা হাউমাউ করতে অনাদি তাদের সাফ বলে দিল—দেখ আমরা এখন থেকে প্রোডিউস্যার, ফালতু নই, এট্টু সাট্টু চোট-চাট না দিলে ধম্মো বজায় থাকে কি করে ?

মনে আছে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে ছবির বিরাট সেট লেগেছিল। ঘোরতর বর্ষাকাল তখন। ছবির ডিস্ট্রিবিউটার ওদের বলে দিয়েছেন, মশাই, বর্ষার মধ্যে যদি ছবি শেষ করে দিতে পারেন তাহলে শীতকালে আমি এ-ছবি রিলিজ করে দিতে পারব। শীত খুব ভাল সিজিন, মানুষের মনে তখন ফূর্তি থাকে দেদার, আপনারা অল্প দিনের মধ্যে পয়সা লাভ সমেত ফেরৎ পেয়ে যাবেন। অবশ্য—

—অবশ্য ?

—মানে আপনাদের ছবি যদি চলে—

—চলবে না মানে, পয়সা খর্চা করছি কি লোকসান দেবার জন্যে ? আলবৎ চলবে—অনাদির দৃঢ় বক্তব্য।

বর্ষার সময় স্টুডিওতে শুটিং করা দায়। ফ্লোরের ছাতে জল পড়লে বড় আওয়াজ হয়। তখন সাউণ্ড টেক্ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। আর হলোও তাই। দু'দিন যেতে না যেতেই সাউণ্ড রেকর্ডিস্ট আপত্তি

করলেন—ও অনাদি, এ-যে কিছুতেই টেক্ করা যাচ্ছে না—একটা উপায় বের কর।

সাউণ্ড শুটিং-এ বিঘ্ন হলে সব বন্ধ করে বসে থাকতে হয়। ফলে প্রযোজকের বিরাট ক্ষতি। অনাদি আর প্রভাতের মুখ শুকিয়ে আমসি—একি কাণ্ড ভাই আমাদের টাকার ছেরাদ্দ হবে আর ওরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে?

প্রভাত দাস বলে—সে আর কি করা যাবে বল? বৃষ্টি-বাদলার ওপর তো আমাদের কোন হাত নেই, যতক্ষণ না থামছে ততক্ষণ এইভাবে মার খেতে হবে।

—হুঁম। মানে—বুঝলাম।

অনাদি আর প্রভাত মাথা খাটিয়ে কিছুতেই এমন একটা পন্থা বের করতে পারল না যাতে করে টেকনিশিয়ান বা আর্টিস্টদের এই বৃষ্টির দরুন পয়সা না দিয়ে কাজ করান যায়। ওরা প্রথমে ম্যানেজ করবার চেষ্টা করেছিল পাহাড়ী সান্যালকে। তিনি তো এমনিতে ক্ষ্যাপাটে ধরনের মানুষ, ওরা ওঁর পারিশ্রমিক থেকে কিছু ছেঁটে দেবার মতলবে আছে শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ মেকআপ তুলতে উদ্যোগী হলেন—না ভাই, মাগনায় আমি অ্যাকটিং করতে পারব না—

অনাদি যত বোঝায়, আরে দাদা মাগনায় নয় মাগনায় নয়, বিস্টি বিস্টি—পাহাড়ীদা তত চেঁচান—বিস্টি তো আমার কি? বিস্টি তোমাদের। জানো আজ স্টুডিওয় আসতে আমার দু-গ্যালন পেট্রল ফালতু পুড়েছে। যেদিকে যাই জলে থৈ থৈ, শেষে যাদবপুর দিয়ে ঘুরে তবে এসেছি। এখন এই দু-গ্যালনের দাম দেবে তোমরা—

পাহাড়ীদার বেঁটে খাটো থেঁকুড়ে গাড়িটা দেখলেই অনাদি চটত—এঃ, এলেন যেন প্রিন্স—চারশো ছত্রিশ রকমের আওয়াজ বের করতে করতে, যেমন বিটকেল দেখতে তেমনি কুচ্ছিত ব্যাভার গাড়িটার। আর ওই গাড়িটা ছিল পাহাড়ী সান্যালের প্রাণ। গাড়ি নিয়ে কেউ কোন বাজে মন্তব্য করলে পাহাড়ীদার মাথায় যেন খুন চেপে যেত।

পাহাড়ী সান্যাল পয়সা কমাবে না বুঝে শেষ পর্যন্ত ওরা রণে ভঙ্গ দিল।

আক্ষেপে একখানা হয়ে অনাদি বলল—বুঝলি প্রভাত, এই জন্যে বায়োস্কোপের লাইনের কোন উন্নতি হয় না। তিন দিন শুটিং হয় নি আমাদের, এক কাঁড়ি টাকা নষ্ট। শুনে কোথায় সবাই একটু সহানুভূতি দেখাবে তা-নয় উল্টে ডু-গ্যালনের জন্যে ক্যাশ চাইছে! ভাবছি ছেড়ে দেব এই হতচ্ছাড়া লাইন—

তারপর ছবি যখন বাস্তবিক শেষ হল তখন ওদের জিভ বেরিয়ে এসেছে। স্বপ্ন-টপ্ন সব ধূলিসাৎ। তখন মুখে ওদের একটাই ডায়লাগ—ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি···

তারপর একটা শুভক্ষণ দেখে ছবি রিলিজ হলো।

রিলিজের দিন পরিচালক আমায় বললেন, যাবে নাকি হাউসে?

—চলুন।

বেলা দুটো নাগাদ আমরা অর্থাৎ পরিচালক এবং তাঁর দু'জন সহকারী এসে দাঁড়ালাম ভারতী সিনেমার উল্টো দিকের ফুটপাতে, গীতবিতান স্কুলটা ঘেঁসে। পরিচালকের সঙ্গে ছবির শেষের দিকে অনাদি-প্রভাতের সম্পর্কটা কিঞ্চিৎ তেতো হয়ে পড়েছিল, তাই পরিচালক আর হাউসের লবি-তে এক চান্সে যেতে রাজী হলেন না। বললেন ফার্স্ট-শোর রিপোর্ট নিয়ে তবে যাবেন। আমি অবশ্য ধরে নিয়েছিলাম ছবি খুব ভাল চলবে না। অনাদি আর প্রভাতের-ও সেই এক ধারণা। এই হাসির ছবিতে এক হাসি ছাড়া নাকি সব আছে—এই হচ্ছে ওদের নিজেদের ছবি সম্পর্কে মন্তব্য। তখন সবাই বুঝিয়ে বলেছে—আহা চিন্তা করছ কেন, রিলিজ না হওয়া পর্যন্ত কোন ছবির কি হয় তা আগে থেকে বলা শক্ত—

হাউস তো প্রচণ্ড রকম 'ফুল'। ছবির উদ্বোধনী শো, ভাল ভাল সব আর্টিস্ট এবং প্লে-ব্যাক সিঙ্গার, কিছু টিকিট তো ফটাফট ব্ল্যাক-ই হয়ে গেল আমাদের চোখের সামনে। দেখে পরিচালক খুব খুশী। চোখ নাচিয়ে ইঙ্গিতে বললেন—কি হে ছোকরা, কেমন বুঝছ?

বললাম—দাদা ঠিক সাড়ে পাঁচটায় সব বোঝা যাবে—

পরিচালক অপ্রস্তুত ভঙ্গীতে দ্রুত বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো ঠিক কথা—

অনাদি আর প্রভাত আগে থেকেই দু'খানা ফ্রন্ট স্টলের মানে দশ আনার সিটের ব্যবস্থা করে রেখেছিল। ওরা ফ্রন্ট স্টলে টিকিট কেটে বসে ছবি দেখবে শুনে হাউসের স্টাফেরা তো অবাক—এ কি রকম প্রোডিউসার! ছবি দেখছে নিজের, ফ্রন্ট স্টলে বসে?

প্রভাতের মিচকি মিচকি হাসি—হ্যাঁ দাদা, ওই ফ্রন্ট স্টলের লোক যদি ছবি দেখে ভাল বলে তো বুঝবো আমাদের ছবি চলবে আর ওরা যদি অপছন্দ করে তো ছবি আমার থান ইঁটের মত ফ্লপ। সেই জন্যে ওদের সঙ্গে বসেই আমরা ছবি দেখব।

অকাট্য যুক্তি।

এক সময় প্রথম শো শেষ হল। আমরা প্রবল ঔৎকণ্ঠা নিয়ে হাউসের উল্টো দিকের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে। ওখান থেকে সবকিছু দেখা যাচ্ছে। দর্শকরা পিল পিল করে হাউস থেকে বেরিয়ে আসছে। পরের শো য়ের জন্যে যারা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছিল তারা নিজেদের উদ্যোগে সামান্য সরে গিয়ে জনতার বেরোবার রাস্তা করে দিল। আমাদের নজর তখন মানুষের মুখের ওপর, ছবি ভাল লাগল না মন্দ লাগল সেই প্রতিক্রিয়াটা আবিষ্কার করতেই ব্যস্ত আমরা। আর সেই সঙ্গে কানও খাড়া—মন্তব্য শোনার জন্যে।

হঠাৎ দেখি হাউসের ভেতর থেকে উন্মাদের মত অনাদি আর প্রভাত ছুটে বেরিয়ে এসে হৈ হৈ করে ছ'টার শো-য়ের লাইনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমরা বিস্ফারিত চোখে দেখলাম ওরা লাইন ভেঙ্গে দিচ্ছে আর কণ্ঠ সপ্তমে তুলে চেঁচাচ্ছে দেখবেন না, এ ছবি দেখবেন না। থাড কেলাস ছবি। পয়সা নষ্ট হবে—

লাইনের লোক বিভ্রান্ত, এ কি রে বাবা? লোক দুটো বলে কি?

জনতা লাইন ছাড়বে না আর অনাদিরাও লাইন ভাঙতে বদ্ধপরিকর, এমন সময় লাইনের একজন মুখ করে বলল—কি বলছেন মোশাই, ভাল

করে বলুন তো।

অনাদি হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—ছবিটা যাচ্ছেতাই, আমরা এই ছবির প্রোডিউস্যার, আমরা বলছি এ-ছবি দেখবেন না। দেখলে পয়সা চোট—

শো দেখে বেরিয়ে আসা দর্শকরাও তৎক্ষণাৎ ওদের সমর্থন দিল—ঠিক বলেছেন, মশাই বিতিকিচ্ছিরি ছবি, পয়সা নষ্ট হবে। তার চেয়ে এখনও সময় আছে, অন্য হাউসে চলে যান—

ফলে লাইনের অধিকাংশ লোক ভেগে গেল।

আমরা দেখলাম সবাই অনাদি আর প্রভাতকে ছেঁকে ধরেছে ব্যাপারটা বিস্তারিত শুনবে বলে। এমন মজা কোন ছবির দর্শক ইতিপূর্বে কখনও পেয়েছে বলে মনে হয় না।

অনাদি কণ্ঠ সপ্তমে তুলে চেঁচাচ্ছে—মশাই আমরা তখন পৈ পৈ করে বলেছিলাম এ গল্প চলবে না, এ চেঞ্জ করে অন্য ভাল গল্প দেখুন, তা আমাদের কথা তখন কেউ গ্রাহ্যই করল না, এখন সমূলে চলে গেল—

বলে সশব্দে কপাল চাপড়াতে লাগল। আর তার ওই কাণ্ড দেখে প্রভাত হতভম্ব, সে এতটা ভাবে নি তলিয়ে, এবার অনাদির কথায় তার যেন খানিকটা চৈতন্য হল, কারণ তার এক বন্ধুর কাছ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা সে নগদ ধার করে এনেছিল এই ছবিরই বাবদ, এখন ছবি ডুবলে গলায় গামছা সর্বাগ্রে তারই পড়বে, একথা মনে হতেই প্রভাতের যন্ত্রপাতি কেমন থর থর করে সব নড়ে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে মাথায় হাত দিয়ে ধপাস করে বসে পড়ল সেই ফুটপাতে -আমায় ডুবিয়ে দিয়েছে ওরা, আমায় স্রেফ ডুবিয়ে দিয়েছে—ওই যে ওই যে শালারা দাঁড়িয়ে আছে, ছবির ডিরেকটার আর তার চামচেরা, দেখুন দাদারা দেখুন—

বলে প্রভাত আর অনাদি সটান আমাদের দেখিয়ে দিল। আর যায় কোথা, ক্রুদ্ধ পাবলিক হুঙ্কার ছাড়ল—ধর শালাদের, প্রোডিউসারদের তেইশটা বাজিয়ে আবার লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা হচ্ছে—

পরিচালক হঠাৎ নড়ে উঠলেন।

পাবলিক ছুটে আসছে ধরবার জন্যে।

পরিচালকের মাথার চুল যেন সজারুর কাঁটা স্রেফ সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে—অ্যাই···অ্যাই দেখেছো অনাদিদের খচরামো, আমাদের দিকে পাবলিক লেলিয়ে দিচ্ছে?

বললাম—দাদা কেটে পড়ুন, বড্ড তাতিয়ে দিয়েছে—

পরিচালক আর বাক্য ব্যয় না করে হাঁটা দিলেন। ঠিক হাঁটা নয়, আবার দৌড়ানোও নয়, খানিকটা উড়ে যাবার ভঙ্গী। আমরাও পরিচালককে ফলো করে এক নিঃশ্বাসে পাশের রমেশ মিত্তিরের রাস্তায়, এক ফুচকাওলার পেছনে।

পরিচালক কপালের ঘাম রুমালে মুছতে মুছতে—না: বড্ড বিচ্ছিরি ব্যাপার, এভাবে পাবলিক লেলিয়ে দিলে ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রীর বারোটা বাজতে আর সময় লাগবে না! এরপর আর কোন ডিরেকটার সাহস করে ছবি করবে? প্যাঁদানী খাবার জন্যে? দিস ইজ ভেরি ব্যাড ট্রিটমেণ্ট···

সেই অনাদি আবারো ছবি করছে, তবে এবার আর প্রভাতের সঙ্গে নয়, এবার ও নিজে একা একাই করছে। সেদিন টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে যেতে অনাদি আমাকে ওর ঘরে ডাকল। অনাদি আমাকে দীর্ঘকাল ধরে তাতাচ্ছে একটা ছবি দেবে বলে। অথচ দিচ্ছে না। খালি বলে, ঈশ্বরের যেমন ইচ্ছা।

এবার শুনুন ওর আর এক কীর্তির কথা: পিতাপুত্র ছবির শুটিং চলছে, অনাদি বাঁড়ুজ্যে সে-ছবিরও প্রোডাকশন ম্যানেজার, পরিচালক অরবিন্দ মুখার্জী। অরবিন্দ মুখার্জী হচ্ছেন আবার বনফুলের ছোট ভাই, স্টুডিওতে ওঁকে সবাই ঢুলুদা নামেই ডাকে।

ঢুলুদা একদিন অনাদিকে ডেকে বললেন—অনাদি, একটা ফিটন ম্যানেজ করতে পারবে?

—ফিটন? কি ফিটন?

টুলুদা বললেন—স্বরূপ দত্ত ফিটনে চেপে গান গাইতে গাইতে কলকাতা থেকে দীর্ঘদিন পরে দেশে ফিরছে, এই হচ্ছে সিন। একটা ফিটন গাড়ি যে চাই।

—হুঁম। খানিকটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে চিন্তা করে অনাদি বলল—ঠিক আছে, ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

—তবে ওটা কলকাতার জন্যে নয়, ইটিণ্ডা ঘাটে লাগবে।

—অ্যাঁ ইটিণ্ডা ঘাটে? সেখানে ফিটন নিয়ে যেতে হলে তো বছর খানেক লাগবে। সে কি সোজা কথা? কোথায় কলকাতা আর কোথায় ইটিণ্ডা! যাইহোক আমি দেখছি কি ব্যবস্থা করা যায়।

অনাদি এর পর খবর নিল কোথায় ভাল ফিটন পাওয়া যাবে। একজন খবর দিল পার্ক সার্কাসে একটা ভাল ঘোড়া সমেত চমৎকার দেখতে ফিটন গাড়ি ভাড়ায় পাওয়া যাবে।

• অরবিন্দ মুখার্জির সে-ছবির আউটডোর লোকেশান স্থির হয়েছিল বসিরহাটের কাছে ইটিণ্ডা ঘাটে। অনাদি বাঁড়ুজ্যে সকাল সকাল সবাইকে লোকেশানে পাচার করে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে গভীর রাত্রে এল পার্কসার্কাসে। উদ্দেশ্য—ফিটন গাড়ি নিয়ে যাবে। অনাদির এক সহকারী আগে ভাগে সেখানে গিয়ে সব দরদস্তুর ঠিক করে এসেছিল, ফিটনওয়ালা রাজী তবে তার বক্তব্য—অত দূরের রাস্তা, ফিটন তো এমনি যাবে না, লরিতে করে বয়ে নিয়ে যেতে হবে।

আচ্ছা বেশ, অগত্যা তাই হবে।

একটা লরি ভাড়া করা হলো। লরির মালিক সব শুনে ঠাঁই করে কপাল চাপড়ে বলল, বলেন কি স্যার, লরি করে ফিটন নিয়ে যাবেন? লোকে যে হাসবে—

—হাসুক। যত পারে হাসুক। আমার হচ্ছে কাজ হাসিল করা নিয়ে কথা। এখন তুমি সাফ বল যাবে কি না?

লরিওয়ালা সহাস্যে বলল—আমার যেতে আর অসুবিধা কোথায়! পয়সা দেবেন আমি মাল পাচার করে দেব, হ্যা—

তারপর সেদিন গভীর রাতে পার্কসার্কাসের এক আস্তাবলে সপারিষদ অনাদি বাঁড়ুজ্যের আগমন। ফিটনওয়ালা সেলাম বাজিয়ে বলল, হুম তৈয়ার হ্যায় বাবুজী—

এখন লরিতে ফিটন ফিট করতে গিয়েই বাধল যত গণ্ডগোল। কিভাবে তোলা হবে? এক একজন একেক রকম ফন্দি বলে। কিন্তু কোনটাতেই তেমন যুৎ হয় না। ন'দশ ফুট উঁচু ফিটন, যেমন লম্বা তেমন চওড়া। সব দেখে লরি ড্রাইভারের আক্কেল গুড়ুম। অনাদি অনেক ভেবে চিন্তে বলল—ধারে কাছে তক্তপোষ মিলেগা?

—কাহে? তক্তপোষ সে কেয়া হোগা

—হাঁ, তক্তপোষ ব্রিজ কা মাফিক লাগায়ে গা, আউর ফিটন গাড়ি সেই ব্রিজকা উপর গড়াকে গড়াকে একদম লরিকা পেট মে যাকে খাড়া হোগা, ব্যস খেল খতম—

অনাদি স্রেফ জলের মত ওদের বুঝিয়ে দিল।

তখন ওরা ছুটল তক্তপোষের খোঁজে। রাত একটায় কে আর তক্তপোষ নিয়ে বসে থাকে। সবাই তখন ভোঁস ভোঁস করে তক্তপোষের ওপর বডি ফেলে ঘুম মারছে। হাজার ডাকাডাকিতেও তাদের সাড়া মেলা ভার। অনাদি প্রেসক্রিপশন দিল ওদের ঠেলে ফেলে দিয়ে মাল নিয়ে এস। ফিটন তুলতে হবে। কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ্য করা হবে না—

আস্তাবলের পাশে এক খাটাল। কে যেন বলল—ওই গোয়ালা ব্যাটাদের অনেকগুলো খাট তক্তপোষ আছে। ওইগুলো চেয়ে আনতে পারলে কাজ হয়ে যায়।

অনাদি বলল—ঠিক আছে, ওদের গোটাকতক মোষ গরুর বাঁধন কেটে দাও, তা হলেই তক্তপোষ নিমেষে ফাঁকা হয়ে যাবে।

ফিটনওয়ালা কিন্তু সে প্রস্তাব কিছুতেই অনুমোদন করল না। এ-সব করলে হুজুর এই মাঝ রাতে রায়ট বেধে যাবে। তার চেয়ে আমি ঠাণ্ডা মাথায় ওদের কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে আনছি। লেকিন বাবু এট্টু খরচা আছে।

অনাদি বলল—খর্চার জন্যে কোই পরোয়া নেহি। পহলে কাম হাসিল করো, পয়সা জরুর মিলে গী—

তখন গোয়ালাদের হাঁক-ডাক করে তুলে পয়সার লোভ দেখাতেই ওরা তক্তপোষ নিয়ে হৈ-হৈ করে ঘটনাস্থলে এসে পড়ল। লরির পেছনের ডালা খুলে সেখানে একটার পর একটা তক্তপোষ সাজিয়ে গড়ে তোলা হল দ্বিতীয় হাওড়া ব্রীজ। তারপর বিকট চিৎকার চেঁচামেচি করে সেই ফিটন গাড়ি যেই অর্ধেকটাক কাঠের ব্রিজে তোলা হয়েছে, অনাদির হঠাৎ মনে পড়ল, এই রে ঘোড়া? ঘোড়া কিভাবে নেয়া হবে? আরে ফটন উতার দেউ উতার দেউ, পহলে ঘোড়া পিছে ফিটন—

অতএব ফিটন আবার ভূঁয়ে নামিয়ে ফেলা হল। এবং প্রথমে তোলা হল ঘোড়া। সে জানোয়ার অবাক কাণ্ড কেমন নিঃশব্দে ব্রিজ মাড়িয়ে লরিতে উঠে গেল, অনাদি ওর ব্যবহারে খুব খুশী হয়ে মন্তব্য করল—হ্যাঁ, এই হচ্ছে প্রকৃত ভদ্দরলোকের মত ব্যাভার, খাওয়াবোখোন তোকে বেশ ভাল রকম—

প্রথমে ঘোড়া পরে ফিটন গাড়ি মাঝখানে শুধু লম্বা করে একখানা বাঁশ, মানে ডিমাবকেশান লাইন। রাত দেড়টা নাগাদ গলদঘর্ম অনাদি লরির ওপরে যে ফিটন সেই ফিটনের গদিতে আরামসে গা এলিয়ে দিয়ে বলল—চালাও গাড়ি, একদম থামবে না কোথাও, সোজা ইটিণ্ডা ঘাট—

কিন্তু ফড়িয়াপুকুর পার হল না। রাস্তায় টহল দিচ্ছিল পুলিশের গাড়ি, তারা ছুটে এসে ক্যাঁক করে চেপে ধরল লরি।—এই রোখকে রোখকে……

ড্রাইভার বেচারি ভয়ে ভয়ে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। তখন পুলিশের জীপ থেকে একজন অফিসার বেরিয়ে এসে হেঁকে প্রশ্ন করল—এই লরিওয়ালা, ইসমে কেয়া হ্যায়?

লরিওয়ালা কিছু জবাব দেবার আগেই উপর থেকে অনাদি হেঁকে উঠল—সার, আমি এখানে—

অফিসার অবাক। পিছন ফিরে ভাল করে দেখে বলল—কে কোথায়?

কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি নে—

অনাদি তখন তার অমায়িক হাসি মুখখানি বের করে বলল—এই যে স্যার—

অফিসার টর্চের আলোয় ওকে দেখে নিয়ে প্রশ্ন করল—লরিতে এটা কি যাচ্ছে?

—হেঁঃ হেঁঃ হেঁঃ, চিনতে পারছেন না স্যার? একটা ফিটন।

—ফিটন? মানে ফিটন গাড়ি? ও। তা এভাবে এটাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? লরি থেকে পাক্কা দশ ফুট উঁচু, ট্রাফিক আইন-কানুন না মানলে পুলিশ যে অ্যারেস্ট করতে পারে এটা বুঝি জানা নেই?

—জানা নেই কি বলছেন স্যার, বিলক্ষণ আছে, তবে কি না শুটিং এর জন্যে ফিটনটা লাগবে তাই স্যার অনেক হ্যাপাজত করে নিয়ে চলেছি—

পুলিশ অফিসার কোন কথা শুনতে চায় না। গাড়ি যাবে না। এভাবে গেলে অ্যাকসিডেন্ট অনিবার্য। চলুন থানায়। অনাদি বলে, স্যার থানায় গেলে আমাদের ওকম্মো ফতে হয়ে যাবে মানে শুটিং চৌপাট হয়ে যাবে। আর্টিস্টরা সব লোকেশানে পৌঁছে গেছে, বিশ্বাস না হয় আপনি চলুন আমাদের সঙ্গে, সরেজামন তদন্ত করে আসবেন। আর আপনারও শুটিং দেখা হয়ে যাবে। কমল মিত্তির আছে স্বরূপ দত্ত আছে। দেখবেন কেমন চমৎকার একখানা গান পিকচারে তোলা হচ্ছে……

পুলিশ অফিসার চটে ফায়ার।

—মাঝরাতে আমাকে শুটিং দেখাবার লোভ দেখানো হচ্ছে? নাথিং ড্যুয়িং, এখন সব সমেত থানায় চলুন।

অনাদির সঙ্গে অফিসারের যখন এইসব ডায়লাগ বিনিময় হচ্ছে হেনকালে ঘোড়াটা হঠাৎ তীব্র চিঁহি চিঁহি করে হেঁকে উঠে নিজের উপস্থিতিটা জানান দিয়ে বসল। ব্যস আর যায় কোথা, ঘোড়ার আওয়াজ পেয়ে অফিসার রেগে একেবারে টং।—অ্যাঁ সঙ্গে আবার ঘোড়াও আছে? অসম্ভব। নির্ঘাৎ জেল। এভাবে ট্রাফিক আইন কাউকে লঙ্ঘন করতে দেয়া যায় না। আপনাদের মশাই সাহসের বলিহারি যাই, শুধু এই ঢাউস

ফিটন-ই নয়, সঙ্গে আবার জ্যান্ত এট্রা ঘোড়াও তুলেছেন লরিতে ?

বলতে বলতে অফিসার লাফিয়ে দু-পা পিছিয়ে দাঁড়াল। ঘোড়াটা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়েছে। অনাদি খুব চটে গেল। শালা ইয়ে করার আর সময় পেল না, দাঁড়া দিচ্ছি তোকে এক ডজন লাথি, জানোয়ার কোথাকার।

অফিসারের কাছে তাড়াতাড়ি মাফ চেয়ে নিল অনাদি—স্যার কিছু মনে করবেন না। গায়ে লাগে নি তো ?

অফিসার আরও চটিতং।

তারপর যেন মস কোডে দুজনের মধ্যে কথা আরম্ভ হল। সে এক বিচিত্র সংলাপ। প্রথমে অনাদি গুজ গুজ করে অফিসারটিকে কি যেন বলল। শুনে অফিসার এমন প্রবলভাবে মাথা নাড়তে লাগল যে মনে হল ধড় থেকে এক্ষুনি ওর মুণ্ডুটাই খসে পড়বে। এরপর ব্যাজার ভঙ্গীতে অনাদি আর একটা কি যেন বলল। এবারও অফিসারের মাথা নড়ল তবে আগেকার মত তেমন সবেগে নয়। অনাদি এবার অসম্ভব ব্যাজার মুখে কি একটা ডায়লাগ থ্রো করল। ব্যস, অফিসারের মুখে কুমড়োর ফালির মত এক চিলতে হাসি ফুটল তৎক্ষণাৎ। এরপর অন্ধকারে কাগজের কিছু খসখসানির আওয়াজ, অফিসারের প্রস্থান, লরি আবার চলতে আরম্ভ করল।

রাত আড়াইটে।

লরিটা তখন বেড়াচাঁপার কাছে এসেছে, হঠাৎ একজন পুলিশ কনেস্টবল অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে হুকুম দিল—এই লরি থামাও—

ঘ্যাঁচ করে লরি দাঁড়িয়ে পড়ল

অনাদি তখন গদিতে আরাম করে শুয়ে নিদ্রা যাচ্ছিল, ব্রেকের এই হঠাৎ ঝাঁকুনিতে সে ধড়মড় করে ঠেলে উঠে বসল।

—লাইসিন হ্যায় ?

ড্রাইভার বলল—হ্যায়।

—এই লরিমে চোরাই মাল হ্যায় ?

—নেহি হ্যায়।

—চাউল হ্যায় ?

—নেহি হ্যায়।

—তাহলে ইসমে কেয়া হ্যায় ?

—এক ফিটন হ্যায়। এক ঘোড়া হ্যায়। এক ভদ্দর সওয়ারী হ্যায়। হাম হ্যায়। হামরা ক্লিনার হ্যায়, ব্যস।

অনাদি তক্কো না করে একটা সিঁকি ছুঁড়ে দিল, কিন্তু তাতে লোকটার সেকি গোঁসা—ও-সব ঘুষখোরদের দেবেন, আমায় দেবেন না, এভাবে মাল নিয়ে যাওয়া যাবে না, থানায় চলুন—

—আরে ভাই কেন ফালতু হুজ্জুত করছ ভাই ? আমাদের ছেড়ে দাও আমরা আমাদের কাজে চলে যাই, তুমিও তোমার কাজে যাও—

—উহুঁ, থানায় যেতে হবে, যা বলবার বড়বাবুকে বলবেন—

শেষ পর্যন্ত যেতেই হল থানায়। কোথায় বড়বাবু ? তিনি তখন টেনে নিদ্রা যাচ্ছেন। কনেস্টবলটা গিয়ে চীৎকার করে ডাকতে তিনি চোখ ডলতে ডলতে বেরিয়ে এলেন, বেশ বিরক্ত মুখে।—কি হয়েছে ?

—হুজুর, এরা একটা লরিতে ফিটন তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

—তাই নাকি ? এই বাজারে কার আবার ফিটন চড়ার সখ হল ? কোথায় যাবেন ?

অনাদি জবাব দিল -ইটিণ্ডা ঘাট।

—কেন ?

—বায়স্কোপের শুটিং করতে। এই ফিটনটা সেখানেই দরকার আমাদের। ছবি তোলার জন্যে লাগবে স্যার।

বড়বাবু খুব খুশী।—আর কি কি লাগবে ?

অনাদি অবাক।—আর কি কি মানে ?

বড়বাবু বুঝিয়ে বললেন—মানে যা যা লাগবে সব এক সঙ্গে বললে তার একটা ইয়ে করা যায় মানে ফয়শালা। যাকগে, আমি মশাই সিনেমা-টিনেমা খুব ভালবাসি। আমি সকালেই যাচ্ছি আপনাদের ওখানে। এটু ভাল করে শুটিং দেখিয়ে দেবেন আমাকে, তাহলে আর কোন ইয়ে

থাকবে না—

অনাদি সবিনয়ে ঘাড় নেড়ে বলল—সে আর বলতে, দশজনকে দেখাবার জন্যেই তো আমাদের এই আউটডোর শুটিং। প্রোডিউস্যার আমাকে বলে দিয়েছে—যে আউটডোর শুটিং দেখতে চাইবে তৎক্ষণাৎ তাকে খুব খাতির যত্ন করে দেখাতে হবে। আপনি দেখবেন সে তো আমাদের পরম সৌভাগ্যের কথা স্যার, হেঁঃ হেঁঃ হেঁঃ···

বড়বাবু প্রসন্ন মুখে সেই কনেস্টবলটিকে হুকুম দিলেন—এদের যেতে দাও। আর যাবার সময় লক্ষ্য রেখো এদের যেন কোন অসুবিধে না হয়! কেমন?

বশম্বদ পুলিশটি ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল।

বড়বাবু আবার নিদ্রামগ্ন হতে চলে গেলেন। অনাদি লরিতে ওঠবার উদ্যোগ করছে, হঠাৎ সেই পুলিশ কনেস্টবলটি বলল, দেন—

—কি?

—যেটা দিচ্ছিলেন।

—কোনটা?

—আঃ,···সেই যে সিকিটা।

—বড়বাবুকে ডেকে তাহলে সাক্ষী রেখেই দিই, কি বলেন?

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশটি চুপসে গেল। বেচারি মোটা দাঁও মারবে ভেবে খানা পর্যন্ত টেনেছিল, এখন সে গুড়ে বালি দেখে তার কি অনুশোচনা!

যাই হোক আরও কিছু খুচরো বিড়ম্বনা সয়ে শেষ পর্যন্ত তো লরি পৌঁছাল ইটিণ্ডা ঘাটে, তখন রাত নিশুতি, অনাদি ভাবল, এইরে ওখানে না হয় খাট-তক্তপোষ দিয়ে ম্যানেজ হয়েছিল, কিন্তু এখানে? এই নির্জন নদীর ঘাটে কি করে এখন ফিটন নামাই?

ঘাটের পাশে একটা ছোট চায়ের দোকান। হাঁকডাকে দোকানদারের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। সে এসে সব শুনে বলল—একটা উঁচু ঢিবি-টিবি দেখে লরিটা তার গায়ে ভিড়িয়ে দিন, ও ফিটন আপনার আপসে নেমে আসবে।

মন্দ পরামর্শ নয়। কিন্তু ঢিবি কোথায়? লরির ড্রাইভার বলল—এক মাইল পেছনে আমি এট্টা ঢিবি দেখেছি, চলুন তাহলে ওখানে গিয়েই বরং—

—হ্যাঁ তাই চল। এদিকে ভোর হয়ে এল—

রাস্তার ধারে বাস্তবিকই একটা ঢিবি। অন্ধকারেও চোখে পড়ার মত। অনাদি খুশী হয়ে ড্রাইভারকে বলল—ভেরি গুড। আর দেরী না করে লরির পেছনটা ওখানে লাগিয়ে দাও, আমরা ফিটন আর ঘোড়া নামিয়ে নিচ্ছি—

ড্রাইভার ব্যাকগিয়ারে লরি লাগিয়ে দিল সেই উঁচু ঢিবিতে।

তারপর শুরু হল আনলোডিং অপারেশন। ড্রাইভার আর তার সহকারী দুজনে মিলে ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে ফিটনটা ধরে মারে হ্যাঁচকা টান, আর অনাদি প্রবল জোরে ঠেলতে থাকে সামনে থেকে। ফলে একটু একটু করে ফিটন ঢিপির ওপর উঠতে লাগল। জোরসে মারো হেঁইয়ো, তাগদসে মারো হেঁইয়ো করতে করতে হঠাৎ বিরাট এক হ্যাঁচকা টানে ফিটনটা হুড়মুড় করে ঢিবির ওপর চলে গেল, আর সেই সঙ্গে শোনা গেল ড্রাইভার আর ক্লিনারের প্রবল আর্তনাদ—মর গিয়া জ্বল গিয়া মর গিয়া জ্বল গিয়া—

কিরে বাবা কি হলো? ফিকে অন্ধকারে অনাদি দৌড়ে গেল সেখানে—আরেব্বাস সত্যনাশ, এটা একটা ইঁটের পাঁজা, মৃত নয়—জীবন্ত, পাঁজার ভেতরে আগুন গনগন করে জ্বলছে। ওরা গাড়ি নিয়ে পিছোতে পিছোতে সটান সেই আগ্নেয়গিরিতে গিয়ে পৌঁছেছে। আরে নেমে এস নেমে এস—

ওরা লাফাতে লাফাতে নেমে এসে ভুঁয়ে শুয়ে ছটফট করতে লাগল আর বিভ্রান্ত অনাদি এমন চেঁচাতে লাগল যে মুহূর্তে গ্রামের লোক লাটি-সোটা নিয়ে রে রে শব্দে সেখানে দৌড়ে এল। তাদের ধারণা নির্ঘাৎ ডাকাত পড়েছে। তারা এসে ভূতলশায়ী লোক দুটিকে এই মারে কি সেই মারে—লরিতে করে পাঁজার ইঁট চুরি করা আজ তোদের বের করছি ভাল রকম। অনাদি ওদের অতিকষ্টে শান্ত করল, দেখ ভাই আগে আমার ফিটনটা বাঁচাও, পরে সব বলছি খুলে।

তখন ফিটন উদ্ধার হলো। অনাদিকে গ্রামবাসীরা ইতিপূর্বে

দেখেছে। কারণ লোকেশান নির্বাচনের সময় অনাদি নিজে এসে গ্রামের মাতব্বরদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্পে খবর চলে গেল। অরবিন্দ মুখার্জি তার সহকারীদের নিয়ে এসে পড়লেন। ফিটন আর ঘোড়া দেখে তিনি তারিফ করলেন অনাদির ব্যবস্থাপনার। অনাদি তখন লরি-ড্রাইভার আর তার ক্লিনারকে নিয়ে শহরে গেল ডাক্তার দেখাতে। সে এক পরিস্থিতি!

অনাদি এখন টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতেই বেশীর ভাগ সময় বসে। ওর মানুষের পেছনে লাগার ক্ষমতার বাস্তবিক তুলনা হয় না। সেদিন হেক্‌টিক্‌ শুটিং করতে করতে দিলীপ মুখার্জি দেখি এক ফাঁকে অনাদিকে থ্রেটন্‌ করছেন—ভেবেছ প্রোডিউস্যার হয়েছ বলে তুমি পার পেয়ে যাবে? তোমায় একদিন আমি এইস্যা টাইট দেব যে হাড়ে হাড়ে বুঝবে—

অথচ দেখুন তাতে কোন ভাববিকার ঘটল না ওর। হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ করে হাসতে থাকল।

বিরক্ত দিলীপ মুখার্জি শেষে বললেন—বাস্তবিক তুমি যে কি একটা চিজ আমি আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারলাম না…

বাচ্চাদেব নিয়ে ফিল্মের শুটিং করা মানে পরিষ্কার একটা লঙ্কাকাণ্ড বেধে যাওয়া। এ-ব্যাপারে আমার ভয়ঙ্কর কিছু অভিজ্ঞতা আছে। আমাদের এখানে বেশীর ভাগ পরিচালক শিশুদের ট্যাকেল করতে অক্ষম। আসলে শিশুরা অ্যাকটিং বোঝে না, ক্যামেরার সামনে নিজের খেয়াল-খুশীমাফিক যা করে—দর্শকদের তাই-ই ভাল লাগে। চার্লি চ্যাপলীন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, শিশুরা সেরা শিল্পী। জাতশিল্পী। ওদের কাছে বড়রা শিখতে পারে……।

চার্লি চ্যাপলীন তাঁর 'দি কিড' ছবিতে জ্যাকি কুগান নামক সেই শিশুটিকে দিয়ে যা করিয়েছিলেন, সমগ্র পৃথিবীর চলচ্চিত্র তা আজও স্মরণে রেখেছে। ওই ছবিতে জ্যাকি কুগান কখনও অভিনয় করেছে বলে মনে

হয় না। শিশুদের ব্যাপারে যে পরিচালক যত 'সেন্স অফ র‍্যাপর' দেখাতে পারবেন, তিনি ততই বাজি মাৎ করবেন। ইদানিং বাচ্চাদের ম্যানেজ করার অবিশ্বাস্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন আমাদের তরুণ মজুমদার। ওঁর ছবিতে শিশুরা যত স্বতঃস্ফূর্ত—অন্যের ছবিতে কিন্তু ততটা নয়। এ-ব্যাপারে তরুণ মজুমদার বিস্ময়কর ক্ষমতা ধরেন।

চালি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'একটা দু' বছর বয়স্ক মানবশিশু এমন কিছু করতে পারে যা দেখে আপনি হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়তে পারেন। আপনি প্রথমে একটা বাথটব সংগ্রহ করুন। তাতে জল ঢালুন। তারপর সেই জলে এক টুকরো রঙীন সাবান ফেলে দিন। তারপর ক্ষুদে শিল্পীটিকে সেই টবে বসিয়ে দিন। এবং দেখতে করতে থাকুন- কাকে বলে কমেডি। শিশুটি প্রথমে লক্ষ্য করবে যে জলে রঙীন কি একটা যেন পড়ে আছে। এবার ওটা সে তুলতে চেষ্টা করবে। অসম্ভব। জল থেকে সাবান তোলা চাট্টিখানি কথা নয়। ওটা বারে বারে ওর হাত থেকে পিছলে যাবে। তখন ও দুহাতে ওটা ধরবার চেষ্টা করবে। আর এই সময় শিশুটি মুখের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করুন—ওঃ কতরকম পাঁয়তাড়া, কতরকম প্রক্রিয়া। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর ও যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে দেখবেন স্রেফ ভ্যাক করে কেঁদে ফেলছে।'

এটা হচ্ছে একটা নির্জলা কমেডি। আপনারা পরখ করে দেখতে পারেন। আমি নিজে করেছি এবং অপ্রত্যাশিত ফল পেয়েছি। দর্শকরা হেসে কুটিপাটি হয়েছেন।

আজকে মৌসুমী বড় হয়েছে, কিন্তু এই মৌসুমীই টালিগঞ্জ পাড়ায় রীতিমত টেরার ছিল একদিন। নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর পাশে একটা গার্লস স্কুলে ও তখন পড়ত। আর ফাঁক পেলেই স্কুল পালিয়ে স্টুডিওতে চলে আসত। ইন্দুকে স্টুডিওর কে-না চিনত। সর্বত্র ওর অবাধ গতিবিধি ছিল। ফ্রক-পরা টুরটুরে মেয়ে বকবক করছে সর্বক্ষণ, এই মেয়েটিকে স্টুডিওর দ্বারোয়ানরা ভয় করত সব চাইতে বেশী। একবার মনে আছে, একটা ছবির শুটিং চলছে, গোলঘরে বসে তরুণকুমার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে

আড্ডা দিচ্ছেন হঠাৎ সেখানে ইন্দুর আগমন। তরুণকুমার ওকে আদর করে ডাকতেন 'নেড়ি'। ফলে নেড়ি বিষম চটিতং।

চোখের সামনে সেই নেড়ি ঘুরঘুর করছে দেখে তরুণকুমার ডাকলেন--এই নেড়ি, ফের ক্লাস পালিয়ে স্টুডিওয় এসেছিস? পালা—

ইন্দু সে-কথায় ভ্রুক্ষেপই করল না।

তার নজর তখন স্টুডিওর বড় পেয়ারা গাছটার দিকে। মগডালে কয়েকটা পেয়ারা বেশ ডাঁশা হয়েছে। ওর চিন্তা কি করে ওগুলো পাড়া যায়। লগিতে হল না দেখে ইন্দু হঠাৎ গাছে চড়াই মনস্থ করল। আর ইন্দু গাছে চড়ছে দেখে দ্বারোয়ানরা হৈ-হৈ করে উঠল—মৎ উঠো মৎ উঠো, গিরে যাবে—

কিন্তু কে-কার কথা শোনে, ইন্দু ততক্ষণে লাফিয়ে উঠেই পড়েছে। তরুণকুমার ওর কাণ্ড দেখে স্তম্ভিত।—দেখ দেখ পাগলীর কাণ্ড দেখ, গাছে চড়েছে অ্যাই অ্যাই শিগগীর নাব্ বলছি, পড়ে হাত-পা ভাঙবি যে—

ইন্দু সেই মগডাল থেকে মুখ ভেংচে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল—তাতে তোমার কি?

তরুণকুমার চটে ফায়ার।—দাঁড়া আজ তোকে মজা দেখাচ্ছি। এই, একজন গিয়ে স্কুলে এট্টা খবর দাও তো—ইন্দু গাছে চড়েছে, বললে কথা শুনছে না—

ইন্দু ওখান থেকে হুঙ্কার দিল—যে যাবে আমি তার ঠ্যাং খোঁড়া করব কিন্তু—

—বটে?

—নিশ্চয়।

তরুণকুমার হেসে ফেললেন।—আচ্ছা আচ্ছা তুই নাব, নেমে আয় আমি পেয়ারাগুলো পাড়িয়ে দিচ্ছি কাউকে দিয়ে—

—ঠিক তো?

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ—

ইন্দু অতঃপর নেমে এলো। তারপর একজন দ্বারোয়ান লগি চালিয়ে

পেয়ারাগুলো পেড়ে ওর হাতে দিতে সব শান্তি।

তরুণকুমার তখন সস্নেহে বললেন—হ্যাঁরে, এই যে সব কাণ্ড করিস্ বাড়িতে কেউ বকে না?

ইন্দুর কি ঝাঁঝালো জবাব।—বকেই তো। আর তাতে আমার কচু।

গোড়ার দিকে ইন্দু এইরকম ডানপিটে মেয়ে ছিল। ওদের স্কুলের সামনে একটা আচারওলা বসতো। একা ইন্দুই তার প্রায় তেরটা বাজিয়ে দিয়েছিল। একদিন দুপুর বেলা যাচ্ছি, একটু আগে স্কুলের টিফিন শেষ হয়েছে। দেখি সেই আচারওলাটা কেঁউ কেঁউ করছে। বলা বাহুল্য, ইন্দুই আসামী। কিসব কাণ্ড করে গেছে যে বেচারির হাড়ির হাল।

বললাম—যাও কেঁউ কেঁউ না করে হেডমিস্ট্রেসের কাছে গিয়ে নালিশ করে এসো—

আচারওলা সভয়ে তৎক্ষণাৎ বলল—আরিপবাপ, ইন্দুদিদিমণি তাহলে আমায় আর আস্ত রাখবে না, থান ইট ঝাড়বে।

একদিন তরুণকুমার ওকে পাকড়াও করে সহাস্যে বললেন—হ্যারে ইন্দু, তুই আমায় বিয়ে করবি?

ব্যস, মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মুখ বেঁকিয়ে জবাব দিল—ইঃ, তোমায় কেন বিয়ে করব? বিয়ে করলে বরং তোমার দাদা উত্তমকুমারকেই করব। তোমার চাইতে হাজার গুণে দেখতে ভাল—

তরুণকুমার' থ।

আর এই ইন্দুকেই শেষ পর্যন্ত ফিল্মে নিয়ে এলেন পরিচালক তরুণ মজুমদার। 'বালিকা বধু' ছবিতে। তরুণ মজুমদার তাঁর ছবির জন্যে নায়িকা খুঁজছিলেন কিন্তু পাচ্ছিলেন না। একদিন উনি ওঁর ফ্ল্যাটের ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে নীচের রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছেন। এমন সময় ঢং-ঢং ঘণ্টা বাজিয়ে গার্লস স্কুলের ছুটি হলো। সঙ্গে সঙ্গে সামনের রাস্তাটা ছাত্রীদের ভিড়ে বোঝাই হয়ে গেল। কলরব করতে করতে দলে দলে মেয়েরা বাড়ি ফিরছে। স্কুলের পাশে ছোট্ট একটা মনোহারি দোকানে একদল মেয়ে ঢুকেছিল। সেখানে কি যেন একটু হট্টগোল। তরুণ মজুমদার দেখলেন—

দোকানদার যেন আর নেই, সে বেচারি কাঁচুমাচু হয়ে তার লজেন্সের বোয়েমগুলো সামলাচ্ছে আর একদল মেয়ে ঝামেলা করছে, হেসে কুটোপাটি হচ্ছে। আসলে লজেন্স ঝেড়ে দেবার ধান্দায় ছিল। মতলব বুঝতে পেরে দোকানী দুহাতে বয়েম আগলাচ্ছে—অ্যাই অ্যাই কি হচ্ছে কি হচ্ছে—আওয়াজ দিয়ে। কিন্তু নেত্রীস্থানীয়া মেয়েটি তারই মধ্যে কিছু হাতিয়ে সটান মুখে চালান করে দিয়েছে—বলে দেব দিদিমণিদের গিয়ে সব বলে দেব—আরে যাও যাও বললে আমাদের কচু হবে, এখন একটা দুটো নিচ্ছি তখন বয়েম সমেত তুলে নিয়ে যাব—এইসব কাটাকাটা সংলাপ বিনিময় হচ্ছে। তারপর ওরা দল বেঁধে রাস্তায়। একটা ডোণ্ট কেয়ার ভঙ্গি। পেছনে স্টেটবাস হর্ণ দিচ্ছে। কিন্তু সরতে ওদের যেন ভারি বয়েই গেছে। এই দেখে তরুণ মজুমদার ভাবলেন—কে এই মেয়েটি? একবার খোঁজ করতে হয়……

স্টুডিওর দ্বারোয়ানই বলে দিল—ওই খোকি তো? ওর নাম ইন্দু। লেকিন বড়া খতরনাক লেড়কি। ইঁটা-উঁটা মারে বাবুজী—

সেই মেয়ে তরুণ মজুমদারের কাছে, চোখের সামনে দেখলাম, কেমন অদ্ভুত বশ মেনে গেল। এটাই র‍্যাপোর। শিশুদের বোঝা বুঝে সেইমত কাজ করা। ইন্দুর নাম বদলে গেল—মৌসুমীর জন্ম হল—সে মেয়ে আজ বোম্বের ফিল্ম জগত কাঁপাচ্ছে, দেখলে সত্যি তাজ্জব হতে হয়।

বিশ্বজিতের ছেলে প্রসেনজিৎ। ছোট্ট জিজ্ঞাসা ছবিতে প্রথম অভিনয় করল। তখনও মুখের আড় ভাঙেনি ভাল করে। ফুটফুটে বাচ্চা। মায়ের কোলে চেপে স্টুডিওতে আসত যেত। ক্যামেরার সামনে ও যা-ই করেছে দর্শকেরা তা মুগ্ধ হয়ে দেখেছে।

এই তো মাত্র কিছুদিন আগের কথা। প্রসেনজিৎ ওর বাবার একটা ছবিতে অভিনয় করছে। তাও আবার বাবারই ছোটবেলার চরিত্রে। যখন চিত্রনাট্য লেখা হয়, ও বাবাকে আব্দার করেছিল, বাপী ওই পার্টটা কিন্তু আমি করব।

বিশ্বজিৎ প্রথমে কিছুতেই রাজী হননি। এখন এই বয়সে অভিনয়

করতে নামলে পড়াশুনোর বিশেষ ক্ষতি হবে, স্কুল কামাই হবে। কিন্তু ছেলে কিছুতেই ছাড়বে না। শেষে প্রায় কান্নাকাটির অবস্থা। তখন বিশ্বজিৎ আফটার অল আর পাঁচজনেরই মত একজন স্নেহান্ধ পিতা, শেষ পর্যন্ত তাঁকে রাজী হতেই হলো। তবে শর্ত রইল—পড়া বা স্কুল কামাই করা চলবে না। প্রসেনজিৎ হাসিমুখে তাতেই রাজী।

বিশ্বজিৎ নিজের ছেলেমেয়েকে প্রাণাধিক ভালবাসেন। ভদ্রলোক বেশীরভাগ সময় থাকেন বোম্বেতে, কিন্তু মন পড়ে থাকে এখানে। 'ছোট্ট জিজ্ঞাসা' ছবির পর বুম্বাকে (প্রসেনজিতের ডাকনাম) অনেকেই ছবিতে নিতে চেয়েছেন, কিন্তু বিশ্বজিৎ রাজি হননি। ছেলের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েই তিনি অরাজি হয়েছেন। না হলে ভারতীয় চলচ্চিত্রে প্রসেনজিৎ অ্যাদ্দিনে নিজের একটা সুন্দর জায়গা করে নিতে পারত, হয়ত অনায়াসেই।

এখন যে-ছবির প্রসঙ্গে বলছি, সে ছবিতে একটা দৃশ্য ছিল এইরকম যে প্রসেনজিৎ রাত্রের অন্ধকারে ছুটতে ছুটতে এসে দেখবে গ্রামের লম্পট জমিদার তার দিদিকে ধর্ষণ করতে গিয়ে হঠাৎ খুন করে বসেছে। ঘটনাস্থল গ্রামের একটি পোড়ো কালীমন্দির। আর এই দৃশ্য দেখে প্রসেনজিৎ ক্রোধে জ্বলে উঠবে তারপর মন্দিরের প্রাঙ্গণে পড়ে থাকা পাঁঠাবলির খাঁড়াটি তুলে নিয়ে সেই শয়তান জমিদারের গলায় বসিয়ে দেবে জমিদারের মৃত্যু ঘটবে।

এই দৃশ্যটি প্রথমে কথা ছিল স্টুডিওর মধ্যেই টেক করা হবে। কিন্তু সুপ্রিয়া দেবীর (দিদির ভূমিকায়) শুটিং ডেটের কিছু গণ্ডগোল হওয়ায় স্টুডিওর বদলে স্থির হল ওটা বিশ্বজিতের দমদমের বাড়ীর লনে টেক করা হবে। আর্ট ডিরেকটার তাঁর মালপত্র নিয়ে এসে টেনিস কোর্টের মাঠে ট্রিম করা ঘাসের ওপর একটা পোড়ো মন্দিরের সেট তৈরী করে দিলেন।

রাত্রে শুটিং।

ছবির সেই লম্পট জমিদারের চরিত্রে অভিনয় করছিলেন খ্যাতনামা

নট বীরেন চাটুজ্যে। তিনি সন্ধ্যে নাগাদ লোকেশানে পৌঁছে গেলেন। ভদ্রলোক খুব মেজাজী শিল্পী। খুব অমায়িক প্রকৃতি মানুষ। সারাক্ষণ মুখে জর্দা পান।

ট্যাকসি থেকে নেমে সকলের কুশল সংবাদ নিয়ে আমাকে ইসারায় কাছে ডাকলেন—ইয়ে, মালপত্র সব এসে গেছে?

আমি অবাক।—কি মালপত্র?

—খাঁড়া?

—খাঁড়া। হ্যাঁ এসেছে বলেই তো জানি।

বীরেন চাটুজ্যে বললেন—তাহলে ওটা আমি একবার দেখব।

—কোনটা?

—ওই যে বললাম, খাঁড়াটা?

আমি হতভম্ব।—সেকি? খাঁড়া দেখে আপনি কি করবেন?

বীরেন চাটুজ্যে বললেন—পরীক্ষা করে দেখব ওটা আসল না নকল! দেখ ভাই পাঁচটা ছবিতে অ্যাকটিং করে খাই, বেঘোরে প্রাণটা হারাতে চাই না। খাঁড়ার কোপ মারবে বুম্বা, ভাই বাচ্চা ছেলে কি হতে কি হয়ে যায় তার নেই ঠিক। সেইজন্যেই মালটা একবার চেক করে দেখা দরকার। তুমি একবার ওটা আনাও।

প্রোডাকশনের একজনকে বলতে সে খাঁড়াটা নিয়ে এল। আর সেটা দেখে আমারও চক্ষুস্থির। আরে এটা যে বাস্তবিক আসল খাঁড়া। রীতিমত ধারালো। আলো লেগে চকচক করছে। বীরেন চাটুজ্যে তো চটে ফায়ার—দেখলে কি কাণ্ড, এটাই আমি ভয় পেয়েছিলাম। আমায় এক্ষুণি ট্যাকসি ডেকে দাও ভাই আমি বাড়ি ফিরে যাব।

—আরে দাঁড়ান দাঁড়ান, এ-খাঁড়া তো শটে বাস্তবিক দেওয়া যেত না, নিশ্চয়ই অন্য কোন দামী খাঁড়া আনা হয়েছে, আপনি তা বলে চলে যাবেন কেন?

খবর নিয়ে জানা গেল—হ্যাঁ, একটা কাঠের তৈরী খাঁড়া এসেছে রিকুইজিশান মাফিক। আর সেটাই শটে বুম্বার হাতে দেওয়া হবে।

বীরেন চাটুজ্যে মুখের কথা মানতে রাজি নন, অতএব তাঁকে সেই ডামী এনে দেখাতে হল। উনি সেটা হাতে নিয়ে ভাল করে পরখ করে বললেন—না ঠিক আছে। তবে ভাই ওই ওরিজিনাল মালটিকে হাটিয়ে দাও। ধারে-কাছে কোথাও রেখ না। বাচ্চা ছেলে বলে একটা কথা। ঝোঁকের মাথায় নিয়ে নিলে 'বল হরি' হয়ে যাবে।

বীরেন চাটুজ্যে অভিজ্ঞ মানুষ। আগে মাইথোলজিক্যাল ছবিতে ওঁর রাবণের পার্ট বাঁধা ছিল। খলনায়কের পার্ট বীরেন চাটুজ্যের অভিনয়ে বেশ খোলতাই হয়। একবার দুঃশাসনের পার্টে কি হেনস্থা, দ্রৌপদীকে নাকাল করছেন। করছেন শটের পর শট, ভাল উৎরে যাচ্ছে, একটা শটে আছে দ্রৌপদী আর সইতে না পেরে জলভরা চোখে নারায়ণের উদ্দেশ্যে কাতর সংলাপ ছাড়বেন, এখন হয়েছে কি ইন রিয়ালিটি সেই অভিনেত্রীর শিশুসন্তান তখন ফ্লোরে উপস্থিত ছিল। সে অনেকক্ষণ ধরে মায়ের এই হেনস্থা সহ্য করছিল। কিন্তু ওই শটে সে যেন আর সামলাতে পারল না। হঠাৎ দৌড়ে এসে দুঃশাসনের হাতে বসিয়ে দিল এক রাম কামড়। বীরেন চাটুজ্যে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ধপাস করে বসে পড়লেন ফ্লোরে। সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরা বন্ধ করে দেওয়া হল। সারা ফ্লোর জুড়ে হৈ-হৈ পড়ে গেল। ছেলেটি ততক্ষণ মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে কান্না জুড়ে দিয়েছে।

বীরেন চাটুজ্যে তখন মহিলাটিকে বললেন—কি কাণ্ড বলুন তো! সঙ্গে বাচ্চা এনেছেন সেটা বলবেন তো! এটা জানা থাকলে আজ কোন শালা দুঃশাসন হয়, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির সেজে বসে থাকতুম······

বুম্বা এসেছিল। বীরেন চাটুজ্যে তাকে যথেষ্ট আদর-টাদর করলেন। বললেন—বুম্বা যাই কর মনে রেখ খাঁড়াটা তুমি কিন্তু পাঁঠার গলায় ঝাড়ছ না—মানুষের গলায় ফেলছ। হলেও কাঠের তৈরী, সাবধানে ঝেড় কিন্তু। বুয়েচো?

আমার মনে আছে গভীর রাত্রে যখন সেই দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ চলছে তখন বীরেন চাটুজ্যের চোখ দুটি জিনিসের ওপর ক্রমান্বয়ে গোয়েন্দাগিরি করে চলেছে দেখলাম: এক—প্রসেনজিৎ এবং দুই—কাঠের খাঁড়া। শেষ

মুহূর্তে উনি নিজে এসে হাঁড়িকাঠের কাছে ফেলে রাখা খাঁড়াটা পরখ করে গেলেন এবং নিজেকে শুনিয়েই যেন বললেন, ধুস শালা। তারপর ঘাড় চুলকে গিয়ে শট দিলেন, আতঙ্কটা মনে মনেই রইল।

স্মরণ হচ্ছে, একদিন শুটিং-এর লাঞ্চ ব্রেকের পর হঠাৎ বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেল। সবাই বিরক্ত হয়ে ফ্লোর থেকে বেরিয়ে এসে স্টুডিওর গোলঘরের বেঞ্চিতে বসলেন। প্রোডাকশন ম্যানেজার দৌড়ে গেলেন ইলেকট্রিক সাপ্লাইতে ফোন করতে। জানা গেল—বিদ্যুৎ ফেরার ব্যাপারটা এখন খুবই নাকি অনিশ্চিত। কোথায় ব্যাণ্ডেল না দুর্গাপুরের মেশিন ব্রেকডাউন হয়েছে। ছবির শিল্পীদের মধ্যে সেদিন ছিলেন উত্তমকুমার। তিনি এই সংবাদ শুনে মুচকি হাসলেন মাত্র, কোন মন্তব্য করলেন না।

ছবির প্রযোজক এবং পরিচালক সবাই বিব্রত, বিভ্রান্ত। টানা শুটিং করতে করতে এভাবে হঠাৎ কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে প্যাকআপ বলাও সম্ভব নয়। অথচ বিদ্যুৎ কখন ফিরবে কেউ বলতে পারে না। এই উভয় সঙ্কট থেকে শেষে উত্তমকুমার নিজেই ওঁদের বাঁচালেন। উনি হেসে বললেন—ঘণ্টাখানেক দেখা যাক। এর মধ্যে যদি 'পাওয়ার' আসে—শুটিং করে অন্তত আজকের সিডিউলটা তুলে দেবার চেষ্টা করা যাবে। আপাতত কিছুক্ষণ আড্ডা দেওয়া যাক।

শুরু হল আড্ডা। উত্তমকুমার তখন সবে বনপলাশির পদাবলী ছবি রিলিজ দিয়েছেন। সে-ছবির পরিচালক হিসাবে ওঁর যথেষ্ট সুনাম হয়েছে। উনি পরের ছবির জন্যে গল্প খুঁজছেন। সেদিন আড্ডায় ওই প্রসঙ্গে কথা উঠতে একজন টেকনিশিয়ান বললেন, র‍্যাগিং-এর ওপর ছবি করবেন?

—র‍্যাগিং?

—হ্যাঁ, আজ কাগজে দেখেছেন বোধহয়—কলেজ হোস্টেলে র‍্যাগিং সহ্য করতে না পেরে একটি ছেলে সুইসাইড অ্যাটেম্প করেছিল, কিন্তু অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে। ঘুমের ওষুধটা জাল ছিল—

উত্তমকুমার সাগ্রহে সমস্ত ঘটনা শুনলেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—এটা আইন করে বন্ধ করা উচিত। কোন সভ্যদেশে এটা লজ্জাকর ঘটনা। ছাত্ররা স্কুল-কলেজে যায় পড়াশুনো শিখতে—সেখানে র‍্যাগিং-এর মত নিষ্ঠুর ঘটনা কেন ঘটবে? মাস্টারমশাইরা তাহলে রয়েছেন কিসের জন্যে? তাঁরা বাধা দিতে পারেন না?

আমি সিনেমার মানুষ। সমাজতত্ত্বের কোন গভীরে আমার যাওয়া দরকার আমি জানি। এবং দেশের কোন সমস্যা নিয়ে ছবি তৈরী করলে আমাদের সামাজিক দায়িত্ব পূরণ হয়—তাও জানি। কিন্তু র‍্যাগিং-এর মত সমস্যা নিয়ে ছবি করার মানসিকতা এখনও যেমন চিত্র নির্মাতাদের হয়নি, দর্শকদেরও হয়নি।

নাম করব কী? নাঃ থাক। আমি জানি—আমাদের একজন জনপ্রিয় অভিনেতার পারিবারিক অশান্তির মূলেই রয়েছে ওই র‍্যাগিং ব্যাপারটা। ভদ্রলোকের বড় ছেলে—পড়াশুনায় বরাবরই ভাল—ওকে সেবার 'সৈনিক স্কুলে' পাঠানো হয়েছিল—উচ্চশিক্ষার জন্যে। কিন্তু ছেলেটি সেখানে টিকতে পারেনি। র‍্যাগিং-এর যন্ত্রণায় একদিন সেখান থেকে পালিয়ে সোজা কলকাতায় চলে এসেছিল। রাত জাগা লাল চোখ। চুল উস্কো খুস্কো। ভয় পাওয়া চেহারা।

অভিনেতা তখন শুটিং করতে স্টুডিওয় যাবেন বলে সবে গাড়ি স্টার্ট দিয়েছেন। ছেলেকে হঠাৎ ওইভাবে আসতে দেখে তিনি তো অবাক। কী ব্যাপার?

ছেলে প্রথমে কিছুই বলতে চায় না।

ছেলের মা'তো রীতিমত ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁর ছেলে এমন কাণ্ড ইতিপূর্বে কখনও করেনি। বাবা অভয় দিলেন—খুলে বলোতো কি হয়েছে? হঠাৎ চলে আসবার মত কি হলো ওখানে? কেউ তোমাকে কিছু বলেছেন? ওখানে থাকতে কোন অসুবিধা হচ্ছিল তোমার?

অনেক পীড়াপীড়ির পর ছেলে শেষ পর্যন্ত সব খুলে বলল। সহপাঠীরা একের পর এক কিভাবে তার ওপর নির্যাতন করেছে। এবং সবটাই

নাকি র‍্যাগিং করবার অজুহাতে।

অভিনেতা ভদ্রলোক সব শুনে স্তম্ভিত। স্কুল-কলেজে র‍্যাগিং হয়, এটা অনেকেরই জানা, কিন্তু ছেলের মুখে যা শুনলেন—সেটা প্রায় অবিশ্বাসের পর্যায়েই পড়ে? ঠাট্টা বা ইয়ার্কি নয়, রীতিমত শারীরিক অত্যাচার, মুখের খাবার নষ্ট করে দেওয়া, দল বেঁধে হুটিং করা, যখন-তখন র‍্যারাকিং করা—এগুলোই র‍্যাগিং।

শুটিং তখন মাথায় উঠেছে। ভদ্রলোক তখনই লেটার প্যাড টেনে নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষকে কড়া ভাষায় চিঠি লিখতে বসলেন—আপনাদের নাকের ডগায় এমন জঘন্য কাণ্ড হচ্ছে, অথচ আপনারা উচ্চবাচ্য করছেন না? আমার ছেলে নয়, আরও কত ছেলে রয়েছে ওখানে, তাদের মনের ওপর এটা মানসিক দিক দিয়ে কি ভীষণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে— তা ভেবে দেখা উচিত……

. জানি না সেই চিঠির ফলে হোস্টেলে র‍্যাগিং প্রথা বন্ধ হয়েছে কি না—কিন্তু খবরের কাগজে প্রায়ই যখন র‍্যাগিং সংক্রান্ত চিঠিপত্র প্রকাশিত হতে দেখি—এমন কি ইন্সটিটিউশনের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোন ছাত্রের অভিভাবককে যখন কোর্টে কেস করতে দেখি—তখন সত্যিই চিন্তা হয়। উচ্চশিক্ষার তাগিদে আপনার প্রিয় সন্তানকে দূরের কোন হোস্টেলে রেখে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন কী?

পার্থপ্রতিম চৌধুরী আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একদিন ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে দেখি পার্থরা একদল বসে আড্ডা দিচ্ছে। আমায় ওরা হৈ হৈ করে ডাকল। ব্যস, আমার কাজের দফা-রফা। তৎক্ষণাৎ গিয়ে গরম চায়ের কাপ আর জ্বলন্ত সিগারেট বাগিয়ে বসে গেলাম সিনেমাটিক আড্ডায়। বলে রাখি, এসব আড্ডা স্টুডিওর বাইরে কখনও হয় না। কারণ বাইরের লোক এর মজা বুঝতে পারবে না। পার্থ খুব রোমান্টিক মানুষ। প্রায়ই এর ওর বা তার সঙ্গে প্রেম করছে। তবে সে প্রেম কখনও স্টেডি নয়। বড়জোর দুচার মাস। তারপরই ভো-কাট্টা। তবে ফিল্মের এই জাতীয় প্রেমে কিন্তু কোন ইল-ফিলিঙস থাকে না। খুব

সহজভাবে নেয় সবাই।

তখন ছায়াছবির গল্পের ম্যারাথন সেশান চলছে ওখানে। একজন বলল—শালা ভূতের গল্পের মার নেই। কবে কোনকালে নরেশ মিত্তির মশাই 'কঙ্কাল' নামে একখানা ভূতুড়ে ছবি করে গিয়েছিলেন—সে-ছবি আজও পয়সা দিচ্ছে। সোজা ব্যাপার?

আর একজন তৎক্ষণাৎ তাকে সমর্থন করে বলল—ভূতের গল্প নিয়ে ছবি সারা পৃথিবীতেই হয়েছে। এখনও হচ্ছে। ভবিষ্যতেও হবে। দর্শকরা যতই আধুনিক ছবি আধুনিক ছবি বলে চীৎকার করুক, একখানা ভূতুড়ে মার্কা ছবি তৈরী হোক, অমনি দেখবে লুকিয়ে লুকিয়ে ইভনিং শো-তে একটা ট্রিপ মেরে এসেছে। কিন্তু মুখ ফুটে স্বীকার করবে না যে দেখেছে। তখন যত অন্তোনিয়নি, বার্গম্যান আর পোলানস্কির খৈ ফোটাবে—

ঠোঁট কাটা জয়ন্ত বলল—ইন্টেলেকচুয়ালরাই বোম্বের হিন্দী ছবি বেশী করে দেখে। ওখানে সেকস আর ভায়োলেন্সের বেশী সুড়সুড়ি কি না—

পার্থ হেসে বলল—তবে একটা কথা তোমরা জানো কি? ভূতের ছবিতে একটা সাংঘাতিক ব্যাপার আছে। ওসব ছবি মফঃস্বলের সিনেমা হাউসে কেবল ম্যাটিনী শো-তে ভাল চলে। অথচ ইভনিং বা নাইট শো-তে একেবারে দর্শক থাকে না। এমনকি হলের অপরেটররা ছবি চালিয়ে দিয়ে চুপটি করে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে—পর্দায় প্রোজেকশন দেখতে চায় না। রাত-বিরেতে দু' ক্রোশ অন্ধকার মেঠো পথ ভেঙে বাড়ি ফিরতে হবে না? তখন পেছন থেকে নাকি সুরে কেউ যদি—অ্যাঁই ব্যাঁটা, দু'রীল ছঁবি কম দেখালি কেনরে—বলে বসে—আইবাপ—

যথার্থ। মফঃস্বল তো আছেই, এই খোদ কলকাতা শহরে? একজন সিনেমা হলের মালিক আমায় একবার অকপটে বলেছিলেন—উঁহু, ভূতের ছবি হলে নাইট শো একেবারে ফাঁকা। কেউ সাহস করে দেখতে চায় না। হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা, ভূতকে সবাই ভয় করে। এখনও। এই দারুণ

সিনেমাটিক যুগেও। পার্থ মুখ ভ্যাঙ্গাল—আর কোথায় তোমরা আর পেত্নীর রোমান্টিক স্টোরী করতে চাইছ। ওসব ছবি করলে মরে ভূত হয়ে যাবে কিন্তু—

ব্যস, ভূত অমনি রুল আউট।

আর তখুনি আমি কিউ দিলাম—পার্থ সেই যে একটা গল্প শোনাবি বলেছিলিস, র‍্যাগিং নিয়ে···

—কোন গল্প? পার্থ ভ্রূ টুইস্ট করল।

আমি তখন একজন নায়িকার নাম করলাম। —ওঁর কাজিন সিস্টার না কে একটি মেয়ের ঘটনা! সেই যে এডিটিং করতে করতে তুই হঠাৎ টেলিফোন পেযে প্রেম করতে চলে গেলি, আর বলে গেলি অন্য একদিন শোনাবো। এখন মনে পড়ছে

পার্থ সিগারেট ধরিয়ে খানিকটা ভাবল। তারপর সহসা ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মনে পড়ে গেছে। এবার ও ঘটনাটা বলতে পারে। তবে বারগেনিং? বললাম, আচ্ছা, রইল একদিন চ্যাঙ্গওয়া—

—উইথ আর উইদাউট?

—উইথ। তবে আমি কিন্তু অফ—

পার্থ মৃদু হাসল।

তারপর গল্পটা বলল। কলকাতার একজন নামী ফিল্ম অ্যাকট্রেসের নিকট আত্মীয়া সেই মেয়েটি, যাকে নিয়ে এই কাহিনার বাইশ তেইশ বছর বয়স। ভীষণ নরম স্বভাবের মেযে। গান-বাজনায় বেশী উৎসাহ। ভাল রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারে। লাজুক প্রকৃতির বলে সে গান বাইরের লোকেরা কদাচিৎ শুনতে পায়। স্বাস্থ্য ভাল নয়। ক্ষণজীবী। সেই মেয়ে ভালভাবে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করবার পর, বাবার হঠাৎ কি মনে হল—তিনি স্থির করলেন মেয়েকে ডাক্তার তৈরী করবেন। ফ্যামিলীতে ইঞ্জিনীয়ার আছে। ব্যারিস্টার আছে। ব্যবসাদার-শিল্পপতি আছে। অধ্যাপক আছে। নেই শুধু ডাক্তার। এই মেয়েকে সেই অভাবটা পূরণ করতে হবে। এই হচ্ছে বাবার ডিসিশান।

এখন মেয়ে কখনও ডাক্তার হবার কথা কল্পনা করেনি। সে মনে মনে চেয়েছিল রবীন্দ্রভারতীতে যাবে, সাহিত্য-শিল্প নিয়ে পড়বে। মা অন্তত তাই বুঝিয়ে বললেন বাবাকে। বাবা তখন ডেকে পাঠালেন মেয়েকে। তারপর সহাস্যে—ডাক্তারী তো নোবেল প্রোফেশ্যান, মানুষের সেবা করা, সেটা ভাল হত না?

মেয়ে চুপ। কি করে সে বোঝায় বাবাকে।

—কি? যদি ইচ্ছে না করে তো আমি জোর করব না।

মেয়ে তখন অস্ফুটে বলল—ইচ্ছে থাকবে না কেন···বেশ আমি ডাক্তারীই পড়ব—

বাবা খুশী হলেন মেয়ের কথায়। অত তলিয়ে দেখলেন না। য ব্যস্তবাগীশ মানুষ।

তদ্বির তদারকে ফল ফলতে দেরী হল না। ছাত্রী হিসাবে ভাল। তাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে কোন অসুবিধা হল না। মেয়ে ডাক্তারীর কোর্সে ঢুকে পড়ল মাস না ঘুরতেই।

বাড়ি থেকে লেখাপড়া চালানো অসম্ভব। মেয়ে তাই হোস্টেলে চলে গেল। কলকাতা শহরের এপ্রান্ত-ওপ্রান্ত। সুতরাং হোমসিক হবারও কথা নয়। এমনিতে বাড়ির সবাই তাই খুব খুশী হল।

ডাক্তারী কলেজে তখন পুরোদমে সেশান আরম্ভ হয়েছে। নতুন বছরের ছাত্র-ছাত্রীরা এসে যোগ দিয়েছে। ক্রমে ক্রমে আলাপ-পরিচয় হচ্ছে। সবাই নিজের নিজের বন্ধু-বান্ধবী বেছে নিচ্ছে। পরিবেশটা অল্প অল্প সয়ে আসছে মনের দিক দিয়ে।

—মেয়েটি—

বাধা দিয়ে আমি—আহা, নামটা একবার বলই না—

পার্থ বলল—নাম দিয়ে কি হবে? যা হোক একটা ধরেই নাও না—

—কি রকম হবে একটা বল—

পার্থ বলল—আচ্ছা ধর মেয়েটির নাম জয়ন্তী।···জয়ন্তী সহজে কিন্তু মিলে-মিশে যেতে পারল না। পারা সহজ নয়। এমনিতে জয়ন্তী খুব

অ্যাট্রাকটিভ নয়, তাই কেউ প্রথম প্রথম আমলও দিল না। হোস্টেলের দোতলার শেষ প্রান্তে একটা ঘরে থাকে। নিজের রুচী অনুযায়ী ঘর সাজিয়ে নিয়েছে সে। বাড়ি থেকে তানপুরা বয়ে এনেছে। অবসর সময়ে দরজা বন্ধ করে বসে নীচু গলায় তানপুরা ছেড়ে গান গায়। না হয় চুপচাপ জানলার কাছে বসে বাইরের আকাশ-গাছপালা-পাখীদের ব্যস্ততা দেখেই সময় কাটায় সে।

এখন হোস্টেলের একদল ছেলেমেয়ের নজরে পড়ল ও—এই মেয়েটি কে রে? বড্ড নাক উঁচু যেন! কারও সঙ্গে মেলামেশা করে না বড়!

ওরা স্থির করল, কারেক্ট, একেই একটু র‍্যাগ করতে হবে।

র‍্যাগিং ব্যাপারটা পুরোদস্তুর ইংরিজী। স্কুল-কলেজের নিউ-কামারদের ক্ষেত্রে পুরোনো ছাত্ররা এটা প্রয়োগ করে তার প্রধান কারণ নাকি তাতে নবাগতদের প্রাথমিক আড়ষ্টতা ভেঙে যায়। এবং দু-তরফের সম্পর্ক নাকি সহজ হয়ে আসে।

অথচ জয়ন্তী ঘুণাক্ষরেও টের পেল না যে সে কলেজ র‍্যাগিং-এর পরবর্তী টার্গেট হয়ে গেছে। র‍্যাগার্স-রা প্রথমে ঠিক করেছিল—জয়ন্তীর ক্ষেত্রে একটু নরম কিছু করা হবে। কিন্তু দলপতি যে ছেলেটি সে প্রতিবাদ করে বলল—কেন? সবার ক্ষেত্রে যা করা হচ্ছে—এক্ষেত্রেও তাই হবে। জয়ন্তী হাই-ব্রো মেয়ে—ওকে ভাল করে দিতে হবে দাওয়াই—

ওরা নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করে নিল। দলপতি একটা মজার ব্যাপার বলল। শুনে সবাই খুশী খুশী। হ্যাঁ নতুন কাণ্ড হবে একটা। তারপর ওরা একটা দিনক্ষণ স্থির করে ফেলল।

জয়ন্তী সেদিন দুপুরে ক্লাস করেছে। বিকেলে একবার বাড়ি গেছে। সববার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে ফিরতে ফিরতে তার সন্ধ্যে-ই হয়ে গেল। মনটা খুব প্রসন্ন। মা কতকগুলো জিনিষ দিয়ে দিয়েছে। জয়ন্তী ট্যাকসি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে যখন দোতলার বারান্দায় পা দিল—দেখে বারান্দা অন্ধকার বাইরের এই আলোটা খারাপ হয়ে গেছে নাকি? কে জানে। লম্বা বারান্দা। একপাশে সব সার সার ঘর। সব ঘরেরই

দরজা বন্ধ। বন্ধ কেন? এ সময় তো সবাই ঘরে থাকে। দরজা খোলা থাকে। বারান্দায় দু' একজন বসে আলো অন্ধকারে গল্প-স্বল্পও করে। কোথায় গেল সবাই? জয়ন্তী সামান্য অবাক-ই হলো।

ও তখনও বুঝতে পারছে না, প্রতিটি থামের আড়াল থেকে র‍্যাগার্স-রা তার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে; তাদের ঠোঁটে কৌতুকের উত্তেজনায় নিঃশব্দ কড়া হাসি টিপ টিপ করছে।

জিনিসগুলো সামলাতে সামলাতে জয়ন্তী নিজের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বটুয়া ব্যাগ থেকে বের করে আনল ঘরের চাবি। তারপর অন্ধকারে ঠাহর করে করে এক সময় তালাটা খুলে ফেলল। সামান্য চাপ দিতেই ঘরের বড় বড় পাল্লা দুটো ক্যাচ শব্দে খুলে গেল।

জয়ন্তী আপন খেয়ালে ঘরের মধ্যে ঢুকল। অন্ধকার ঘর। সামনের টেবিলে প্রথমে জিনিসগুলো নামিয়ে রেখে হাত দুটিকে মুক্ত করে নিল তারপর পাল্লা দুটো ভেতর থেকে-বন্ধ করে সামান্য দু-পা এগিয়ে ঘরের সুইচ টিপে—

বাইরে র‍্যাগার্সরা মুখ বাড়িয়েছে। ওরা অপেক্ষা করছে একটা সাংঘাতিক কিছুর জন্যে। একটা তীব্র আর্তনাদ বা ওই রকম কিছু শব্দ।

ঘরের ভেতরের আলো ততক্ষণে জ্বলে উঠেছে। দরজার ফাঁক বেয়ে অন্ধকার বারান্দার সেই আলোর এক চিলতে লুটিয়ে পড়েছে—নিথর।

অথচ কোন শব্দ হচ্ছে না তো! একটা মর্মান্তিক স্ক্রীম, জয়ন্তীর দৌড়ে বাইরে ছুটে আসা, একটা ভয়ার্ত মুখ···কই, কোন লক্ষণ তো নেই।

র‍্যাগার্সরা আবডাল থেকে বেরিয়ে এল। পরস্পর মুখ চাওয়া-চাউয়ি করল, ভ্রূ কুঁচকে নিঃশব্দ প্রশ্ন-চিহ্ন ফোটাল মুখে—ব্যাপার কী?

পাঁচ মিনিট গেল, দশ গেল, পনের মিনিট গেল। এবার র‍্যাগার্সদের নার্ভ যেন ফেল করছে। নাঃ, গিয়ে দেখতে হয় একবার। হয়ত বা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। যা দুর্বল মেয়ে, হয়ত বা—

ওরা দল বেধে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর দলপতি ছেলেটি কাঁপা কাঁপা হাতে (ঈশ্বর জানেন—কি দেখব!) দরজায় ঠেলা

দিল। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে গেল।

জয়ন্তী ঘরে ঢুকে আলো জ্বালিয়ে সর্বাগ্রে যেটা দেখতে পেয়েছিল সেটা হচ্ছে একটা মৃত মানুষের ফ্যাকাশে হাত ওর বিছানার ওপর পড়ে আছে। র‍্যাগার্সরা ওটা ওর অজান্তে বিছানায় প্ল্যান্ট করেছিল ঘরের ডুপ্লিকেট চাবি সংগ্রহ করে। আর মৃত মানুষের হাতটা ওরা শব-ব্যবচ্ছেদ ঘর থেকে কয়েক ঘণ্টার জন্যে ধার করে এনেছিল, বেশ একটা মজা হবে বলে······

দরজা খুলে এখন এরা দেখল—জয়ন্তী দরজার দিকে মুখ করে খাটে বসে আছে। তার দৃষ্টিতে একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে গেছে—ওটা অস্বাভাবিক লাগছে এখন। জয়ন্তী সেই মড়ার হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। আর সেই মৃতের হাতের বুড়ো আঙুলটা ক্রমাগত চুষছে। চকচক আওয়াজ হচ্ছে মুখ থেকে। ওরা যে এতগুলো মানুষ ওর সামনে এসে দাঁড়াল—জয়ন্তী তা অনুভব করতেই পারল না।

• তীক্ষ্ণ চীৎকার করে র‍্যাগার্সদের একটি ছেলে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। বাকি সবাই হাত দিয়ে চোখ ঢেকে ফেলল।

কাট-টু-কাট জয়ন্তী এখন রাঁচীর পাগলা গারদে। সম্পূর্ণ উন্মাদ। ওর হাতে 'রবারের তৈরী একটা মানুষের হাত' দিতে হয়েছে। ও সারাক্ষণ সেই রবারের হাতের বুড়ো আঙুলটা চুষে যাচ্ছে···

এর নাম র‍্যাগিং?

আমি সিনেমার লোক, অনধিকার চর্চা হচ্ছে জেনেও এই প্রশ্নটি কি আমি করতে পারি?

চামচাদের কাছে ক্রমাগত গ্যাস খেতে খেতে জনৈক সুপুরুষ ধনী তরুণ নায়কের সহসা গ্যাস্ট্রিক আলসার হবার উপক্রম হতে সে স্থির করল—নাঃ, আর গ্যাস খাব না। গ্যাসের গুঁতোয় প্রচুর টাকা পয়সা এবং পজিশন নয়-ছয় হয়ে গেছে। কাজ-কারবার লাটে চড়েছে। আত্মীয়-স্বজন শুভাকাঙ্ক্ষীরা যে শুনছে সবাই ছ্যা ছ্যা করছে। অতএব নো মোর গ্যাস।

আজই মোসায়েবদের মানা করে দিতে হবে।

যা ভাবা সেইমত কাজ।

সেদিনই সন্ধ্যায় পার্ক স্ট্রীটের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত হোটেলে স্ব-পারিষ বসে ভাল-মন্দ খেতে খেতে নায়ক আচমকা ঘোষণা করল—দেখ, একট কথা আজ তোমাদের স্পষ্ট করে বলছি—আমাকে আর কেউ গ্যাস দিে চেষ্টা করো না। কারণ আমি স্থির করেছি—আমি আর গ্যাস খাব না।

শুনে চামচাদের তো মাথা খারাপ হবার দাখিল! এ আবার কী ধরনের অলক্ষুণে কথা? বড়লোকের ছেলে গ্যাস ছাড়া আর কী খাবে? পৃথিবীতে ওর চেয়ে উপাদেয় খাদ্য কী আছে? চামচারা ভাবে —গ্যাস ছাড়া তাদের তো আর কিছু খাওয়াবারও নেই। তাদের চাকরীই হচ্ছে সময়ে অসময়ে মালিককে ধরে কিছু না কিছু গ্যাস খাইয়ে দেওয়া এখন খোদ, ইনিই যদি সেই গ্যাস গিলতে অস্বীকার করেন, তাহলে তে কেলেঙ্কারী। চাকরী নট। কি হবে?

দুর্ভাবনায় পানীয় আর নামে না গলা দিয়ে। চিলিচিকেন জিভে বিস্বাদ লাগে। এখন হয়েছে কি, বড় চামচা যে, ফিল্ম লাইনের ঘুঘু, সে এক পলক চিন্তা করে বলল—নাঃ, তোমরা কেউ আর গ্যাস দেবার চেষ্টা করো না। উনি আর গ্যাস খাবেন না। কিছুতেই না। তোমরা হাজার চেষ্টা করলেও না।

শুনে নায়ক খুশী। মুখে হাসি ফুটল তার। আর সেই হাসি দেখে হেড চামচা আরও খুশী। যাক, ওষুধ ধরেচে। সঙ্গে সঙ্গে সে আবারো বলল—কখনো না, উনি ওঁর সিদ্ধান্তে অটল, গ্যাস আর খাবেন না। খাবেন না, খাবেন না। দেখি কে ওঁকে গ্যাস দেয়—

চামচাবৃন্দ সমস্বরে বলে উঠল—ঠিক ঠিক, দেখি কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে ওঁকে গ্যাস দেয়! উনি কিছুতেই আর গ্যাস খাবেন না। ঠিক বলেছি কিনা বলুন স্যার?

নায়ক ঘাড় নেড়ে সহাস্যে অনুমোদন করলেন—কারেক্‌ট। আমি জীবনে আর গ্যাস খাব না। দিতে এলেও না।

হেড-চামচা সঙ্গে সঙ্গে বলল—দিতে আসবে মানে? তাহলে আমরা এতগুলো মানুষ রয়েছি কোন কম্মে? গ্যাস আপনি খাবেন না, আজ থেকে এটা ফাইন্যাল। এর আর নড়চড় হবে না।

সিদ্ধান্ত তৎক্ষণাৎ যেন পাকা হয়ে গেল।

তারপর আবার কিছুক্ষণ খানা-পিনায় কাটল। চাকুস-চুকুস ঠুং-ঠাং আওয়াজে ব্যাপারটা তখনকার মত স্থগিত রইল।

এরপর একজন ইনফিরিয়র চামচা কি যেন একটা কথা বলতে যাচ্ছিল। হেড-চামচা তাকে ধমক দিয়ে বলে উঠল—নো নো, গ্যাস দেবার কোন রকম চেষ্টা করো না বৎস। উনি গ্যাস আর খাবেন না। নাথিং ড্যুয়িং!

নায়ক গম্ভীর মুখে বলল—কারেক্ট।

হোটেলের বেয়ারা বিল নিয়ে এসে নায়ককে হাসিমুখে কি একটা বলবার উপক্রম করতেই চামচারা হৈ হৈ করে উঠল—উঁহু উঁহু, একদম না। গ্যাস দেবার কোন রকম চেষ্টা করবে না। উনি আর ওটি খাবেন না মনস্থ করেছেন। তুমি এখন কেটে পড়—

বেয়ারা হতভম্ব। সে বলতে এসেছিল, অমুক হিরোইন একটু আগে ফোন করে জানতে চাইছিলেন যে সাহেব ওখানে আছেন কিনা! এখন বেয়ারা ভাবল—মরুকগে ছাই, আমার আবার কথায় কি কাজ! আমি বিল ধরাতে এসেছি। ধরিয়ে দিয়ে কেটে পড়ি—

চামচারা সেই বেয়ারাকে সেলাম বাজাতেও দিল না। ওটা নাকি এক ধরনের গ্যাস। ক্যাশ খসিয়ে নিয়ে যায়। স্যার আপনি ওটা একেবারে খাবেন না···

এরপর আর কি, চামচারা ঘুরছে ফিরছে আর ঘাড় নেড়ে বলে চলেছে—উঁহু, উনি আর গ্যাস খাবেন না। দিতে এলেও না। বলুন ঠিক বলেছি কিনা স্যার?

সহাস্য অনুমোদন পাওয়া যায় নায়কের—কারেক্ট। এনি থিং বাট নো মোর গ্যাস—

এরপর এমন অবস্থা দাঁড়াল যে তখন আর চামচারা নয়, নায়ক নিজেই

লোকজন ডেকে বলতে শুরু করল—গ্যাস দেবার চেষ্টা করো না, আমি আর কিছুতেই গ্যাস খাব না। ফাইন্যাল।

আর সঙ্গে সঙ্গে চামচাবাহিনী কোরাসে বলে ওঠে—ঠিক বলেছেন স্যার, ভদ্দরলোকের ছেলের এক কথা—গ্যাস আর খাব না।

অনেকদিন বাদে সেবার বোম্বে গেছি। দাদর স্টেশন থেকে বেরিয়ে ট্যাকসি হাতড়াচ্ছি। হঠাৎ সেই নায়কের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমসি মুখে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চেহারা খুব খারাপ হয়ে গেছে। নায়কের সঙ্গে আমার বরাবরই ভাল সম্পর্ক। আমরা বহু ছবিতে একত্রে কাজ করেছি। ও মাঝে মাঝে আমায় ওর থিয়েটারেও টেনে নিয়ে যেত। আর চেষ্টা করতো—থাকগে। এই নায়ক কলকাতায় এক সময় খুব চালু ছিল। নায়িকারাই ওর নাম সাজেস্ট করত। মানে প্রযোজক-পরিচালকরা যাতে সেই ছবিতে ওকে নায়ক হিসাবে নেয়। লাভ? ছিল বৈকি। নায়িকারা মাগনায় কখনও হিরো সাজেস্ট করে না। এ নায়ক অনেক বিদ্যায় পারদর্শী ছিল, বিশেষ করে বায়োস্কোপের নায়িকাদের তুষ্টি বিধানে তখন ওর জুড়ি ছিল না বললেই চলে। সে হচ্ছে অন্য ব্যাপার।

দাদর স্টেশনে দেখা হতে প্রশ্ন করলাম—কি কেমন আছ?

—নেই।

—নেই মানে? শুনলাম তুমি এখানে দু-একখানা ছবি পেয়েছো।

বিরস হেসে নায়ক বলল—শুধু দু-খানা নয়, অনেকগুলোই পেয়েছিলাম। কিন্তু বরাতে টিকল না। ক্যান্সেল হয়ে গেল।

—কেন? আমি রীতিমত অবাক।—ছেড়ে দিলে নাকি?

—না। ছাড়িয়ে দিল। চামচারা। গ্যাস খাব না স্থিরই করেছিলাম, কিন্তু পরে বুঝলাম আসলে ওটাই গ্যাস। ওরা বললে ওই থার্ড গ্রেড হিরোইনের সঙ্গে কাজ করলে মার্কেটে তোমার ডিম্যাণ্ড কমে যাবে। আমি ভাবলাম তাই বুঝি বা! কলকাতায় টপ হিরোইনদের সঙ্গে কম্মো করে এখন এসব আনপড় মেয়েদের সঙ্গে এ্যাকটিং করা বাস্তবিক বিলো দ্য ডিগনিটি—ফট করে ছেড়ে দিলাম। হয় স্যারা (সায়রা) দাও—নতুবা

ফুটে যাও…। ওরা ফুটেই গেল।

—আর চামচারা?

—চামচারা রয়ে গেল। ওরা আর কোথায় যাবে।

আমি তাজ্জব।—এঃ, এভাবে নিজের পায়ে কেউ কুড়ুল মারে? এখানে এসে আবারও চামচা জোটালে?

—কই জোটালুম? ওরা তো কলকাতা থেকে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলে এলো। আমি আর বারণ করি কি করে। আফটার অল অ্যাদ্দিনের সঙ্গী, ফেলে তো আর দিতে পারি না—

—তোমার খরচপত্র সব চলছে কি ভাবে?

গম্ভীর মুখে নায়ক বলল—চামচারাই চালিয়ে দিচ্ছে। আমি ওদের অ্যাদ্দিনের সঙ্গী, ওরা ফেলে তো আর দিতে পারে না।

—চামচারাই বা জোগাড় করছে কোত্থেকে?

—কেন, ওরা এখন নতুন হিরো পাকড়াও করেছে যে। সেই সঙ্গে আমার জন্যেও প্রাণপণে চেষ্টা করছে। তবে আমি তো জানি আমি বাড়তি—আমাকে চট করে তোলা খুব শক্ত। তারপর পুণা ইনস্টিটিউট লাইনে যা ছাড়ছে বছর বছর, এখন একটা সাব-হিরোর কাজ জোটাতে পারলেই বর্তে যাই।

এখন এই নায়ক কে হতে পারে আপনারা ভাবতে থাকুন। একটু চেষ্টা করলেই ধরে ফেলতে পারবেন বলেই আমার বিশ্বাস। আর একান্তই যদি না পারেন, পরের কয়েকটি সংখ্যা ফলো করুন, আমি জলজ্যান্ত উপস্থিত করে দেব একে।

আচ্ছা দাঁড়ান দাঁড়ান, কাহিনী এখানেই শেষ নয়; এই নায়কের হঠাৎ বরাত খুলে গেছে। আচমকা ওর একটা মাইথোলোজিক্যাল ছবি হিট্ করে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ও এখন রাতারাতি বোম্বের সুপার স্টার বনে গেছে। কমপক্ষে পঞ্চাশখানা ছবি সাইন করেছে। কপাল!

মেয়েটিকে দেখতে এমন কিছু নয়, কিন্তু দারুণ সেকসসাইটিং। ফিল্মে যেটা বেশী প্রয়োজন। শো বিজনেসে শো-টাই হচ্ছে বড় কথা। এসেছিল আচমকা, স্টুডিওতে, একসট্রার পার্টের জন্যে। একস্ট্রারা এক শিফটের পারিশ্রমিক পায় দশ টাকা। সাপ্লায়ার তা থেকে কমিশন কেটে ওদের হাতে দেয় সাত টাকা। আর সুপার একস্ট্রা পায় বিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। যেমন রেট তেমন কমিশন।

এ-মেয়েটি সুপার। বিয়ের সেটে বা কলেজে নায়িকার সঙ্গিনী হিসাবে একে দারুণ মানায়। তখন ওখানে একজন জহুরী ঘোরাঘুরি করছিল। মেয়েটি হঠাৎ তার চোখে পড়ে গেল। সাবাশ! একে খেলিয়ে তুলতে পারলে তো অল্প দিনের মধ্যে হিরোইন করা যায়। ব্যস, অমনি সে কাজে লেগে পড়ল।

—আপনি ছবিতে কাজ করবেন?

সামান্য একটু দ্বিধা, তারপরই মেয়েটি—হ্যাঁ।

—আপনার সঙ্গে কেউ কথা বলেছে?

—কথা বলেছে মানে? মেয়েটি অবাক!

—মানে ছবিতে নামানোর ব্যাপারে আপনার সঙ্গে এর আগে কারও কথাবার্তা হয়েছে?

—কই না-তো। মেয়েটির বিস্মিত উত্তর।

—আপনি আজ এই প্রথম স্টুডিওতে এলেন? না এর আগেও কখনো কখনো এসেছেন?

—না। আমি আজ এই প্রথম এলাম। ...আপনি কে?...

—আমি...আমি এখানে কাজ করি। ফিল্মের লোক। আপনি কোথায় থাকেন?

মেয়েটা চতুর।—কেন বলুন তো?

—এইজন্যে যে আমি হয়ত আপনার উপকারে আসতে পারি। আপনি ফিল্মে নামতে চাইছেন, আমি চেষ্টা করলে আপনাকে ভাল ছবিতে যোগাযোগ করিয়েও দিতে পারি—

কথাগুলো খুব সতর্ক ভঙ্গীতে লোকটি মেয়েটিকে বলল। ধীরে সুস্থে ওজন করে।

যে খেলার যা নিয়ম।

—আমি থাকি বেহালায়।

লোকটি কি করে আন্দাজ করল যে মেয়েটি বিবাহিত? শাঁখা নেই সিঁদুর নেই, নট কোন কিচ্ছু। অথচ সটান প্রশ্ন করল—আপনার স্বামী কি করেন?

মেয়েটি চমকাল। সামলে নিয়ে বলল- আমার বিয়ে-ই হয়নি।

টিপটিপ করে হাসল লোকটি। যেন ধূর্ত শেয়াল হাসছে।—কেন চেপে যাচ্ছেন? যাকগে। বাড়ির দিক দিয়ে কোন আপত্তি আসবে না তো?

—নাঃ।

—গুড। তাহলে ফিপটি ফিপটি হবে কিন্তু আপনার সঙ্গে।

—মানে? ভ্রূভঙ্গি করল মেয়েটি।

—অর্থাৎ আপনার যা দর ঠিক হবে আমি তার অর্ধেক ক্যাশ নিয়ে নেব। তখন গাই-গুঁই করলে হবে না কিন্তু।

মেয়েটি একটুও ভাবল না। বলল—টাকার আমার দরকার নেই। যা হয় নেবেন। কিন্তু ভাল পার্ট না হলে করব না কিন্তু।

লোকটি নিঃশব্দে ঠোঁট টিপে শুধু একবার হাসল।

আপনি এখন কোথায়? কলকাতা বোম্বে না মাদ্রাজ? আপনি আমার লেখা পড়ছেন কি? শুধু খেয়াল করতে থাকুন, আমার এই যে স্টেটমেন্ট—আসলে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে আপনিই যেটা আমায় দিয়েছিলেন, সেটা হুবহু মিলে যাচ্ছে কিনা? না মিললে, যখন দেখা হবে সংশোধন করে দেবেন।

না, আপনার কোন দোষ নেই। ফিল্মে সবাই তো কেরিয়ার করতে আসে। আপনিও এসেছিলেন। বোম্বের এখনকার অতবড় যে গ্ল্যামার কুইন—সে-ও তো এক দক্ষিণ ভারতীয় টাউটের হাতফের্তা ইণ্ডাষ্ট্রীতে

এসেছিল। এখন সদম্ভে রয়েছে। থাকবেও কিছুকাল। কিন্তু আপনি অত অস্থির হয়ে পড়ছেন কেন? গোটা কতক লোক আপনাকে দাগা দিয়েছে বলে? সে তো জানা কথা ছিল। শো বিজনেসে কে কবে উঁচু ডালে উঠতে পেরেছে নীচের ডালে পা না রেখে? আপনি বরং ভাবুন না—ওরা নীচের ডাল। তাহলেই জ্বালা কমবে। জীবনে শান্তি আসবে। আর ভাবুন সেই সঙ্গে আপনার বিরুদ্ধে ওদের নালিশের কথাও। আপনি তো ওদের দাবার ঘুঁটি হিসাবে কিছুকাল চেলেছেন।

আপনার খামখেয়ালিতে মদত দিতে গিয়ে ছকুলালের শেষ পর্যন্ত কি হাল হয়েছে সেটাও আপনার ভোলা উচিত নয়। ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করেছেন। ওই শয়তানটার হাতের টিপ সেদিন অব্যর্থ হলে অ্যাসিড বাল্বটা আপনার মুখেই ফাটতো—ছকুলালের মুখে নয়। গত বছর চৌরঙ্গীতে ছকুলালকে এক পলকের জন্যে দেখেছিলাম। উঃ। ওর মুখের দিকে তাকাতেই আমার ভয় করেছিল, আপনার তো ভীষণ—ভীষণ ভয় করবে। ভয় নেই, সে-কথায় আসব না।

গ্ল্যামারের জগতে দর্শনধারী ব্যাপারটাই সর্বাগ্রগণ্য। সব সময় একসাইটমেণ্ট চাই এখানে। উত্তেজনা না থাকলে এখানে কেউ বাঁচতে পারে না—বাঁচা সম্ভব নয়। এটা কোন মাছি মারা কাজ নয়, দুর্দান্ত ক্রিয়েটিভ কাজ। অর্থ আর অনর্থ এখানে তাই হাত ধরাধরি করে চলে।

তারপর সেই দুর্ধর্ষ শিল্পপতি তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। এখানে যে বোর্ড অফ ডিরেকটরস-এর মিটিং চলেছে। সুন্দরী স্টেনো শর্টহ্যাণ্ড নোট নিচ্ছে। তার বুকের আঁচল আলগা হয়ে নেমে গেছে। ডিরেকটর হঠাৎ পাউণ্ড শিলিং পেন্সে আটকে আছেন। পরের কথাটা তাঁর মগজে আসছে না।

টাউটটি সসম্ভ্রমে—স্যার।

অর্ধস্ফুট ইঙ্গিত—ইউ মে গো নাউ—

টাউট আউট। বাইরে দরজার ল্যাচ পড়ার মৃদু শব্দ।

—বস।

—তুমি কি হতে চাও? ···সিনেমায় অ্যাকট্রেস? না এয়ার হোস্টেস? দুটোই একসাইটিং জব। হুইচ ওয়ান ইউ প্রেফার মোস্ট?

পুরো সেকসাইটিং ব্যাপারটা নড়েচড়ে ওঠে। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে মেয়েটি যেন মৃদু মৃদু ঘামতে আরম্ভ করে। সে কি চাইলে এখুনি লিজ টেলর হতে পাবে? চাইলে রিচার্ড বার্টনের কণ্ঠলগ্না হতে পারে? সেঞ্চুরী ফকসের ফাইভ মিলিয়ন ডলার কণ্ট্রাকটে সই করে খবরের কাগজে হেড লাইন হিট করতে পারে? বা পাখি হয়ে এযার ইণ্ডিয়ার জাম্বো জেটে বোম্বে-লণ্ডন-প্যারি নু্যঅর্ক বাই-উইকলী ফ্লাইট নিতে পারে? সমস্ত ব্যাপারটা যেন অখণ্ড একটা শ্লো-মোশান মুভী প্রোজেকশান।

মেয়েটির চোখে জল এসে গেল।—আমি সিনেমার নায়িকা হতে চাই, খুউব বড় নায়িকা—

বেকুফ স্বামীটি একদিন স্টলে দাঁড়িয়ে থরে থরে সাজানো কাগুজে সেক্স দেখছিল, হঠাৎ তার চোখ যেন ঠিকরে গেল। একি? এই যে মারাত্মক একটা সেকসাইটিং পোজে সেন্টার-স্প্রেড-ব্লো-আপ ছবিতে মুখে এক চিমটি নটোরিয়াস হেসে দাঁড়িয়েছে? এ যে···এ যে···

তার হাতের ব্যাগটি ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল। সুখের পাখি তখন অনেক অনেক দূর। বহুদূরে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ডানলোপিলো নরম শরীরে সে তখন সাঁতার কাটছে কেরিযারের সফেন সমুদ্রে। আর নেপথ্যে ফিল-হারমোনিক অর্কেস্ট্রা অন্তত আড়াইশো হ্যাণ্ডে চার্জ হয়ে যাচ্ছে বাতাসে বাতাসে। ইয়াহু!

পরিচালক জানত—একে। মানে এই মেয়েটিকে।

শুধু দুঃখ করে তার সহকারীকে বলেছিল—সারা জীবন জঞ্জাল সাফ করে করেই গেলাম। ফিল্ম লাইনে না এসে আমার কর্পোরেশনে যাওয়াই উচিত ছিল। ওর জিভের এখনও আড় ভাঙে নি—আর এই রকম একটা ডিফিক্যাল্ট রোলে ও অভিনয় করবে? অসম্ভব।

আর মেয়েটি জানত আসলে কি সে? কিছু না জেনে ক্যামেরার সামনে এলে ক্যামেরা কাউকে রেহাই দেয় না।

টাউট ফিস ফিস করে বলে দিল—ম্যানেজ করে নাও। উনিই সব।

সেকসাইটিং আবার নড়েচড়ে বসে। মাথার ওপর জ্বলছে পাঁচ কিলোওয়াটের চড়া আলো। এতে অন্ধকার অনেকটা কেটে গেছে। অনেক দূরের রাস্তার কিছুটা দেখা যাচ্ছে। অতএব বাকি পথটা যাওয়ার ব্যবস্থা তাকে করতেই হবে।

আপনার আর কতটা যেতে বাকি আছে? না না, মনকে চোখ ঠেরে লাভ নেই, সত্যি করে বলুন তো? বোম্বে মাদ্রাজ কলকাতায় ঘুরেও প্রশ্নের সমাধান পাবেন না। পেলে এখানেই পাবেন। যেখানে আপনার শুরু। এখন সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা করুন।

খোদ উত্তমকুমারকেও যদি প্রশ্ন করা যায় হ্যাঁ মশায় আপনি গুপী বাঁড়ুজ্যেকে চেনেন? তো উনি মুচকি হেসে জবাব দেবেন—চিনি বৈকি, নিশ্চয় চিনি। সত্যজিৎ রায়কে জিগ্যেস করুন। উনিও মৃদু হেসে বলবেন, চিনি। অর্থাৎ আমি বলতে চাই যে গুপী বাঁড়ুজ্যেকে চেনে না এমন লোক ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রীতে নেই। মানুষটির এখন যথেষ্ট বয়স হয়েছে। আগেকার মত আর খাটাখাটুনি করতে পারে না। কিন্তু ডায়লাগ? বাপ্‌রে, বয়স যত বাড়ছে, দিন দিন ওটা যেন ততই ধারাল হচ্ছে। রসাল হচ্ছে। কলকাতার আদি বাসিন্দাদের কথাবার্তার ধরণ-ধারণ যেমনটা, গুপী বাঁড়ুজ্যেরও অকৃত্রিম তাই।

মানুষটির পেশা হচ্ছে ফিল্ম লাইনে হরেক জিনিস সাপ্লাই দেওয়া। একটা ছবি তৈরী করতে তো পার্থিব জগতের প্রায় সব কিছুরই প্রয়োজন পড়ে। মানুষজন থেকে শুরু করে এনি থিং অ্যাণ্ড এভরি থিং। আর গুপী বাঁড়ুজ্যের সাপ্লাই হচ্ছে—ছবির স্পেশাল রিকুইজিশান। রান্নাঘরের মালপত্র, দেয়ালে ঝোলাবার ছবি, নানা ধরণের কিউরিও, পোশাক-পরিচ্ছদ। তীর-ধনুক, গাদা বন্দুক, রাইফেল, পিস্তল, মশাল, গহনাগাঁটি, হীরে, মণিমাণিক্য, জহরৎ, কাপ, প্লেট, ডিনার সেট—এভরিথিং। সবই

অবশ্য নকল। গুপী বাঁড়ুজ্যেকে অবশ্য এই নকল কথাটা বলার উপায় নেই। ওর মতে সবই আসল—মানে ওর স্টকে যা যা আছে। নকল হচ্ছে ফিল্ম লাইনের বদমাশ লোকজন। কারও কোন বাক্যের ঠিক নেই। বিলের টাকা দেবে বলে এই যে দিনের পর দিন ঘোরাচ্ছে—এটা জোচ্চুরি নয়? আমি দুনিয়ার জিনিস দিয়ে তোমার বায়োস্কোপেব সেট অমন চমৎকার সাজিয়ে দিলাম, আমার সাপ্লাই দেওয়া অলঙ্কার পরে তোমার সিনেমার হেরো-হেরোইনরা নেচে কুঁদে শুটিং করল, আমার দেওয়া বড় বড় অয়েল পেন্টিং সেটের দেয়াল টাঙ্গিয়ে তুমি বেস্ট আর্ট ডিরেকটরের প্রাইজ নেবে বলে ত্যাখন থেকে পাঁয়তাড়া কষছো—অথচ বিলের টাকার কথা শুনলেই মুখ ব্যাজার? গুপী বাঁড়ুজ্যের সাফ কথা—ফেলো কড়ি মাখো তেল—তুমি কি আমার পর? সারা ইণ্ডিয়ার অকশান ঘেঁটে এইসব এসপেশাল জিনিসপত্তর কি.ন এনেচি, এসব বুঝি ফোঁকটে সাপ্লাই দেবার জন্যে? বায়োস্কোপ করছ চাট্টে পয়সা রোজগারের জন্যে, তবে বাপু আমার পয়সাটা সময় মত না দেওয়া কেন? গুপী বাঁড়ুজ্যের মাল না নিয়ে বায়োস্কোপ করলেই তো পারতে, পায়ে তো আর ধরতে যাইনি তোমাদের···

গুপী বাঁড়ুজ্যের ভবানীপুরের দোকানে যদি কখনও যান তাহলে ওর ব্যাপার দেখে প্রথমেই আপনার আক্কেল গুড়ুম হবে। মাল চাই বললেই হবে না, আপনি লোকটি কে এবং কেমন—এটা আগে ও ভাল ভাবে খতিয়ে নেবে। তারপর আলাপ-সালাপ, দর-দস্তুর এবং মালের আদান-প্রদান।

বহুদিন আগে আমি একবার গিয়েছিলাম একটা স্পেশাল রিকুইজি-শানের সন্ধানে। বিগত শতকের একটা টেবিল ল্যাম্পের প্রয়োজনে। সময়টা দুপুর বেলা। পূর্ণ সিনেমা ছাড়িয়ে একটা গলির মধ্যে গুপী বাঁড়ুজ্যের দোকান। একজনকে জিগ্যেস করতে সে বললে, গুপীদার মিউজিয়াম? সোজা চলে যান। বাঁ হাতে যেখানে আপনার নাকটা ঠেকে যাবে, সেটাই হচ্ছে—

পেল্লায় বাড়ি। গিয়ে দেখি ভেতর থেকে বন্ধ। এদিক-ওদিক চেয়ে

কাউকে পেলাম না। অগত্যা হাঁক দিলাম—গুপীবাবু, ও গুপীবাবু—

ভেতর থেকে কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। ভাবলাম, কিরে বাবা, রং নাম্বার নয়তো?

হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ। চমকে তাকিয়ে দেখি খালি গায়ে খাটো একটা গামছা পরে গুপী বাঁড়ুজ্যে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে। —কি চাই?

—প্রথমে গুপী বাঁড়ুজ্যেকে চাই—

আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে গুপী বললে—আমি-ই। চিনতে কষ্ট হচ্ছে বুঝি?

হেসে বললাম—এই কস্ট্যুমে তো ইতিপূর্বে কখনও দেখিনি, তাই ভাবছিলাম যমজ ভাই-টাই কিনা—

—চটপট বলে ফেল তো এখন কী চাই? আমি এখন লাঞ্চে বসব। লাঞ্চ।

শুনেই আমার চক্ষু স্থির।

গুপী বলল—কেন? আমার বুঝি লাঞ্চ করা নিষেধ? গত নিলামে এক সাহেব-বাড়ির মালপত্র তুলেছি। পাক্‌কা এইটিনথ্‌ সেঞ্চুরীর। আস্ত আস্ত ডিনার সেট নিয়ে এসেছি সব। আজকাল তাতেই লাঞ্চ আর ডিনার সারছি। হেঁ হেঁ হেঁ…

দেখি গুপী বাঁড়ুজ্যের পোষা একদল কুকুর এসে ওকে ঘিরে ধরেছে। গুপী তাদের একটাকে আদর করে বলল—যাচ্ছি, যাচ্ছি, একেবারে যেন তর সইছে না। লাঞ্চ টাইমের একটু হেরফের হবার আর জো নেই। সাহেববাড়ির কুকুর তো। বুঝলে এদেরও সেই সঙ্গে কিনে নিয়ে এলাম। ছবির জন্যে দরকার হলে বলো, অল্প খরচায় সাপ্লাই দেব…

গুপী বাঁড়ুজ্যের দোকানে আপনি কি চান? সিরাজদ্দৌলার নাগরা? আলিবর্দির তরোয়াল? মহারাজ নন্দকুমার ফাঁসি যাবার আগে যে কাঁথা গায়ে দিয়ে শুতেন, সেটা? সব আছে। মায় লর্ড ক্লাইভের পোশাক। গুপী নাকি সব জোগাড় করে করে রেখে দিয়েছে। ঐতিহাসিক ছবি

ফিটন-ই নয়, সঙ্গে আবার জ্যান্ত এট্টা ঘোড়াও তুলেছেন লরিতে ?

বলতে বলতে অফিসার লাফিয়ে দু-পা পিছিয়ে দাঁড়াল। ঘোড়াটা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়েছে। অনাদি খুব চটে গেল। শালা ইয়ে করার আর সময় পেল না, দাঁড়া দিচ্ছি তোকে এক ডজন লাথি, জানোয়ার কোথাকার।

অফিসারের কাছে তাড়াতাড়ি মাফ চেয়ে নিল অনাদি—স্যার কিছু মনে করবেন না। গায়ে লাগে নি তো ?

অফিসার আরও চটিতং।

তারপর যেন মস কোডে দুজনের মধ্যে কথা আরম্ভ হল। সে এক বিচিত্র সংলাপ। প্রথমে অনাদি গুজ গুজ করে অফিসারটিকে কি যেন বলল। শুনে অফিসার এমন প্রবলভাবে মাথা নাড়তে লাগল যে মনে হল ধড় থেকে এক্ষুনি ওর মুণ্ডুটাই খসে পড়বে। এরপর ব্যাজার ভঙ্গীতে অনাদি আর একটা কি যেন বলল। এবারও অফিসারের মাথা নড়ল তবে আগেকার মত তেমন সবেগে নয়। অনাদি এবার অসম্ভব ব্যাজার মুখে কি একটা ডায়লাগ থ্রো করল। ব্যস, অফিসারের মুখে কুমড়োর ফালির মত এক চিলতে হাসি ফুটল তৎক্ষণাৎ। এরপর অন্ধকারে কাগজের কিছু খসখসানির আওয়াজ, অফিসারের প্রস্থান, লরি আবার চলতে আরম্ভ করল।

রাত আড়াইটে।

লরিটা তখন বেড়াচাঁপার কাছে এসেছে, হঠাৎ একজন পুলিশ কনেস্টবল অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে হুকুম দিল—এই লরি থামাও—

ঘ্যাঁচ করে লরি দাঁড়িয়ে পড়ল।

অনাদি তখন গদিতে আরাম করে শুয়ে নিদ্রা যাচ্ছিল, ব্রেকের এই হঠাৎ ঝাঁকুনিতে সে ধড়মড় করে ঠেলে উঠে বসল।

—লাইসিন হ্যায় ?

ড্রাইভার বলল—হ্যায়।

—এই লরিমে চোরাই মাল হ্যায় ?

—নেহি হ্যায়।

মন্দ পরামর্শ নয়। কিন্তু ঢিবি কোথায়? লরির ড্রাইভার বলল— এক মাইল পেছনে আমি এট্টা ঢিবি দেখেছি, চলুন তাহলে ওখানে গিয়েই বরং—

—হ্যাঁ তাই চল। এদিকে ভোর হয়ে এল—

রাস্তার ধারে বাস্তবিকই একটা ঢিবি। অন্ধকারেও চোখে পড়ার মত। অনাদি খুশী হয়ে ড্রাইভারকে বলল—ভেরি গুড। আর দেরী না করে লরির পেছনটা ওখানে লাগিয়ে দাও, আমরা ফিটন আর ঘোড়া নামিয়ে নিচ্ছি—

ড্রাইভার ব্যাকগিয়ারে লরি লাগিয়ে দিল সেই উঁচু ঢিবিতে।

তারপর শুরু হল আনলোডিং অপারেশন। ড্রাইভার আর তার সহকারী দুজনে মিলে ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে ফিটনটা ধরে মারে হ্যাঁচকা টান, আর অনাদি প্রবল জোরে ঠেলতে থাকে সামনে থেকে। ফলে একটু একটু করে ফিটন ঢিপির ওপর উঠতে লাগল। জোরসে মারো হেঁইয়ো, তাগদসে মারো হেঁইয়ো করতে করতে হঠাৎ বিরাট এক হ্যাঁচকা টানে ফিটনটা হুড়মুড় করে ঢিবির ওপর চলে গেল, আর সেই সঙ্গে শোনা গেল ড্রাইভার আর ক্লিনারের প্রবল আর্তনাদ—মর গিয়া জ্বল গিয়া মর গিয়া জ্বল গিয়া—

কিরে বাবা কি হলো? ফিকে অন্ধকারে অনাদি দৌড়ে গেল সেখানে— আরেব্বাস সত্যনাশ, এটা একটা ইটের পাঁজা, মৃত নয়—জীবন্ত, পাঁজার ভেতরে আগুন গনগন করে জ্বলছে। ওরা গাড়ি নিয়ে পিছোতে পিছোতে সটান সেই আগ্নেয়গিরিতে গিয়ে পৌঁছেছে। আরে নেমে এস নেমে এস—

ওরা লাফাতে লাফাতে নেমে এসে ভুঁয়ে শুয়ে ছটফট করতে লাগল আর বিভ্রান্ত অনাদি এমন চেঁচাতে লাগল যে মুহূর্তে গ্রামের লোক লাটি-সোটা নিয়ে রে রে শব্দে সেখানে দৌড়ে এল। তাদের ধারণা নির্ঘাৎ ডাকাত পড়েছে। তারা এসে ভূতলশায়ী লোক দুটিকে এই মারে কি সেই মারে —লরিতে করে পাঁজার ইট চুরি করা আজ তোদের বের করছি ভাল রকম। অনাদি ওদের অতিকষ্টে শান্ত করল, দেখ ভাই আগে আমার ফিটনটা বাঁচাও, পরে সব বলছি খুলে।

তখন ফিটন উদ্ধার হলো। অনাদিকে গ্রামবাসীরা ইতিপূর্বে

দেখেছে। কারণ লোকেশান নির্বাচনের সময় অনাদি নিজে এসে গ্রামের মাতব্বরদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্পে খবর চলে গেল। অরবিন্দ মুখার্জি তার সহকারীদের নিয়ে এসে পড়লেন। ফিটন আর ঘোড়া দেখে তিনি তারিফ করলেন অনাদির ব্যবস্থাপনার। অনাদি তখন লরি-ড্রাইভার আর তার ক্লিনারকে নিয়ে শহরে গেল ডাক্তার দেখাতে। সে এক পরিস্থিতি।

অনাদি এখন টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতেই বেশীর ভাগ সময় বসে। ওর মানুষের পেছনে লাগার ক্ষমতার বাস্তবিক তুলনা হয় না। সেদিন হেক্‌টিক্ শুটিং করতে করতে দিলীপ মুখার্জি দেখি এক ফাঁকে অনাদিকে থ্রেটন্ করছেন—ভেবেছ প্রোডিউস্যার হয়েছ বলে তুমি পার পেয়ে যাবে? তোমায় একদিন আমি এইস্যা টাইট দেব যে হাড়ে হাড়ে বুঝবে—

অথচ দেখুন তাতে কোন ভাববিকার ঘটল না ওর। হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ করে হাসতে থাকল।

বিরক্ত দিলীপ মুখার্জি শেষে বললেন—বাস্তবিক তুমি যে কি একটা চিজ আমি আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারলাম না…

বাচ্চাদের নিয়ে ফিল্মের শুটিং করা মানে পরিষ্কার একটা লঙ্কাকাণ্ড বেধে যাওয়া। এ-ব্যাপারে আমার ভয়ঙ্কর কিছু অভিজ্ঞতা আছে। আমাদের এখানে বেশীর ভাগ পরিচালক শিশুদের ট্যাকেল করতে অক্ষম। আসলে শিশুরা অ্যাকটিং বোঝে না, ক্যামেরার সামনে নিজের খেয়াল-খুশীমাফিক যা করে—দর্শকদের তাই-ই ভাল লাগে। চার্লি চ্যাপলীন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, শিশুরা সেরা শিল্পী। জাতশিল্পী। ওদের কাছে বড়রা শিখতে পারে……।

চার্লি চ্যাপলীন তাঁর 'দি কিড' ছবিতে জ্যাকি কুগান নামক সেই শিশুটিকে দিয়ে যা করিয়েছিলেন, সমগ্র পৃথিবীর চলচ্চিত্র তা আজও স্মরণে রেখেছে। ওই ছবিতে জ্যাকি কুগান কখনও অভিনয় করেছে বলে মনে

হয় না। শিশুদের ব্যাপারে যে পরিচালক যত 'সেন্স অফ র‍্যাপর' দেখাতে পারবেন, তিনি ততই বাজি মাৎ করবেন। ইদানিং বাচ্চাদের ম্যানেজ করার অবিশ্বাস্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন আমাদের তরুণ মজুমদার। ওঁর ছবিতে শিশুরা যত স্বতঃস্ফূর্ত—অন্যের ছবিতে কিন্তু ততটা নয়। এ-ব্যাপারে তরুণ মজুমদার বিস্ময়কর ক্ষমতা ধরেন।

চার্লি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'একটা দু' বছর বয়স্ক মানবশিশু এমন কিছু করতে পারে যা দেখে আপনি হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়তে পারেন। আপনি প্রথমে একটা বাথটব সংগ্রহ করুন। তাতে জল ঢালুন। তারপর সেই জলে এক টুকরো রঙীন সাবান ফেলে দিন। তারপর ক্ষুদে শিল্পীটিকে সেই টবে বসিয়ে দিন। এবং দেখতে করতে থাকুন-কাকে বলে কমেডি। শিশুটি প্রথমে লক্ষ্য করবে যে জলে রঙীন কি একটা যেন পড়ে আছে। এবার ওটা সে তুলতে চেষ্টা করবে। অসম্ভব। জল থেকে সাবান তোলা চাট্টিখানি কথা নয়। ওটা বারে বারে ওর হাত থেকে পিছলে যাবে। তখন ও দুহাতে ওটা ধরবার চেষ্টা করবে। আর এই সময় শিশুটি মুখের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করুন—ওঃ কতরকম পাঁয়তাড়া, কতরকম প্রক্রিয়া। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর ও যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে দেখবেন স্রেফ ভ্যাক করে কেঁদে ফেলছে।'

এটা হচ্ছে একটা নির্জলা কমেডি। আপনারা পরখ করে দেখতে পারেন। আমি নিজে করেছি এবং অপ্রত্যাশিত ফল পেয়েছি। দর্শকরা হেসে কুটিপাটি হয়েছেন।

আজকে মৌসুমী বড় হয়েছে, কিন্তু এই মৌসুমীই টালিগঞ্জ পাড়ায় রীতিমত টেরার ছিল একদিন। নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর পাশে একটা গার্লস স্কুলে ও তখন পড়ত। আর ফাঁক পেলেই স্কুল পালিয়ে স্টুডিওতে চলে আসত। ইন্দুকে স্টুডিওর কে-না চিনত। সর্বত্র ওর অবাধ গতিবিধি ছিল। ফ্রক-পরা টুরটুরে মেয়ে বকবক করছে সর্বক্ষণ, এই মেয়েটিকে স্টুডিওর দারোয়ানরা ভয় করত সব চাইতে বেশী। একবার মনে আছে, একটা ছবির শুটিং চলছে, গোলঘরে বসে তরুণকুমার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে

নট বীরেন চাটুজ্যে। তিনি সন্ধ্যে নাগাদ লোকেশানে পৌঁছে গেলেন। ভদ্রলোক খুব মেজাজী শিল্পী। খুব অমায়িক প্রকৃতি মানুষ। সারাক্ষণ মুখে জর্দা পান।

ট্যাকসি থেকে নেমে সকলের কুশল সংবাদ নিয়ে আমাকে ইসারায় কাছে ডাকলেন—ইয়ে, মালপত্র সব এসে গেছে?

আমি অবাক।—কি মালপত্র?

—খাঁড়া?

—খাঁড়া! হ্যাঁ এসেছে বলেই তো জানি।

বীরেন চাটুজ্যে বললেন—তাহলে ওটা আমি একবার দেখব।

—কোনটা?

—ওই যে বললাম, খাঁড়াটা?

আমি হতভম্ব।—সেকি? খাঁড়া দেখে আপনি কি করবেন?

বীরেন চাটুজ্যে বললেন—পরীক্ষা করে দেখব ওটা আসল না নকল! দেখ ভাই পাঁচটা ছবিতে অ্যাকটিং করে খাই, বেঘোরে প্রাণটা হারাতে চাই না। খাঁড়ার কোপ মারবে বুম্বা, ভাই বাচ্চা ছেলে কি হতে কি হয়ে যায় তার নেই ঠিক। সেইজন্যেই মালটা একবার চেক করে দেখা দরকার। তুমি একবার ওটা আনাও।

প্রোডাকশনের একজনকে বলতে সে খাঁড়াটা নিয়ে এল। আর সেটা দেখে আমারও চক্ষুস্থির। আরে এটা যে বাস্তবিক আসল খাঁড়া। রীতিমত ধারালো। আলো লেগে চকচক করছে। বীরেন চাটুজ্যে তো চটে ফায়ার—দেখলে কি কাণ্ড, এটাই আমি ভয় পেয়েছিলাম। আমায় এক্ষুণি ট্যাকসি ডেকে দাও ভাই আমি বাড়ি ফিরে যাব।

—আরে দাঁড়ান দাঁড়ান, এ-খাঁড়া তো শটে বাস্তবিক দেওয়া যেত না, নিশ্চয়ই অন্য কোন দামী খাঁড়া আনা হয়েছে, আপনি তা বলে চলে যাবেন কেন?

খবর নিয়ে জানা গেল—হ্যাঁ, একটা কাঠের তৈরী খাঁড়া এসেছে রিকুইজিশান মাফিক। আর সেটাই শটে বুম্বার হাতে দেওয়া হবে।

বীরেন চাটুজ্যে মুখের কথা মানতে রাজি নন, অতএব তাঁকে সেই ডামী এনে দেখাতে হল। উনি সেটা হাতে নিয়ে ভাল করে পরখ করে বললেন -- না ঠিক আছে। তবে ভাই ওই ওরিজিনাল মালটিকে হাটিয়ে দাও। ধারে-কাছে কোথাও রেখ না। বাচ্চা ছেলে বলে একটা কথা। ঝোঁকের মাথায় নিয়ে নিলে 'বল হরি' হয়ে যাবে।

বীরেন চাটুজ্যে অভিজ্ঞ মানুষ। আগে মাইথোলজিক্যাল ছবিতে ওঁর রাবণের পার্ট বাঁধা ছিল। খলনায়কের পার্ট বীরেন চাটুজ্যের অভিনয়ে বেশ খোলতাই হয়। একবার দুঃশাসনের পার্টে কি হেনস্থা, দ্রৌপদীকে নাকাল করছেন। করছেন শটের পর শট, ভাল উৎরে যাচ্ছে, একটা শটে আছে দ্রৌপদী আর সইতে না পেরে জলভরা চোখে নারায়ণের উদ্দেশ্যে কাতর সংলাপ ছাড়বেন, এখন হয়েছে কি ইন রিয়ালিটি সেই অভিনেত্রীর শিশুসন্তান তখন ফ্লোরে উপস্থিত ছিল। সে অনেকক্ষণ ধরে মায়ের এই হেনস্থা সহ্য করছিল। কিন্তু ওই শটে সে যেন আর সামলাতে পারল না। হঠাৎ দৌড়ে এসে দুঃশাসনের হাতে বসিয়ে দিল এক রাম কামড়। বীরেন চাটুজ্যে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ধপাস করে বসে পড়লেন ফ্লোরে। সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরা বন্ধ করে দেওয়া হল। সারা ফ্লোর জুড়ে হৈ-হৈ পড়ে গেল। ছেলেটি ততক্ষণ মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে কান্না জুড়ে দিয়েছে।

বীরেন চাটুজ্যে তখন মহিলাটিকে বললেন—কি কাণ্ড বলুন তো! সঙ্গে বাচ্চা এনেছেন সেটা বলবেন তো! এটা জানা থাকলে আজ কোন শালা দুঃশাসন হয়, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির সেজে বসে থাকতুম······

বুম্বা এসেছিল। বীরেন চাটুজ্যে তাকে যথেষ্ট আদর-টাদর করলেন। বললেন—বুম্বা যাই কর মনে রেখ খাঁড়াটা তুমি কিন্তু পাঁঠার গলায় ঝাড়ছ না—মানুষের গলায় ফেলছ। হলেও কাঠের তৈরী, সাবধানে ঝেড় কিন্তু। বুঝেছো?

আমার মনে আছে গভীর রাত্রে যখন সেই দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ চলছে তখন বীরেন চাটুজ্যের চোখ দুটি জিনিসের ওপর ক্রমান্বয়ে গোয়েন্দাগিরি করে চলেছে দেখলাম: এক—প্রসেনজিৎ এবং দুই—কাঠের খাঁড়া। শেষ

মুহূর্তে উনি নিজে এসে হাঁড়িকাঠের কাছে ফেলে রাখা খাঁড়াটা পরখ করে গেলেন এবং নিজেকে শুনিয়েই যেন বললেন, ধুস শালা। তারপর ঘাড় চুলকে গিয়ে শট দিলেন, আতঙ্কটা মনে মনেই রইল।

স্মরণ হচ্ছে, একদিন শুটিং-এর লাঞ্চ ব্রেকের পর হঠাৎ বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেল। সবাই বিরক্ত হয়ে ফ্লোর থেকে বেরিয়ে এসে স্টুডিওর গোলঘরের বেঞ্চিতে বসলেন। প্রোডাকশন ম্যানেজার দৌড়ে গেলেন ইলেকট্রিক সাপ্লাইতে ফোন করতে। জানা গেল—বিদ্যুৎ ফেরার ব্যাপারটা এখন খুবই নাকি অনিশ্চিত। কোথায় ব্যাণ্ডেল না দুর্গাপুরের মেশিন ব্রেকডাউন হয়েছে। ছবির শিল্পীদের মধ্যে সেদিন ছিলেন উত্তমকুমার। তিনি এই সংবাদ শুনে মুচকি হাসলেন মাত্র, কোন মন্তব্য করলেন না।

ছবির প্রযোজক এবং পরিচালক সবাই বিব্রত, বিভ্রান্ত। টানা শুটিং করতে করতে এভাবে হঠাৎ কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে প্যাকআপ বলাও সম্ভব নয়। অথচ বিদ্যুৎ কখন ফিরবে কেউ বলতে পারে না। এই উভয় সঙ্কট থেকে শেষে উত্তমকুমার নিজেই ওঁদের বাঁচালেন। উনি হেসে বললেন—ঘণ্টাখানেক দেখা যাক। এর মধ্যে যদি 'পাওয়ার' আসে—শুটিং করে অন্তত আজকের সিডিউলটা তুলে দেবার চেষ্টা করা যাবে। আপাতত কিছুক্ষণ আড্ডা দেওয়া যাক।

শুরু হল আড্ডা। উত্তমকুমার তখন সবে বনপলাশির পদাবলী ছবি রিলিজ দিয়েছেন। সে-ছবির পরিচালক হিসাবে ওঁর যথেষ্ট সুনাম হয়েছে। উনি পরের ছবির জন্যে গল্প খুঁজছেন। সেদিন আড্ডায় ওই প্রসঙ্গে কথা উঠতে একজন টেকনিশিয়ান বললেন, র‍্যাগিং-এর ওপর ছবি করবেন?

—র‍্যাগিং?

—হ্যাঁ, আজ কাগজে দেখেছেন বোধহয়—কলেজ হোস্টেলে র‍্যাগিং সহ্য করতে না পেরে একটি ছেলে সুইসাইড অ্যাটেম্প করেছিল, কিন্তু অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে। ঘুমের ওষুধটা জাল ছিল—

উত্তমকুমার সাগ্রহে সমস্ত ঘটনা শুনলেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—এটা আইন করে বন্ধ করা উচিত। কোন সভ্যদেশে এটা লজ্জাকর ঘটনা। ছাত্ররা স্কুল-কলেজে যায় পড়াশুনো শিখতে—সেখানে র‍্যাগিং-এর মত নিষ্ঠুর ঘটনা কেন ঘটবে? মাস্টারমশাইরা তাহলে রয়েছেন কিসের জন্যে? তাঁরা বাধা দিতে পারেন না?

আমি সিনেমার মানুষ। সমাজতত্ত্বের কোন গভীরে আমার যাওয়া দরকার আমি জানি। এবং দেশের কোন সমস্যা নিয়ে ছবি তৈরী করলে আমাদের সামাজিক দায়িত্ব পূরণ হয়—তাও জানি। কিন্তু র‍্যাগিং-এর মত সমস্যা নিয়ে ছবি করার মানসিকতা এখনও যেমন চিত্র নির্মাতাদের হয়নি, দর্শকদেরও হয়নি।

নাম করব কী? নাঃ থাক। আমি জানি—আমাদের একজন জনপ্রিয় অভিনেতার পারিবারিক অশান্তির মূলেই রয়েছে ওই র‍্যাগিং ব্যাপারটা। ভদ্রলোকের বড় ছেলে—পড়াশুনায় বরাবরই ভাল—ওকে সেবার 'সৈনিক স্কুলে' পাঠানো হয়েছিল—উচ্চশিক্ষার জন্যে। কিন্তু ছেলেটি সেখানে টিকতে পারেনি। র‍্যাগিং-এর যন্ত্রণায় একদিন সেখান থেকে পালিয়ে সোজা কলকাতায় চলে এসেছিল। রাত জাগা লাল চোখ। চুল উস্কো খুস্কো। ভয় পাওয়া চেহারা।

অভিনেতা তখন শুটিং করতে স্টুডিওয় যাবেন বলে সবে গাড়ি স্টার্ট দিয়েছেন। ছেলেকে হঠাৎ ওইভাবে আসতে দেখে তিনি তো অবাক। কী ব্যাপার?

ছেলে প্রথমে কিছুই বলতে চায় না।

ছেলের মা'তো রীতিমত ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁর ছেলে এমন কাণ্ড ইতিপূর্বে কখনও করেনি। বাবা অভয় দিলেন—খুলে বলোতো কি হয়েছে? হঠাৎ চলে আসবার মত কি হলো ওখানে? কেউ তোমাকে কিছু বলেছেন? ওখানে থাকতে কোন অসুবিধা হচ্ছিল তোমার?

অনেক পীড়াপীড়ির পর ছেলে শেষ পর্যন্ত সব খুলে বলল। সহপাঠীরা একের পর এক কিভাবে তার ওপর নির্যাতন করেছে। এবং সবটাই

াকি র‍্যাগিং করবার অজুহাতে।

অভিনেতা ভদ্রলোক সব শুনে স্তম্ভিত। স্কুল-কলেজে র‍্যাগিং হয়, এটা অনেকেরই জানা, কিন্তু ছেলের মুখে যা শুনলেন—সেটা প্রায় অবিশ্বাসের পর্যায়েই পড়ে? ঠাট্টা বা ইয়ার্কি নয়, রীতিমত শারীরিক টর্চার, মুখের খাবার নষ্ট করে দেওয়া, দল বেঁধে হুটিং করা, যখন-তখন র‍্যারাকিং করা—এগুলোই র‍্যাগিং।

শুটিং তখন মাথায় উঠেছে। ভদ্রলোক তখনই লেটার প্যাড টেনে নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষকে কড়া ভাষায় চিঠি লিখতে বসলেন—আপনাদের নাকের ডগায় এমন জঘন্য কাণ্ড হচ্ছে, অথচ আপনারা উচ্চবাচ্য করছেন না? আমার ছেলে নয়, আরও কত ছেলে রয়েছে ওখানে, তাদের মনের ওপর এটা মানসিক দিক দিয়ে কি ভীষণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে—তা ভেবে দেখা উচিত……

জানি না সেই চিঠির ফলে হোস্টেলে র‍্যাগিং প্রথা বন্ধ হয়েছে কি না—কিন্তু খবরের কাগজে প্রায়ই যখন র‍্যাগিং সংক্রান্ত চিঠিপত্র প্রকাশিত হতে দেখি—এমন কি ইন্সটিটিউশনের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোন ছাত্রের অভিভাবককে যখন কোর্টে কেস করতে দেখি—তখন সত্যিই চিন্তা হয়। উচ্চশিক্ষার তাগিদে আপনার প্রিয় সন্তানকে দূরের কোন হোস্টেলে রেখে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন কী?

পার্থপ্রতিম চৌধুরী আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একদিন ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে দেখি পার্থরা একদল বসে আড্ডা দিচ্ছে। আমায় ওরা হৈ হৈ করে ডাকল। ব্যস, আমার কাজের দফা-রফা। তৎক্ষণাৎ গিয়ে গরম চায়ের কাপ আর জ্বলন্ত সিগারেট বাগিয়ে বসে গেলাম সিনেমাটিক আড্ডায়। বলে রাখি, এসব আড্ডা স্টুডিওর বাইরে কখনও হয় না। কারণ বাইরের লোক এর মজা বুঝতে পারবে না। পার্থ খুব রোমান্টিক মানুষ। প্রায়ই এর ওর বা তার সঙ্গে প্রেম করছে। তবে সে প্রেম কখনও স্টেডি নয়। বড়জোর দু'চার মাস। তারপরই ভো-কাট্টা। তবে ফিল্মের এই জাতীয় প্রেমে কিন্তু কোন ইল-ফিলিঙস থাকে না। খুব

সহজভাবে নেয় সবাই।

তখন ছায়াছবির গল্পের ম্যারাথন সেশান চলছে ওখানে। একজন বলল—শালা ভূতের গল্পের মার নেই। কবে কোনকালে নরেশ মিত্তির মশাই 'কঙ্কাল' নামে একখানা ভূতুড়ে ছবি করে গিয়েছিলেন—সে-ছবি আজও পয়সা দিচ্ছে। সোজা ব্যাপার?

আর একজন তৎক্ষণাৎ তাকে সমর্থন করে বলল—ভূতের গল্প নিয়ে ছবি সারা পৃথিবীতেই হয়েছে। এখনও হচ্ছে। ভবিষ্যতেও হবে। দর্শকরা যতই আধুনিক ছবি আধুনিক ছবি বলে চীৎকার করুক, একখানা ভূতুড়ে মার্কা ছবি তৈরী হোক, অমনি দেখবে লুকিয়ে লুকিয়ে ইভনিং শো-তে একটা ট্রিপ মেরে এসেছে। কিন্তু মুখ ফুটে স্বীকার করবে না যে দেখেছে। তখন যত অন্তোনিয়নি, বার্গম্যান আর পোলানস্কির খৈ ফোটাবে—

ঠোঁট কাটা জয়ন্ত বলল—ইণ্টেলেকচুয়ালরাই বোম্বের হিন্দী ছবি বেশী করে দেখে। ওখানে সেকস আর ভায়োলেন্সের বেশী সুড়সুড়ি কি না—

পার্থ হেসে বলল—তবে একটা কথা তোমরা জানো কি? ভূতের ছবিতে একটা সাংঘাতিক ব্যাপার আছে। ওসব ছবি মফঃস্বলের সিনেমা হাউসে কেবল ম্যাটিনী শো-তে ভাল চলে। অথচ ইভনিং বা নাইট শো-তে একেবারে দর্শক থাকে না। এমনকি হলের অপরেটররা ছবি চালিয়ে দিয়ে চুপটি করে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে—পর্দায় প্রোজেকশন দেখতে চায় না। রাত-বিরেতে দু' ক্রোশ অন্ধকার মেঠো পথ ভেঙে বাড়ি ফিরতে হবে না? তখন পেছন থেকে নাকি সুরে কেউ যদি—অ্যাঁই ব্যাঁটা, দু'রীল ছঁবি কম দেখালি কেনরে—বলে বসে—আইবাপ—

যথার্থ। মফঃস্বল তো আছেই, এই খোদ কলকাতা শহরে? একজন সিনেমা হলের মালিক আমায় একবার অকপটে বলেছিলেন—উঁহু, ভূতের ছবি হলে নাইট শো একেবারে ফাঁকা। কেউ সাহস করে দেখতে চায় না। হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা, ভূতকে সবাই ভয় করে। এখনও। এই দারুণ

শুনে প্রভাতদা বিরসকণ্ঠে বলল—ধুস আমার গ্যাস লাইটারটা গ্যাঁড়া হয়ে গেছে বাসে—

যাচ্চলে। গ্যাস লাইটারটা প্রভাতদার বড় প্রিয় ছিল—এটা শুধু আমরা কেন তামাম ফিল্ম লাইনের লোকই জানত। প্রভাতদার যখন সিগ্রেট খাবার ইচ্ছে হত ওটি বের করে প্রথমে একজনকে টার্গেট করে নিত, তারপর তার কাছে গিয়ে মুচকি হেসে বলত—কী ধরাবে নাকি? সিগ্রেট।

ব্যাপারটা ছিল এতই সুনিশ্চিত যে কিছু বলতে হতো না কাউকে। তৎক্ষণাৎ প্যাকেট বেরিয়ে পড়ত, তা থেকে বেরুত দুটি সিগ্রেট যার একটি প্রভাতদার। প্রভাতদা বেশ কায়দা করে গ্যাস লাইটার জ্বেলে প্রথমে তার সিগ্রেটটি—পরে নিজেরটায় অগ্নিসংযোগ করে এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে অবশ্যই বলত—কী রকম দেখছো লাইটারটা? বেশ দামী মাল কিন্তু। হেঁ হেঁ হেঁ—

যেন সিগারেটটা এক্ষেত্রে কিছুই নয়, লাইটারটাই মুখ্য।

প্রভাতদা তৎক্ষণাৎ সংযোজন করত—দীপেন (ভট্টাচার্য) আমায় এটা প্রেজেন্ট করেছে। 'আমি সে ও সখা' ছবির গোল্ডেন জুবিলীর জন্যে—

শ্যামল মিত্র আর দীপেন ভট্টাচার্য যুগ্মভাবে ওই ছবিটি প্রযোজনা করেছিলেন। ছবির অভূতপূর্ব সাফল্যে ওঁরা ছবির শিল্পী ও কলাকুশলীদের নানা উপহার দিয়েছিলেন। প্রভাতদার গ্যাস লাইটারটা ছিল তারই অন্যতম। আর রেখেওছিল প্রভাতদা ওটিকে খুব যত্ন করে, আফটার অল প্রেজেন্টেশন বলে একটা কথা।

আর সেটিই গায়েব।

প্রভাতদার রীতিমত মুষড়ে পড়ার অবস্থা—ব্যাটা যদি শ খানেক টাকা ছিল পকেটে, ঝেড়ে দিত—হয়ত অতটা দুঃখ হতো না। নিল নিল একেবারে সেন্টিমেন্টে হাতুড়ি মেরে নিল। খচরামোর একটা মাত্রা আছে—

—আহা বেচারিকে অত বকছো কেন? ওকি জেনেশুনে নিয়েছে যে ওটা তোমার একটা উপহার পাওয়া মাল?

—ম্যালা বকো না। আমি মরছি আমার দুঃখে, উনি এলেন পকেট-মারের হয়ে সালিশি করতে—প্রভাতদা রেগে কাঁই।

যাই হোক অতি কষ্টে সেযাত্রা ম্যানেজ হল।—আরে নাও নাও, সিগ্রেট ধরাও, দুঃখের কথা ভুলে যাও, ও দীপেন আবার তোমাকে একটা গ্যাস দিয়ে দেবে। ম্যালা টাকা পেয়েছ তো, আচ্ছা আমরাই না হয় দীপেনকে বুঝিয়ে বলব।

প্রভাতদা তখন কিছুটা নিমরাজী হয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সিগ্রেটটা ধরালো। তারপর হেসে বলল—দেশলাই ঠুকে সিগ্রেট ধরালে আজকাল আর তেমন মেজাজ পাই না। যাই হোক তোমার ছবির আউটডোর শুটিং কেমন হচ্ছে বলো—

ক্যামেরাম্যান ধ্রুব বলল—বেশ ভালই হচ্ছে।

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার আর আমাদের আড্ডা জমে উঠল। এদিন স্টুডিওতে দুটো ছবির প্রোগ্রাম চলছে। ডে শিফটে দু নম্বর ফ্লোরে চলছে রাজবংশ ছবির কাজ, আর নাইট শিফটের জন্যে এক নম্বর ফ্লোর ক্রমে ক্রমে তৈরী হয়ে উঠছে। উত্তমকুমার রাজবংশ প্যাকআপ করে মেকআপ আর পোষাক বদলে নাইট শিফটের ছবিতে অভিনয় করবেন। প্রভাতদা গল্প করতে করতে নজর রাখছিল সেদিকে। কাজ তো নয় যেন হাজারটা বখেড়া। একটা ফ্লোরের কাজ শেষ হবার পর পরই ওখানকার লাইট অন্য ফ্লোরে চালান হয়ে যাবে। মাঝখানে স্টুডিওর কলাকুশলীদের ওভারটাইম চালু হবে। সবই প্রভাতদাকে তদারক করতে হবে। অফিসে থেকে থেকে ঝন ঝন্ করে ফোন বাজছে—হ্যালো, না উনি এখন আসতে পারবেন না। শট দিচ্ছেন। ঘণ্টা খানেক পরে ফোন করবেন……

—তারপর প্রভাতদা।

—হ্যাঁ তারপর সেই মাইথোলোজিক্যাল ছবির দাঁড়াও—নামটা আবছা আবছা আমার মনে পড়ছে—তিলোত্তমা-টমা গাছের কিছু হবে, ভাই ভুলে গেছি, অনেকদিন আগেকার কথাতো, ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে শুটিং

লছিল—একদিন ছবির ডিরেকটার আমায় ডেকে বললেন, প্রভাত কাল রাজসভার সেট লাগছে, প্রচুর একস্ট্রা লাগবে—

—পুরুষ না মেয়েছেলে দাদা?

—ছটোই ধর ফিপ্‌টি ফিপ্‌টি—এক কুড়ি পুরুষ আর এক কুড়ি মেয়ে—যানে যুবতী উইথ ফুল রয়্যাল কস্ট্যুম। বেশ গ্রাঞ্জার দিতে হবে তো। রাজসভার সেট—

—ঠিক আছে, পেয়ে যাবেন।

প্রভাতদা হেসে বলল—তখনকার দিনের কথা ভাই ফিল্মে যেসব মেয়েরা আসত তারা আসত ইয়ে থেকে মানে—

—ঠিক আছে ঠিক আছে, বলে যাও—

—তা বলে কিন্তু কোন হ্যাক থুঃ নয়। স্টুডিওতে এসে ওরা কখনো কোনরকম বেচালপনা করত না। ভীষণ ভদ্র ছিল সেসব মেয়েরা ভাই—এতো চোখের ওপরই দেখেছি। যাই হোক আমার সহকারীকে পাঠিয়ে দিলাম। তখন স্টুডিও থেকে মেয়েদের আসা-যাওয়ার জন্যে গাড়ী দেওয়া হত। ভোর হতে না হতেই আমার সহকারী এক ঝুড়ি মেয়ে এনে স্টুডিওতে নামিয়ে দিয়েই গঙ্গাচান করতে চলে গেল।

আমি অফিসে বসে একে একে সবার নাম লিখে নিলাম। নাম ধরে ধরে সবাইকে পেমেণ্ট করতে হবে—রাহাখরচ লিখতে হবে। তা এর মধ্যে একটা মেয়ে, যদ্দুর মনে পড়ছে তার নাম পার্বতী, এসে বলল—দাদা, আমায় একটা কলকার্ড লিখে দিন—

সেকালে আর্টিস্টদের কলকার্ড দেবার নিয়ম ছিল। অবশ্য আজও আছে। মেয়েটা সম্ভবতঃ ফিল্মে নতুন, তাই পাঁচজনকে দেখাবার জন্যে একটা কলকার্ডের আবদার ধরে বসেছিল। কলকার্ডে লেখা থাকত—আপনি অমুক, আপনি অত তারিখে অতটা সময়ে অমুক স্টুডিওতে অমুক ছবির চরিত্রাভিনয়ের জন্য অনুগ্রহ করিয়া হাজির থাকিবেন। বাড়ি হইতে কোম্পানীর গাড়ী আপনাকে স্টুডিওতে লইয়া আসিবে। নীচে শিল্পীর নিজের হাতে স্বাক্ষর থাকবে। প্রধান প্রধান শিল্পীদের ক্ষেত্রেই

এই কলকার্ড ইস্যু করা হত। জুনিয়ার আর্টিস্টদের মুখে মুখে ডেট বা
দেওয়ার রেওয়াজ ছিল।

এখন পার্বতী মেয়েটি আমায় এমনভাবে ধরল যে আমি শেষে বির
হয়ে ওকে ওর নাম ও ঠিকানা এবং শুটিং-এর ডেট লিখে একটা কলকা
লিখে দিলাম। আর ওটাই হল কাল। দাও সিগ্রেট দাও—

সিগ্রেট, দেশলাই, ধোঁয়া।

প্রভাতদা নজরটা ঘুরিয়ে আবার আরম্ভ করল :

তারপর সে ছবি শেষ হয়ে গেছে, রিলিজও হয়ে গেছে, প্রোডিউস
ভাল পয়সাও পেয়ে গেছে, আমাদের সঙ্গেও ফুল অ্যাণ্ড ফাইন্যা
সেটেলমেণ্ট হয়ে গেছে। তারপর আমি ওই কনসার্ন ছেড়ে অ
কোম্পানীর ছবি করেছি পর পর বেশ কয়েকখানা। তারপর ঘুরতে ঘুর
এসে জয়েন করেছি কানন দেবীর শ্রীমতী পিকচার্সে। হরিদাস ভট্টাচা
শ্রীমতীর ব্যানারে তখন ছবি করছেন। আজকের তরুণ মজুমদা
দিলীপ মুখার্জি এবং শচীন মুখার্জি তখন মিস্টার ভট্টাচার্যের সহকা
পরিচালক হিসাবে কাজ করছেন।

একদিন স্টুডিও থেকে বাড়ি গেছি খেতে—দেখি আমার বৌ গা
হাত দিয়ে বসে আছে। মুখ থমথম করছে।

—কী ব্যাপার ? আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করতেই বৌ গুম গুম ক
বলল—পুলিশ তোমার খোঁজ করছে কেন ?

—এ্যাঁ ? পুলিশ ? তোমায় কে বলল ?

—আবার কে—পুলিশই বলল—

শুনে আমার কি অবস্থা। চোর নই, চিটিংবাজ নই, আমি একজ
নিরীহ ফিল্ম-প্রোডাকশন ম্যানেজার—পুলিশ আমার খোঁজ করবে কো
হায়ুশে ? তাড়াতাড়ি নার্ভাসনেস চাপা দেবার জন্য বললাম—ঘাব
যাচ্ছ কেন ? নিশ্চয়ই ঠিকানা ভুল করে এসেছে। আরও তো প্রভাত দা
আছে।

—না, স্পষ্ট করেই তোমার খোঁজ করল। জিগ্যেস করছিল কথ

খন বাড়ি থাকো তুমি, কোথায় যাও, আমি অবিশ্যি কিছুই বলিনি—

—বেশ করেছো, আচ্ছা আমি দেখছি গিয়ে।

গলা দিয়ে কি ভাত নামে? দুর্ভাবনায় মন অস্থির। স্টুডিওতে গিয়ে খোঁজ নিলাম কেউ আমার খোঁজে এসেছিল কিনা—কিন্তু নাঃ, কেউ আসেনি। তারপর কাজকর্মের চাপে কথাটা এক সময় বেমালুম ভুলেই গেলাম।

রাত্রে বাড়ী ফিরেছি। অন্ধকারে বৌ দাঁড়িয়ে। দেখেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল।—পুলিশ এসেছিল তোমার খোঁজে। বলে দিয়েছি তুমি কলকাতার বাইরে আউটডোর শুটিং করতে চলে গেছে—

ধুলো পায়েই তখুনি বেরিয়ে পড়লাম। ফোন করলাম ম্যাডামকে। উনি সব শুনে অবাক। বললেন, ঠিক আছে, আমি খোঁজ নিচ্ছি।

ম্যাডাম ফোনে খোঁজ নিয়ে জানালেন, না, টালীগঞ্জ বা যাদবপুর থানা থেকে কোন এনকোয়ারি নেই, ওরা বললে প্রভাত দাসের নামে কোন কেস এখানে নেই, নিশ্চয় কোন মতলববাজ লোকের কাণ্ড, পুলিশের নামে ব্ল্যাকমেল করার ফন্দি এঁটেছে—আমি তবুও ওপরে খবর নিচ্ছি, আপনি নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী যান—দরকার হলে আমায় ফোন করবেন—

মিষ্টার ভট্টাচার্য কড়া সাহেবী মেজাজের মানুষ, এককালে লাটসাহেবের এ'ডিকং ছিলেন, উনি নিজে অভয় দিলেন।

কিন্তু মন থেকে ভয় যেন কিছুতেই যায় না। পুলিশ হঠাৎ আমারই বা খোঁজ করবে কেন? আমার তো কোন ব্যাড রেকর্ড নেই—ব্যাড অ্যাসোসিয়েশন নেই, বদমাশদের সঙ্গে উঠবোস নেই—তাহলে? আর ব্ল্যাকমেল? কি আর আমার এমন হাতিঘোড়া টাকাপয়সা বা ঐশ্বর্য আছে যে সব ছেড়ে শেষে আমাকেই পাকড়াও করবে? চিন্তায় চিন্তায় চোখে ঘুম আর যেন কিছুতেই আসে না সে রাত্রে। নানা রকম উল্টোপাল্টা ভাবনা ঢুকে পড়ে মাথা আরও খারাপ করে দিতে লাগল।

ছবি করতে গিয়ে চিত্রনির্মাতাকেও যে কখনো কখনো পুলিশের খপ্পরে গিয়ে পড়তে হয়—সে নজিরও কলকাতায় আছে।

বেশ কিছুদিন আগে জনৈক পরিচালক একটি ক্রাইম বাংলা ছবি তুলতে গিয়ে বিষম প্যাঁচে পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁর গল্পে একটা সিন ছিল যেখানে দেখানো হচ্ছে যে অপরাধী দিন-দুপুরে এক কর্মব্যস্ত রেল ষ্টেশনে রেলের ক্যাশব্যাগ লুট করে গুলি চালাতে চালাতে পালিয়ে যাচ্ছে। এখন এই দৃশ্যটি স্টুডিওর ফ্লোরে তোলা কিছুতেই সম্ভব নয়। তুলতে হলে কোন রেলষ্টেশনেই শুটিং করতে হয়। তাই ছবির প্রযোজক শহরতলীর একটি রেলষ্টেশন ছবির লোকেশান হিসাবে সিলেক্ট করলেন। পরিচালকও অ্যাপ্রুভ করলেন। রেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিয়মমাফিক অনুমতি নেওয়া হল। তারপর নির্ধারিত দিনে সেই ষ্টেশনে গিয়ে সেই দৃশ্যের আদ্যন্ত চিত্রগ্রহণ করা হলো। তাতে চমকপ্রদ রেজাল্ট পাওয়া গেল। যদিও সবটাই সাজানো ব্যাপার, কিন্তু সেই মুহূর্তে যে-সব যাত্রী প্লাটফর্মে ট্রেনের জন্যে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা হঠাৎ গুলি বোমার আওয়াজ পেয়ে ভয়ে আতঙ্কে ছোটাছুটি আরম্ভ করে দিল। আর সেই প্যাণ্ডামো নিয়মের মধ্যে ছবির পরিচালক চমৎকার কাজ গুছিয়ে নিলেন। মারাত্মক রিয়ালিস্টিক শট উঠে গেল পর-পর কয়েকটা।

তারপর ওঁরা ষ্টেশন থেকে চলে এলেন। আসবার সময় ষ্টেশনের স্টাফদের যথারীতি ধন্যবাদ দিয়েও এসেছেন।

আর ঠিক এর কয়েকদিন পর সেই ষ্টেশনেই একটা সাংঘাতিক ডাকাতি হয়ে গেল। ষ্টেশনমাষ্টার তাঁর কালেকশন ব্যাগ যখন জমা দিতে যাচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ একজন সশস্ত্র লোক তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে দে-দৌড়। ষ্টেশনমাষ্টার প্রথমে হতভম্ভ, তারপর তিনি চেঁচাতে লাগলেন —পাকড়াও, পাকড়াও—

পলাতক অপরাধী তখন বোমা ছুঁড়তে আরম্ভ করেছে।

এখন সেই সময় যারা প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত ছিল তারা ভাবল—আজও বোধহয় সেই ফিল্মেরই শুটিং হচ্ছে। কারণ কদিন আগে ঠিক এই একই

স্টাইলে সিনেমার নায়ক ক্যাশব্যাগ লুট করে পালাচ্ছিল এবং থেকে থেকে গুলি আর বোমা ছুঁড়ছিল। তাই আজকের এই লোকটাকে তাড়া করা দূরে থাক, সবাই দাঁত বের করে বেশ হেসে হেসে দৃশ্যটি উপভোগ করতে লাগল। ষ্টেশন মাষ্টারের পক্ষে ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝাতেই অনর্থক আধঘণ্টাখানেক সময় বয়ে গেল। আর ততক্ষণে ক্যাশব্যাগ-সহ লোকটি পগার-পার।

তারপর পুলিশে খবর গেল। পুলিশ এসে সব ব্যাপারটা বুঝল। তারপর আরম্ভ হলো জোর তদন্ত।

প্রথম সুযোগে পুলিশ গোয়েন্দারা আটক করল সেই ফিল্ম ইউনিটের লোকজনকে। সবাই তো হতভম্ব। সব শুনে পরিচালকের চোখ কপালে ঠেলে উঠল—সে কি, এ-যে একেবারে ডাকাতি।

পুলিশের তরফ থেকে বলা হলো—হুবহু। আপনারা যেভাবে ছবির শুটিং তুলেছেন, ঠিক সেইভাবেই ক্যাশব্যাগ লুট হয়েছে। এখন বলুন—লোকটি কে?

—সে আমরা কি করে বলব? এই ঘটনার জন্যে আমরা কেন দায়ী হতে যাবো?

—কিন্তু কানেকশন যে একটা রয়েছে ইন্সিডেণ্টাল, মোটিভ অফ ক্রাইম একই ধরনের।···আচ্ছা, আপনারা যে দৃশ্যের শুটিং করেছেন, আমরা তা কি একবার দেখতে পারি?

পরিচালক এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন।

তক্ষুনি ল্যাবরেটরীতে নির্দেশ দেওয়া হলো যে ওই সিনের সমস্ত নেগেটিভ তাড়াতাড়ি প্রিণ্ট করে দেওয়া হোক, পুলিশ ওই দৃশ্যের রাশ প্রোজেকশান দেখবে। নির্দেশ পেয়ে তাড়াহুড়ো করে সিন প্রিণ্ট হলো। তারপর ছবি প্রোজেক্ট করা হল স্টুডিওর মিনিয়েচার সিনেমা হলের পর্দায়।

কলকাতার সব ঝানু ডিটেকটিভরা বসে ছবির সেই দৃশ্য বেশ কয়েকবার দেখলেন। ষ্টেশনমাষ্টারের স্টেটমেণ্টের সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে ঘটনাটা। একটা ট্রেন এসে দাঁড়াচ্ছে। এই ট্রেনটি প্রত্যেক ষ্টেশনের টাকার

কালেকশনের ব্যাগ তুলতে তুলতে আসছে। এখানে দেখা যাচ্ছে ষ্টেশন-মাষ্টার সীল করা ব্যাগ নিয়ে ক্যাশ কম্পার্টমেণ্টের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ একটি লোক হাতে ওপেন রিভলবার নিয়ে সেদিক ছুটে আসছে। ষ্টেশনমাষ্টার অসহায়ভাবে তাকিয়ে আছেন। লোকটি এক ঝটকায় তাঁর হাত থেকে ব্যাগটি ছিনিয়ে নিয়ে ছুটতে আরম্ভ করেছে। গুলি চালাচ্ছে। থলি থেকে বোমা বের করে ছুঁড়ছে। প্ল্যাটফর্মের লোকজন আতঙ্কে ছোটাছুটি করছে। চারিদিকে ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে। ব্যস, অপরাধী হাওয়া।

ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের বড়কর্তারা এটা সহজেই বুঝলেন যে শুটিং-এর দিন আসল ক্রিমিন্যালটি ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে থেকে সমস্ত জিনিষটি ওয়াচ করেছে। তারপর শুটিং-এর গন্ধ থাকতে থাকতেই একদিন সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার শিকারের ওপর। তারপর বিনা রক্তপাতেই বেশ কয়েক হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়ে সে গা ঢাকা দিয়েছে।

এদিকে ফিল্ম ইউনিটের অবস্থা খুব অস্বস্তিকর। তাদের দেখ্‌নাই এতবড় একটা ঘটনা ঘটবে—এটা কেউ কল্পনা করেনি। পুলিশের প্রশ্নের তোড়ে তারা রীতিমত অস্থির।

ভাগ্য ভাল যে শেষ পর্যন্ত ক্রিমিন্যালটি ধরা পড়ল পুলিশের জালে। আসলে সে একটি দাগী আসামী। ইতিপূর্বে নানা অপরাধে সে বহুবার জেল খেটেছে। যেদিন শুটিং হচ্ছিল তখন ঘটনাচক্রে সে সেই ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল। শুটিং দেখে লোকটার মাথায় আইডিয়াটা তৎক্ষণাৎ ক্লিক্ করে—বাঃ খাশা কায়দা তো, আমি যদি এইভাবে মাল হাতিয়ে সরে পড়ি তো পুলিশ ফিল্মের লোককেই সন্দেহ করবে—আমার টিকিও ধরতে পারবে না।

কিন্তু কথায় বলেনা—'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে'—শেষ পর্যন্ত হলও তাই।

এবার প্রভাত দাসের কাহিনীতে ফেরা যাক।

প্রথমে হদিশই করা গেল না যে পুলিশ কেন প্রভাত দাসকে খোঁজ

করছে। প্রভাতদা তো ভয়ে অস্থির, জীবনে সে কখনো পুলিশের ধারে কাছে হাঁটেনি, আর এই বুড়ো বয়েসে···

গভীর রাত। পাড়া নিঝুম। হঠাৎ সদর দরজার কড়া জোর নড়ে উঠল।—প্রভাতবাবু আছেন? প্রভাতবাবু?

শুনে সদ্য সদ্য ঘুম ভেঙ্গে বিছানায় উঠে বসা প্রভাতদার শরীরের রক্ত যেন সঙ্গে সঙ্গে হিম হয়ে গেল—এই সেরেছে—

—কে?

রাস্তা থেকে হেঁড়ে গলায় জবাব এলো—একবার বাইরে আসুন—

বৌ জানলার কপাট ফাঁক করে বাইরে তাকিয়ে দেখে—অন্ধকার রাস্তায় কয়েকজন লোক টর্চ জ্বেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অদূরে একটা পুলিশের ভ্যান দাঁড়িয়ে। ব্যস, ভয়ের চোটে গলা শুকিয়ে কাঠ।

আবারো হেঁড়ে গলা—প্রভাতবাবু, বাইরে আসুন—

প্রভাতদা নিরুপায় কাঁপা গলায় প্রশ্ন করল—কেন বাইরে আসতে হবে কেন? আপনারা কে? কোত্থেকে আসছেন?

—আপনার নামে ওয়ারেণ্ট রয়েছে মশাই। আমরা লালবাজার থেকে আসছি—

—এঁ্যা?

—আপনার কোন ভয় নেই বেরিয়ে আসুন, দু-একটা প্রশ্ন করার আছে আপনাকে—

—তা ওখান থেকেই করুন, আমি পারলে এখান থেকেই জবাব দিয়ে দিচ্ছি—

পুলিশ অফিসার এবার হেসে ফেলল—দূর মশাই, বেরিয়ে আসুন না, আপনি অনর্থক ভয় পাচ্ছেন—

প্রভাতদা কি আর সহজে বেরুতে চায়? (প্রভাত দাস বলে নয়—এই পরিস্থিতিতে কোন বীরপুরুষই বেরুতো না) এই নিয়ে কিছুক্ষণ কথা চালাচালি হল।—আপনারা যে পুলিশ এটা কিভাবে বুঝব? অন্য কোন মতলববাজও তো হতে পারেন। তাছাড়া আমি এমন কোন কাজ করিনি যে

পুলিশে আমায় খুঁজবে। তারপর আসতে হয় দিনের বেলায় আস্থন। রাতের বেলায় আমি ঘর ছেড়ে বেরুব না—ইত্যাদি ইত্যাদি।

পুলিশ অফিসার অভয় দিল—তাহলে একটা সই করে দিন।

—কিসে?

—এই ফর্মে—

—কেন সই করব?

তখন অফিসারটি বলল—না করলে আপনি ভীষণ বিপদে পড়ে যাবেন বলে দিচ্ছি। এটা সই করুন, আর কাল সকালে অবশ্য অবশ্য লালবাজারে আসবেন। যদি না আসেন তো আপনাকে অ্যারেস্ট করা হবে—

তখন প্রভাতদা সিরিয়াস—কেন ব্যাপারটা কি বলুন তো মশাই, আমি এমন কি কাণ্ড করলাম যে—

অফিসার বলল—আপনি কিছু করেননি তবে মানুষের কপাল খারাপ হলে অনেক কিছুই হতে পারে। আপনি পার্বতী নামে কোন মেয়েকে চেনেন?

—পার্বতী? না-তো!

পুলিশ অফিসার হেসে বললেন—গুড। তাহলে আর ভয় কিসে? সকালে লালবাজারে চলে আস্থন, তখনই সব ব্যাপারটা জানতে পারবেন। এখন চলি। গুড নাইট—

ফর্ম সই করে নিয়ে পুলিশভ্যান চলে গেল। আর তখন প্রভাতদার মাথায় চক্কর দিতে থাকল একটি মেয়ের নাম—পার্বতী, পার্বতী, পার্বতী! হু ইজ ছাট গার্ল? উঁহু, কোন পরিচিত মেয়ে নয় তো!

পরদিন লালবাজারে যেতে একজন অফিসার বললেন—যাক আপনি এসেছেন, আমাদের বাঁচালেন—দেখুন তো এই মেয়েটিকে চিনতে পারেন কিনা?

বলে অফিসার একটা পাশপোর্ট সাইজের ফটো টেবিলের ওপর রাখলেন। ছবিটা ভালভাবে দেখেও প্রভাত দাস চিনতে পারল না

মেয়েটিকে।

—উঁহু চিনতে পারছি না—

অফিসার তখন স্টুডিওর একটা ছাপানো 'আর্টিস্ট কলকার্ড' প্রভাত দাসের হাতে দিলেন।—তলায় আপনার সই রয়েছে না?

সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ হলো—হ্যাঁ, এটা তো সেই কবেকার 'তিলোত্তমা' ছবির শুটিং-এর কলকার্ড। হাঁ, সইটাও আমারই বটে—

—তা আপনি নিজের হাতেই লিখেছেন এই কলকার্ড, এখন কী করে অস্বীকার করছেন যে এই মেয়েটিকে আপনি চেনেন না?

—কেন মেয়েটি কি করেছে কী?

অফিসার হাসলেন।—মেয়েটি সম্প্রতি খুন হয়েছে—

প্রভাত দাসের বুকটা ধ্বক করে উঠল—খ-খুন! সর্বনাশ। কোথায়? কিভাবে? কে খুন করল?

—খুনীও ধরা পড়েছে।

—ধরা পড়েছে? ব্যস, দিন ব্যাটাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে—

পুলিশ অফিসারের বক্তব্য, খুনের পর মেয়েটির ঘর সার্চ করবার সময় এই কলকার্ডটা পাওয়া গেছে। আমরা জানতে চাইছি এই পার্বতী নামের মেয়েটি কি রেগুলার আর্টিষ্ট ছিল ফিল্মের?

প্রভাত দাস বলল—না, সেরকম কিছু নয়। একে, আমি মাত্র একবারই দেখেছি স্টুডিওতে, এসেছিল এক্স্ট্রার পার্ট করতে।

—কিন্তু কলকার্ড ইস্যু করা হল কেন? আপনারা কি বড়-ছোট সব আর্টিষ্টকেই কলকার্ড দিয়ে থাকেন?

—না। শুধুমাত্র বড় আর্টিষ্টদের ক্ষেত্রেই কলকার্ড ইস্যু করা হয়।

—তাহলে পার্বতী বলছেন একজন ছোট, এক্সট্রা আর্টিষ্ট। এর নামে কেন ইস্যু করা হল?

তখন প্রভাতদার স্মরণ হল ঘটনাটা।

শুটিং-এর দিন সকালে মেয়েটি অফিসে এসে বারবার অনুরোধ করছিল, দাদা আমাকে একটা কলকার্ড লিখে দিন। প্রভাতদা বলেছিল, না তা

হয় না। তোমার যেদিন যেদিন শুটিং মুখে বলে দেওয়া হবে। তখন মেয়েটি অনুনয় করে বলেছিল, আমার মা বিশ্বাস করবে না যে আমি শুটিং করতে যাচ্ছি। কিন্তু কলকার্ড থাকলে ছেড়ে দেবে। আমার সিনেমায় পার্ট করার ভারি ইচ্ছে। মা রাজী নয়। তাই যদি কাইগুলি একটু লিখে দেন তো বাড়ী থেকে কোন আপত্তি হবে না…। আচ্ছা ঠিক আছে, দিচ্ছি লিখে কি যেন নাম তোমার…পার্বতী! ঠিকানা…এই নাও, যে যে ডেট লেখা আছে সেই সেই দিন তুমি শুটিং করতে আসবে। যাও এখন। আর বিরক্ত করো না। মেয়েটি খুশীমুখে প্রণাম করে চলে গিয়েছিল।

সব শুনে পুলিশ অফিসার বললেন—উই অ্যাকসেপ্ট ইয়োর স্টেটমেণ্ট। কিন্তু কোর্টে দাঁড়িয়ে এসব কথা আপনাকে বলতে হবে।

—আবার কোর্ট? এমনিতেই ব্লাডপ্রেশার চড়ে গেছে—

—কেন ভয় কিসের? আপনি হচ্ছেন সরকার পক্ষের সাক্ষী। গভর্নমেণ্ট আপনাকে তার জন্মে উপযুক্ত ইয়ে মানে সম্মান দেবে—

—মাথায় থাকুক মশাই ও সম্মান, আমি কোর্টে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে পারব না। জজসাহেব উকিল-টুকিল দেখলেই, আমার কেমন সব যেন গুবলেট হয়ে যায়—

—বাজে কথা বলবেন না। সিনেমায় আপনারা কোর্টসিন করেন না? সেখানে উকিলের সওয়াল আর সাক্ষীর জবাবের ঠ্যালায় তো দেখি ত্রিভুবন অন্ধকার হয়ে যায়। যান, এবার এট্টু কষ্ট করে সেটা আসল কোর্টে দাঁড়িয়েই একবার দেখিয়ে দিন—

প্রভাত দাস হাসবে না কাঁদবে স্থির করতে পারল না।

অফিসার বললেন—কোল্ড ব্লাড মার্ডার মশাই, মেয়েটাকে কুপিয়ে কুপিয়ে মেরেছে। সুতরাং এই কেস আমাদের দারুণভাবে লড়তে হবে। আসামীপক্ষের উকিল বলছে—মেয়েটি নাকি কোরাপটেড ছিল, বাজে, চরিত্রের, খারাপ চরিত্রহীন সব লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা করত। এটা একটা অজুহাত হিসাবে খাড়া করতে চাইছে। বাট নাথিং ডুইং—

ফলে প্রভাত দাসকে শেষপর্যন্ত কোর্টে যেতেই হল। পার্বতীরাণী

খুনের মামলায় সরকার পক্ষের সাক্ষী হয়। প্রভাত দাসের বুকের মধ্যে তখনই শুরু হয়ে গেল ঢেঁকির পাড়ের ধপাধপ শব্দ। পুলিশ অফিসার মৃদু হেসে বললেন—কোর্ট বলতে কিন্তু ব্যাঙ্কশাল কোর্ট নয়—হাইকোর্ট। মামলা হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে।

সর্বনাশ। আবার বলছে হাইকোর্ট? প্রভাত দাসের হার্ট অ্যাটাক হবার দাখিল। বন্ধুরা অভয় দিল—চিন্তার কিছু নেই। কারণ স্মলকজের চাইতে হাইকোর্ট ঢের ভদ্দরলোকের জায়গা। বিশেষ করে সিনেমার লোকের কাছে। হাইকোর্টে শিক্ষণীয় অনেক কিছু আছে—

নির্ধারিত দিনে বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে প্রভাত দাস হাইকোর্টে হাজির হল। শমন দেখে নিয়ে কোর্ট ইন্সপেকটার বললেন—ঠিক আছে। এইখানে দাঁড়ান। সময়মত ডাক পড়বে আপনার। প্রথমে সরকার পক্ষের অ্যাডভোকেট আপনাকে সওয়াল করবে। সব গুছিয়ে বলবেন মশাই।

নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ে প্রভাত দাস। তারপর আপনমনে বিড়বিড় করে সব গুছিয়ে বলতে আরম্ভ করল।—আমার নাম শ্রীপ্রভাত দাস। আমার বাবার নাম···। মানে নাম ধাম সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছিল।

হাইকোর্টের অলিন্দে হঠাৎ বিকট এক চীৎকারে প্রভাত দাসের সহসা চৈতন্য হল। একজন উর্দিপরা আর্দালি তারস্বরে চেঁচাচ্ছে—প্রভাত দাস—সাক্ষী প্রভাত দাস, হা—জীইইইই-র!

প্রভাত দাস তড়াক করে লাফিয়ে উঠে—এ যে ভাই, এই যে আমি হাজির।

—চলুন।

আর্দালির পেছনে পেছনে ভেতরে ঢুকে প্রভাত দাস দেখল—অদূরে আসামীর খাঁচায় দাঁড়িয়ে একটি ছোকরা তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে। প্রভাত দাস অবাক। তাহলে এই ব্যাটাচ্ছেলের কীর্তি? এই ব্যাটা খুনখারাবি করে তাকে সুদ্ধু জড়িয়ে দিয়েছে? আজ হচ্ছে তোমার ব্যবস্থা।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে প্রভাত দাস শপথবাক্য উচ্চারণ করল। তারপর একজন আইনজ্ঞ তাকে প্রশ্ন করলেন—মশায়ের কি করা হয়।

—আজ্ঞে বায়োস্কোপ।

—বায়োস্কোপ মানে সিনেমা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—গুড। সেখানে কি ধরনের কাজ করা হয়?

—আজ্ঞে আমি সিনেমার প্রোডাকশন ম্যানেজার।

—প্রোডাকশন ম্যানেজারের কি ধরনের কাজ?

প্রভাত দাস বলল—আজ্ঞে ছবি তুলতে হলে প্রচুর জিনিসপত্র, লোকলস্কর দরকার হয়। মানে হরেকরকম মালপত্র। আমি সেইসব জিনিসপত্র জোগাড়যন্তর করে দিই। অর্থাৎ পরিচালক যেমন যেমন অর্ডার করেন।

—এখন দেখুন তো এই ছবিটা চিনতে পারেন কিনা?

প্রভাত দাস ঝেড়ে অস্বীকার করল।—না, চিনতে পারলাম না।

—অ। তাহলে এই কার্ডটা? এতে আপনার সই আছে। এটা চিনতে পারছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এটা চিনতে পারছি। সইটা আমারই।

উকিল তখন বিচারকের উদ্দেশ্যে—মী লর্ড, সাক্ষীর এই কার্ডটি নিহত পার্বতীরাণীর ঘর থেকে পাওয়া গিয়েছে। প্লীজ নোট। আচ্ছা মিষ্টার দাস, আপনাদের ছবির সব আর্টিস্টকে এই ধরনের কলকার্ড দেওয়া হয় কি?

—না স্যার সবাইকে না। শুধু প্রিন্সিপ্যাল আর্টিস্টদের কলকার্ড ইস্যু করা হয়ে থাকে। যাতে আমাদের শুটিং ডেট ওঁরা ভুল করে অন্য কোন ছবিতে না দিয়ে দেন—সেইজন্যেই কলকার্ডের ব্যবস্থা।

—তাহলে এই পার্বতী মেয়েটিকে আপনাদের ছবির একজন প্রিন্সিপ্যাল আর্টিস্ট বলে ধরে নিতে হবে?

—আজ্ঞে না। মেয়েটি আমায় এই কলকার্ডের জন্য খুব করে ধরেছিল

বলে আমি এমনিই ওকে এই কার্ডটা লিখে দিয়েছিলাম। কোন এক্সট্রাকে কলকার্ড ইস্যু করা হয় না। ও বলেছিল ওর মা নাকি ওকে স্টুডিওতে আসতে দিতে চাইছে না। কলকার্ড দেখালে মা ওকে ছেড়ে দেবে—এই কথা বলায় আমি এটা লিখে দিয়েছিলাম যাতে মেয়েটির সুবিধা হয়। কিন্তু এত কাণ্ড হবে হুজুর জানতাম না: উঃ।

—আপনি থামুন—সঙ্গে সঙ্গে এক ধমক—যা জিগ্যেস করছি শুধু তার সঠিক উত্তর দিয়ে যান—

—আজ্ঞে তাই তো দিচ্ছি। প্রভাত দাস কঁকিয়ে উঠে বলল।

—হ্যাঁ। তাই দেবেন।...আচ্ছা এবার বলুন, সুপার-এক্স্ট্রাদের কত পেমেণ্ট করা হয়?

— আজ্ঞে কুড়ি টাকা।

—এরা সব কোত্থেকে আসে?

—তা বলতে পারব না।

—তা কিভাবে এদের সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ হয়?

—এরা স্টুডিওতে খবর নিতে আসে। আমাদের দরকার লাগলে অমনি মুখে মুখে বলে দেওয়া হয়—অমুক তারিখে শুটিং আছে চলে আসবে। ওরা ঠিক চলে আসে।

—ছবির কখন শুটিং হয় স্টুডিওতে?

—দিনের বেলায়। সাধারণতঃ সকাল ন'টা থেকে বেলা ছ'টা পর্যন্ত।

—রাত্রে শুটিং হয় না?

—হয়—তবে খুব কম। রাত্রের দিকে কেউ বড় একটা শুটিং করতে চায় না।

—আপনার এই 'তিলোত্তমা' ছবিতে আর কোন কোন আর্টিস্ট পার্ট করেছিল?

—সে অনেকে। ধরুন নীতিশ মুখার্জি, শৈলেন চৌধুরী, নবদ্বীপ হালদার, রঞ্জিত রায় আর নূরজাহান। মানে এঁরা ছিলেন প্রিন্সিপ্যাল আর্টিস্ট।

—আর ডিরেকটর কে ? অন্যান্য টেকনিশিয়ান্সদের নাম বলুন।

—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। রঞ্জিত রায় ছিলেন মিউজিক ডিরেকটর কাম ড্যান্স ডিরেকটর। পঙ্কু চৌধুরী (অহীন্দ্র চৌধুরীর ভাই) ছিলেন ডিরেকটর অফ ফটোগ্রাফী। দশরথ বিশাল ছিল অপরেটিং ক্যামেরাম্যান (ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর এই নিরক্ষর, উড়িষ্যাবাসী দশরথ বিশালের হাতে কাজ শিখে আজ কলকাতার বহু ক্যামেরাম্যান চলচ্চিত্র শিল্পে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। দশরথ এই ছিয়াত্তর সালের জানুয়ারী মাসে ইন্দ্রপুরী স্টুডিও থেকে রিটায়ার করে সম্প্রতি দেশে ফিরে গেছে)। আর ছবিটি সম্পাদনা করেছিলেন খ্যাতনামা এডিটার রবীন দাস (ইনি আজও চলচ্চিত্র শিল্পে কর্মরত)।

আইনজ্ঞ ওকে থামিয়ে দিলেন—ঠিক আছে ঠিক আছে, আর বলতে হবে না। এই পার্বতীরাণী আর কোন্ কোন্ ছবির কাজ করেছে তা জানেন ?

—আজ্ঞে জানি না।

—তাহলে পার্বতীরাণীর কলকার্ডে ছাপার অক্ষরে লেখা আছে যে 'কার উইল বী সেণ্ট অ্যাট ইওর প্লেস'—এর অর্থ কী ? গাড়ী করে স্টুডিওয় আনা হতো অথচ পৌঁছে দেওয়া হতো না ?

প্রভাত দাস তখন উদ্যোগী হল—স্যার আপনারা ভুল করছেন—আমি আগেই বলেছি এই কলকার্ডটি আমি কিছু না ভেবেই স্রেফ দয়াপরশ হয়ে ওকে লিখে দিয়েছিলাম—তাই কার্ডে লেখা কোন নিয়ম ওর প্রতি প্রযোজ্য নয়—ওটা শুধু ছবির প্রিন্সিপ্যাল আর্টিস্টদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

—তাহলে আপনি পার্বতীরাণীকে বাড়ী পৌঁছে দেন নি ?

—আজ্ঞে না।

—মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে আপনার মনে কী ধারণা হয়েছিল ? ভদ্রঘরের মেয়ে ? না প্রসটিটিউট ?

প্রভাত দাস আমতা আমতা করে বলল—ভদ্রঘরের মেয়ে বলেই তো মনে হয়েছিল। বলেছিল, মা স্টুডিওতে ছাড়তে চাইছে না। আর

সইজন্যেই তো কলকার্ড লিখে দিলুম। যাতে ওর উপকার হয়। গরীব ঘরের মেয়ে। হয়ত সংসার অচল। এই জন্যেই হয়ত রোজগারের আশায় স্টুডিওতে এসেছে। এই রকম মেয়ের সংখ্যা তো স্যার দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে।

উকিল কথাগুলো যেন লুফে নিলেন—ইয়েস ইয়েস, রাইট ইউ আর —মী লর্ড, সাক্ষা বলছে, মেয়েটির কথা ও আচরণে বোঝা গিয়েছিল যে সে ভদ্রঘরের এবং পেটের দায়ে অভিনয় করবে বলে স্টুডিওতে ঘোরাঘুরি করছিল। আসামী তাকে তার দুঃস্থ অবস্থার সুযোগ নিয়ে একদিন মধ্য কলকাতার এক কুখ্যাত বাড়ীতে ফুঁসলে নিয়ে যায় এবং জঘন্য অত্যাচার করে। মেয়েটি তার প্রতিবাদ করায় এই আসামী তাকে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে। সাক্ষী বলছে—মেয়েটিকে দেখে মোটেও প্রসটিটিউট বলে মনে হয়নি—প্লীজ নোট—

আসামী পক্ষের লোকজন সব ঘুরে তাকাল প্রভাত দাসের দিকে। প্রভাত দাস ভাবল—এইরে ব্যাটারা আমায় চিনে রাখছে। ভয় ধরে গেল মনে। কোর্টের বাইরে গেলে ধরে প্যাদাবে না তো? ও মশাই—

কোর্ট ইন্সপেকটর বিরক্ত হয়ে বললেন—আরে দূর মশাই। সে রকম কিছু চেষ্টা করলে ওদের গুষ্ঠীসমেত চালন করে দেব না। সরকার পক্ষের সাক্ষীর গায়ে একবার হাত পড়ুক না দেখি। আমি তো তাই চাই—

শুনে প্রভাত দাসের আক্কেল গুড়ুম—এ্যাঁ, বলে কিনা আমি তো তাই চাই। অর্থাৎ ওরা আমাকে ধরে ঠ্যাঙাক আর উনি অমনি ওদের ধরে শ্রীঘরে চালান করবেন? ভারি মজা তো

—তাহলে স্যার—

আইনজ্ঞ ওর দিকে চুপচাপ একটু তাকিয়ে থেকে বললেন—ইয়েস, আপনি যেতে পারেন। নেক্স্ট—

আর্দালী কোর্টঘর থেকে অমনি বেরিয়ে গেল—হেঁড়ে গলায় একজনের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে প্রভাত দাস কাঠগড়া থেকে নেমে বাইরে

বারান্দায় বেরিয়ে এসে মুক্ত হাওয়ায় দাঁড়াল। উঃ। ঘেমে নেয়ে একাকার অবস্থা। ভয়ে ভয়ে পেছন ফিরে একবার দেখল। কি জানি—আসামীপক্ষের লোকেরা ফলো করছে কিনা। হাইকোর্ট থেকে এখন একবার বেরতে পারলে হয়। সোজা একটা ট্যাকসি। তারপর সটান বাড়ী।

হাঁটা দেবে কিনা স্থির করতে পারছিল না। অথচ চলে যেতেও সাহস হচ্ছিল না। এমন সময় সেই পুলিশ অফিসার এলেন।—কী মশাই, সাক্ষী দেওয়া হয়ে গেছে ?

—হ্যাঁ।

—গুড। তাহলে ইয়ে করুন, এখান থেকে সোজা লালবাজার চলে যান; আমি লিখে দিচ্ছি।

বলে খসখস করে একটা ছাপানো ফর্ম ফিলআপ করে বললেন—নিন্ এখানে একটা সই করুন। তারপর লালবাজারে এই কাগজটা দেখিয়ে পেমেন্ট নিয়ে বাড়ী চলে যান।

যন্ত্রচালিতের মত সই করল প্রভাত দাস। পনের টাকা তার প্রাপ্য হয়েছে। মানে সাক্ষীর পারিশ্রমিক। প্রভাত দাস ভাবল—ও টাকা আমার মাথায় থাকুক, এখন আমি বাড়ী ফিরতে পারলেই বাঁচি।

বলল—তাহলে আমি যেতে পারি ?

অফিসার বললেন—নিশ্চয়। তবে ভবিষ্যতে যদি এই ব্যাপারে আবার কখনো দরকার হয় তো খবর দেওয়া মাত্র সোজা আমার কাছে, চলে আসবেন। অন্যথা করবেন না। এই হতচ্ছাড়া ক্রিমিন্যালটা আমায় বড্ড ভুগিয়েছে। ওর তেইশটা আমি বাজাচ্ছি। খালিকুঠিতে নিয়ে গিয়ে কত অসহায় মেয়ের যে সব্বোনাশ করেছে ব্যাটা—তার ইয়ত্তা নেই। ঘুঘু এবার ফাঁদে পড়েছে, ফাঁসিতে লটকে দিচ্ছি ওকে। যাই হোক আমি চলি—

বলে অফিসার হন-হন করে চলে গেলেন।

—তারপর আমি সোজা হাইকোর্ট থেকে টালীগঞ্জে। আর কখনো ওমুখো হইনি। দাও এবার একটা সিগ্রেট দাও...।

সমাপ্ত